এ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে; স্বভাবতই এই সংস্করণে পূর্ব-পাকিস্তান হয়েছে বাংলাদেশ, কিন্তু সর্বত্র নয়: ইতিহাসের প্রয়োজনে যেখানে দরকার সেখানে পাকিস্তান এবং পূর্ব-পাকিস্তান রয়েই গেল।

একাত্তরের আগে স্বাধীনতার অর্থ ছিল সাতচল্লিশে লব্ধ স্বাধীনতা —যা ক্রমে ক্রমে মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল—এবং একে সে অর্থেই নিতে হবে। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর শেষ অনুচ্ছেদে কয়েকটি বাক্য বাদ দেওয়া হলো, কেননা ইতিমধ্যে অনেকেরই প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আর-সব প্রবন্ধ যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে মুক্তধারা কর্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আবদুল হক

ভূমিকা

এই প্রবন্ধগুলি গত পনের বছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ; শুধু একটি প্রবন্ধ—'প্রগতি ও ধর্ম,—স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রকাশিত।

'সাহিত্যের দিগন্ত' এবং 'সাহিত্যিকের স্বাধীনতা' আমার প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন "ক্রান্তিকাল"-এর 'সাহিত্যিক মূল্যবোধ' শীর্ষক প্রবন্ধের সম্পূরক ; তথাপি প্রবন্ধ দু'টি "ক্রান্তিকাল"-এর অন্তর্ভুক্ত করিনি এই ধারণায় যে প্রবন্ধ দু'টিতে আলোচিত সমস্যাগুলি একান্ত সাময়িক। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ঐসব সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, এবং মনে হয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থিতিলাভ করবে। প্রবন্ধ দু'টি তাই লোক-লোচনের সম্মুখে থাকাই সঙ্গত।

বাংলা একাডেমী আমাকে দিয়ে হেনরিক ইবসেনের ছয়টি শ্রেষ্ঠ নাটক অনুবাদ করিয়ে নিয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমি নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও লিখেছি। সে-সমালোচনা এখানে সংকলিত হল। আরও সংক্ষিপ্ত আকারে এসব সমালোচনা অনুবাদ-নাটকগুলির ভূমিকা হিসাবে পাওয়া যাবে।

মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের সময় 'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'শিখার সন্ধানে'। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর বার্ষিক মুখপত্র 'শিখায়' উক্ত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের মতবাদ ও আদর্শের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাই শুধু এ প্রবন্ধে বিশ্লেষিত, সামগ্রিক পরিচয় নয়। তবু এতে 'সাহিত্য-সমাজ'-এর মতবাদ ও আদর্শের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে ভরসা করি।

প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশের সময় যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি থাকলো বলা চলে না। কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে ; তবে তা প্রধানত ভাষাগত।

আবদুল হক

সূচীপত্র

সাহিত্য ঃ

চিন্তা ঃ

সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ

এই লেখকের অন্যান্য বই

প্রবন্ধ ঃ

ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব

ক্রান্তিকাল

বাঙালী জাতীয়তাবাদ

সাহিত্য ও স্বাধীনতা

ছোটগল্প ঃ

রোকেয়ার নিজের বাড়ী

নাটক ঃ

সোনার ডিম

অদ্বিতীয়া

ফেরদৌসী

ইবসেনের অনুবাদ ঃ

পুতুলের সংসার

প্রেতাত্মা

রসমার্সহোম

হেডডা গাবলার

মহাস্থপতি

জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান

প্রত্যয়ের সাহিত্য

আমরা এখন এমন একটা যুগে বাস করছি যখন সাহিত্য আর বিশুদ্ধভাবে জাতীয় নয়, বেশ-কিছুটা আন্তর্জাতিক। যতদূর চোখ যায় ঠিক ততদূর অবধি নয়, তার পরেও সাহিত্যের পরিধি প্রসারিত। এই প্রসারণ ঘটেছে যেমন চিন্তায় ও অনুভবে, তেমনি আঙ্গিকে—বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে, পশ্চিমের প্রভাবে। এটা ঘটাই মঙ্গল, এই উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা আমাদের। এই সংঘটনে বাঞ্ছনীয় অনেক-কিছু ছিল এবং আছে, শতাধিক বছরে বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রগতি তার প্রমাণ। বস্তুত পশ্চিমের সংস্পর্শে না এলে এই সাহিত্যের এবং এই ভাষাভাষী শিক্ষিত জন-মানসের এতটা মুক্তি সম্ভব হতো না, এই সাহিত্য এবং সমাজ মধ্যযুগেই থেকে যেত। কিন্তু মাঝে মাঝে এও মনে হয়, এর সীমারেখা কোথাও একটা আছে, থাকা উচিত, কেননা সময় বদলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে পশ্চিমও। এবং জাগতিক ঐশ্বর্য শুধু নয়, মানসিক ঐশ্বর্যও কারো এক রকম থাকে না চিরদিন, এমনকি পশ্চিমেরও না।

বিগত শতাধিক বছরের দিকে তাকিয়ে আমরা অবশ্যই স্বীকার করব পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে বাংলাভাষা এবং সাহিত্য অনেক উপকৃত হয়েছে, তা বলে পশ্চিমের যা-কিছু উল্লেখযোগ্য অথবা বিখ্যাত তার সবকিছুরই দৃষ্টান্ত অনুসরণে উপকার হবে, অথবা সবকিছু অনুসরণের দরকার আছে এরূপ ধারণা খুব সঙ্গত মনে হয় না। এ-কথা আমি ভাবছি ভাববস্তু এবং আঙ্গিক উভয় সম্বন্ধেই। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যা বিবেচনা করবার তা হচ্ছে, অন্যান্য সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ পরিস্থিতিতে যা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় তা আমাদের জন্যেও স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় কি না, যদি আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অন্য রকম হয়। সাহিত্য যদি সমাজ ও

সংস্কৃতির ফসল হয়, তাহলে ভূমির প্রকৃতি এবং মৌসুমের আয়োজন এক রকম না হলে ঠিক একই রকম ফসল প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। সেরূপ প্রত্যাশা এবং যথেষ্ট অধ্যবসায়ের ফলে কিছু ফসল উৎপন্ন হওয়া খুবই সম্ভব; কিন্তু সাফল্যে তারতম্যও অবশ্যম্ভাবী। সেই সঙ্গে আরও একটি ফসল ঘরে তুলতে হয়, তার নাম অস্বাভাবিকতা। পরিস্থিতির প্রশ্নটি অবান্তর নয়; যদি অবান্তর হতো তাহলে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের কাব্যে আধুনিকতার আরম্ভ হতো প্রায় একই সময়ে, কেননা এই দু'দেশের মাঝখানে একটা প্রণালী মাত্র, যা অধুনা তরুণীরাও সাঁতার কেটে পার হতে পারে। কিন্তু ইংরেজী কাব্যে আধুনিকতার আরম্ভ ফরাসী কাব্যের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে।

আমি বিশেষভাবে কোনো রীতির কথা—রোমাণ্টিক অথবা ক্লাসিক্যাল রীতির কথা ভাবছি না। এই দু'টি রীতি নির্ভরশীল যেমন ব্যক্তি-প্রতিভার স্বরূপের উপর, তেমনি যুগ-প্রকৃতির উপর; বরং দেখা যায় যুগ-প্রকৃতির উপরই বেশী, কেননা রোমাণ্টিক যুগে ক্লাসিক্যাল মেজাজের লেখক এবং ক্লাসিক্যাল যুগে রোমাণ্টিক মেজাজের লেখক তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের পূর্ণ সুযোগ পান না, এবং এই কারণে তাঁর প্রতিভাকে ম্লান হতে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, প্রত্যেক লেখকের জন্য সঙ্গত নিজের প্রতিভার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা; পরিবেষ্টনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, দাস হিসাবে নয়, ইতিহাসের প্রয়োজন হিসাবে; স্বাভাবিকভাবে সাহিত্য-সাধনা করা, এবং যুগের রেওয়াজের দাসত্ব বরণ না করা। লেখক যে-সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থান করেন তার স্বরূপ ও প্রয়োজনটি চিনে নিয়ে, এবং নিজের প্রতিভার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে স্বাভাবিকভাবে নিজেকে ব্যক্ত করাই তাঁর কাজ। নিজেকে ব্যক্ত করার মধ্যে বিশুদ্ধভাবে নিজেকে' ব্যক্ত করা কিছুটা থাকতে পারে; আমি এখানে বিশেষভাবে যে-কথার উপর জোর দিতে চাই তা হচ্ছে লেখক শুধু ব্যক্তি নন, সামাজিক ব্যক্তি এবং সমাজ-মানসের অন্ততঃ একাংশের প্রতিনিধি। নিজের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর একটা দায়িত্ব আছে; অবশ্য উত্তম লেখকের অনুরূপ দায়িত্ব, অবিকল সমাজকল্যাণীর অনুরূপ নয়। এই দায়িত্ব-সচেতনতা ব্যতীত কোনো লেখক বৃহৎ অর্থে মহৎ হতে পারেন এবং মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন বলে মনে হয় না।

এই পর্যায়ে, মনে হয়, এই আলোচনায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার, যদিও তা ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। আমাদের সমালোচনামূলক রচনাপুঞ্জে 'কাব্য' এবং 'সাহিত্য' শব্দ দু'টি কখনো কখনো স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং এরূপ ব্যবহার বাড়ছে বলে মনে হয় যখনই কেউ বলেন "কাব্য ও সাহিত্য", যদিও কাব্য সাহিত্যেরই অন্তর্গত এসং সাহিত্যের একটি শাখা মাত্র। এই ব্যাপক অর্থেই 'সাহিত্য' শব্দটা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কালে প্রচলিত হয়েছে, 'কাব্য' তার একটি শাখা হিসাবে। (সংস্কৃত নন্দন-তত্ত্বে কাব্য ছিল সাহিত্যের প্রায় সমার্থক, ঐ ব্যাপক অর্থে। নাটক ছিল 'দৃশ্যকাব্য'।) এখন শব্দ দু'টির স্বতন্ত্র অর্থীকরণ সঙ্গত বলে মনে হয় না। তেমনি অসঙ্গত মনে হয় স্বতন্ত্র অর্থে 'কবি' ও সাহিত্যিক' (অথবা 'লেখক') শব্দ দু'টির ব্যবহার। বস্তুত: কবি 'সাহিত্যিক'-এর অন্তর্গত এবং 'লেখক'-এরও। শব্দগুলি ঐ রকম পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকলে শীগ্গিরই আধুনিক যুগের বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে এবং ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যও, কেননা ঐ সাহিত্যেও সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্য এবং লেখকের অন্তর্গত কবি। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, ইংরেজী সমালোচনায় 'সাহিত্য' কথাটা ব্যবহৃত হলেও 'সাহিত্যিক' (litterateur মূলত ফরাসী) শব্দটি ব্যবহৃত হয় না (হলেও তা ব্যতিক্রম মাত্র); ঐ সাহিত্যে সাহিত্যিক বলতে ব্যবহৃত হয় 'লেখক'। আমি এ-আলোচনায় সাহিত্য বলতে কবিতাসহ সৃষ্টিধর্মী সব রকম সাহিত্যই বোঝাচ্ছি এবং সাহিত্যিক ও লেখক বলতে কবিকেও।

আমি বলছিলাম আমাদের সাহিত্যে পশ্চিমের প্রভাবের কথা। চিন্তা ও প্রকরণ উভয়ের ব্যাপারে পশ্চিমী, এবং ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বিদেশী, সাহিত্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু নয়; কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্য বলতে যে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত অথবা মুক্তি-প্রয়াসী বাংলা কাব্য বোঝায়, এবং বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাব্যের যে-অংশটিকে বোঝায় (একে অতি-আধুনিক কাব্য বলাই বোধ হয় সঙ্গত), তার মধ্যে, ঐ অনুসরণের ব্যাপারে কিছু চিন্তাহীন নির্বিচার প্রয়াস আছে কি না তা সাহিত্যের স্বাস্থ্যের জন্য মাঝে মাঝে ভেবে দেখা দরকার। এখানকার আধুনিক কবিতাবৃত্তে

পাশ্চাত্যের (এবং পশ্চিমবঙ্গেরও) আধুনিক কবিতার ভক্তের অভাব নেই : কবিতার শুধু নয়, সাহিত্যের অন্যান্য শাখারও কিছু পরিমাণে, তবে বিশেষ করে কবিতার। সময় সময় মনে হয়, ঐ ভক্তিময়তার মধ্যে কিছু বিহ্বলতা আছে। গোটা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে—এবং বিশেষ ধরনের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যেরও প্রেক্ষিতে—অবশ্য সংক্ষেপে—কথাটা আমরা বুঝাবার চেষ্টা করব। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিস্থিতি কি উনিশ শতকের ফ্রান্স অথবা বিশ শতকের যুক্তরাষ্ট্র-ইংলণ্ড-পশ্চিম-ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির হুবহু অনুরূপ? ঐসব ভূভাগ শিল্পের যুগে প্রবেশ করেছে বহুকাল আগে; ওরা সাম্রাজ্য জয় করেছে, দু'টি মহাদেশের আদি অধিবাসীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে, পৃথিবী লুণ্ঠন করে সম্পদশালী হয়েছে, এবং স্পার্টার যুগ থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিশেষ প্যাটার্নের মধ্যে বিলাসিতার মদ্য পান করে এসেছে। অবশ্যই ওদের ভাল দিকও অনেক ছিল এবং আছে: উন্নত সভ্যতা ও সাহিত্য, মধ্যযুগের পর থেকে; বিজ্ঞান, দর্শন, উদার-মানবিকতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ (তবে সেই সঙ্গে হৃদয়হীন বস্তুতান্ত্রিকতাও)। এখনও রেনেসাঁ বলতে ইউরোপীয় রেনেসাঁই বোঝায়।

বিশেষ করে রেনেসাঁ, বিজ্ঞানচর্চা, যন্ত্রবিদ্যা এবং শিল্পবিপ্লবের সংযোগে (এবং পৃথিবী লুণ্ঠন করে) পশ্চিমী দেশগুলি যে-সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল তা এখন ক্ষয়িষ্ণু, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই; বস্তুত: প্রথম মহাযুদ্ধ তারই প্রথম বড় লক্ষণ। ঐসব দেশের বিভিন্ন প্রকার আধুনিক সাহিত্যের এবং বিশেষ করে কবিতার এই একটা প্রধান বক্তব্য। আর একথাও ঠিক যে, পশ্চিমের বিখ্যাত প্রাণোচ্ছলতা, উন্নত মূল্যবোধ ঠিক আগের মতো আর নেই; ওরা এখন মনস্থির করতে পারছে না ভবিষ্যৎ নিয়তি সম্বন্ধে। এসব ব্যাপারে পশ্চিম নিজেই এখন নিঃস্ব হয়ে আসছে, এবং এমনকি তাকাচ্ছে প্রাচ্যের দিকে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিও এখন বিশেষ ধারায় বিকশিত হওয়ার পর বর্তমানে ক্ষীয়মাণ। ওখানকার সমাজ-ছাড়া কাব্যাংশ তার একটা প্রমাণ। ওখানকার সমালোচকরাও বলছেন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের অতি-আধুনিক কাব্য বিবর্ণ, পাণ্ডুর, এবং আপাতত সম্ভাবনাহীন।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি ঐসব ভূখণ্ডের সমাজ ও সংস্কৃতির অনুরূপ নয়, এবং বিকাশের ঠিক সমস্তরে নেই। এদের সমস্যাবলীও এক রকম নয়। কিন্তু জ্ঞাতসারে কিনা বলা কঠিন, আমাদের এখানকার সাম্প্রতিক কিছু রচনার পেছনে এই চিন্তা যেন অনুভব করা যায় যে, আমরাও ঐসব ভূভাগের অনুরূপ সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থান করছি; অথবা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ওদের সমস্তরে: অতএব ওদের সমস্যা এবং আমাদের সমস্যা, ওদের বক্তব্য এবং আমাদের বক্তব্য এক; ওরা যেমনটি করছে আমরাও তেমনটি করব, আমরা ওদের মতো করে চিন্তা ও অনুভব করব এবং ওদের মতো করেই তা প্রকাশ করব। ওদের সমাজ যেমন ক্ষয়িষ্ণু আমাদের সমাজও ঠিক তেমনি; অথবা ওদের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং আমাদের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রকৃতি এক। ঠিক এতটা স্পষ্ট নয় কিন্তু কারো কারো চিন্তা যেন এই রকম।

আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ঐসবের কোনোটির মতোই অতোটা ক্ষয়িষ্ণু নয়, এই অর্থে যে ঐসব সমাজ যতটা বিকশিত রাষ্ট্রীয় ও আর্থনীতিক পর্যায়ে, এবং ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতিতে ও সামাজিক বিন্যাসে, আমাদের সমাজ ততটা নয় এখনো। আমাদের সমাজের অগ্রগতির সম্ভাবনা এখনো অফুরন্ত, যদি অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব করে তোলা যায়। এমন হতে পারে যে পশ্চিমের মানুষের না হলেও তাদের বিশেষ সামাজিক ভাবধারা এবং মূল্যবোধের ভূমিকা প্রায় সমাপ্ত, এবং এই কারণে ওরা এখন অনেকটা লক্ষ্যহীন। অন্তত: ঐ সভ্যতা প্রবীণ নক্ষত্রের মতো তার দীপ্তির উৎস প্রায় ফুরিয়ে এনেছে এবং এখন একটা সঙ্কটের সম্মুখীন। তার অনেক লক্ষণও পরিস্ফুট—দু'টি বিশ্বযুদ্ধে এবং সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধের আয়োজনে; সামাজিক জীবনে, মূল্যবোধে, এবং সাহিত্যে। কিন্তু আমরা স্বাধীন হয়েছি বেশী দিন নয়, আমাদের স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীন সার্থকতা এখনও অনাগত। আমরা দীর্ঘকাল পরাধীন থেকেছি, নিপীড়িত হয়েছি, শোষিত হয়েছি, প্রতারিত হয়েছি, তারই ধকল সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং নতুন জীবন লাভের চেষ্টা করছি মাত্র। ঐসব ভূভাগের সমাজ এবং আমাদের সমাজকে তাই সমান্তরাল এবং প্রগতির সমবিন্দুতে অবস্থিত বিবেচনা করা যায় না: যদি পশ্চিমী সমাজের প্রগতিকে সত্যি প্রগতি বলা সঙ্গত হয়।

পশ্চিমের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার করা মনে হয় দরকার। আমার বক্তব্য এই নয় যে, পশ্চিমী সমাজ বিকাশের কোনো একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে বলে ওর ক্ষয়িষ্ণুতাই সঙ্গত; আমি বলছিলাম ঐ সমাজে ক্ষয়িষ্ণুতা এসেছে কোনো না কোনো কারণে, এই হিসাবে তা স্বাভাবিক, এই অর্থে যে কারণ ব্যতীত কার্য অসম্ভব। কিন্তু যা স্বাভাবিক তার সবই যে সঙ্গত তা নয়। আর শুধু ক্ষয়িষ্ণুতা নয়, আরও কিছু জিনিস ঐ সমাজের নিজস্ব বলে এবং সে-সবের নিজস্ব কারণ আছে বলে অনুরূপ কারণ এবং সঙ্গত কারণ ব্যতীত আমাদের সমাজে সে-সবের আবির্ভাব অস্বাভাবিক।

ঐসব সমাজ কি কি ভ্রান্তি এবং অবিবেচনাবশে তাদের সম্ভাবনার শেষ স্তরে এসে পৌঁছালো সে-সম্বন্ধেও আমরা অন্ধ থাকতে পারি না—ঐসব সমাজের মনীষীরাই এ বিষয়ে সমালোচনা-মুখর; আমাদের তাই ভাববার আছে কোনো কোনো ব্যাপারে আলেয়াকেই আমরা আলোকমালা মনে করছি কিনা।

আমরা জানি, আমরা অনুভব করি, আমাদের সম্ভাবনা এখনো অনেক—কেননা সুদীর্ঘ বৈদেশিক আমলে আমরা আমাদের নিয়তি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাইনি। আমাদের সম্ভাবনা অনেক—যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝে নিতে পারি সে-সম্ভাবনা কী, সে-সম্ভাবনা কোন্ নিয়তির মধ্যে সুপ্ত, কোন্ জাগরণের জন্য তার প্রতীক্ষা। যদি আমরা বুঝে নিতে পারি তাহলে আমরা এ-ও বুঝবো, আমাদের (এবং বস্তুত সমগ্র মানব-সমাজেরই) ইতিহাসের এমন একটা থর-থর মুহূর্তে আমরা পোঁছেছি যখন ক্ষয়িষ্ণুতার ভান আত্ম-অপচয় মাত্র।

আমি যে-সব ভূভাগের উল্লেখ করেছি, সম্ভাবনা ঐসব ভূভাগেরও আছে (মানুষের সম্ভাবনা বস্তুত: এখনও অফুরন্ত, তৃতীয় এবং সর্বশেষ মহাযুদ্ধ যদি না ঘটে, যদি ঐতিহাসিক সমাজ-বিবর্তনের কথা ধরা যায়, আর্থনীতিক এবং সকল প্রকার মানবিক অর্থে); কিন্তু আমাদের যাত্রা যেহেতু অনেক পরে, অংশত: সুষুপ্তির জন্য এবং অংশত দীর্ঘ-কালের পরাধীনতার জন্য, এই কারণে আমাদের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অধিক। বস্তুত বাংলাদেশের যাত্রাপথের এখনও অনেক বাকি—পশ্চিমজগতের তুলনায়। ঐসব দেশীয় এবং বাংলাদেশী সমাজের

প্রয়োজনাবলী, দৃষ্টিকোণ, মনোভঙ্গী এবং জীবনদর্শন, অতএব সাহিত্যো-পকরণ এবং সাহিত্য-প্রকরণ, তাই ঠিক এক রকম হতে পারে না।

আমাদের সমাজে ক্ষয়িষ্ণুতা যে কখনো কিছুই ছিল না (অথবা নেই) তা আমি বলছি না; ছিল; নইলে ইতিহাসের আদিগন্ত এমন দুর্গতি আমাদের হতো না, কিন্তু সে-ক্ষয়িষ্ণুতা পশ্চিমের ক্ষয়িষ্ণুতার থেকে স্বতন্ত্র ঘটনা। গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ আমাদের যে জিনিসটার অভাব ছিল তা হচ্ছে বাঞ্ছনীয় জাতীয়তাবোধ (অথবা অন্তত গোষ্ঠী-চেতনা, কেননা জাতীয়তাবোধ অপেক্ষাকৃত আধুনিক জিনিস), সংহতি ও সংগঠন। এবং আমাদের ছিল, এখনও আছে, বহুবিধ সংস্কার, কুসংস্কার, সর্বপ্রকার জাগতিক এবং মানসিক কূপমণ্ডুকতা (মাত্র কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করছি); আমাদের সমাজের লক্ষণগুলি অনুন্নত সমাজের লক্ষণ, অধঃপতিত সমাজের ঠিক নয়। কিন্তু পশ্চিমী সমাজের যে ক্ষয়িষ্ণুতা তা ধনিকের অনাচার-অর্জিত ব্যাধির মতো। আমাদের ব্যাধি মূলত পুষ্টিহীনতার, ওদের ব্যাধি মূলত অনাচারের। অধুনা আমাদের সমাজে ওদেরই মতো অনাচারের ব্যাধি ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে না তা নয়; করছে—ক্লাবে, আধুনিক হোটেলে, এবং জীবাণু-সংক্রমিত ফিল্ম ও মুদ্রার সংস্পর্শে; তবে প্রধানত: পশ্চিমের অনুকরণে—'আধুনিকতার' মোহে। পশ্চিমের দৃষ্টান্তে আমাদের কিছু সাহিত্য, বিশেষত কাব্য—সব নয়, একাংশ—মনে হয় বিশেষ বিশেষ ধরণের 'আধুনিক' হওয়ার প্রয়াস পায় যেহেতু পশ্চিম ঐ ধরণের আধুনিক হয়েছে বলে, ঠিক কি প্রকার পরিস্থিতিতে আধুনিক হয়েছে, অথবা ঐ ধরণের আধুনিকতা আদৌ মূল্যবান কি না, অথবা ঐ ধরণের আধুনিক হওয়ার দরকার এ-দেশে আছে কি না এসব কথা চিন্তা না করেই। ঐ সাহিত্য আধুনিকত্বের কয়েকটি বিখ্যাত লক্ষণকে বরণ করেছে প্রাণের কোনো অনিবার্য তাগিদে নয়, কোনো দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য নয়, সম্প্রতি পশ্চিমের কাছে নেওয়াটাই একটা প্রথা বলে। নেয় অবশ্য পশ্চিমও, এমনকি প্রাচ্যের কাছেও, কিন্তু পশ্চিম নেয় সাধারণত: জ্ঞানের জন্য, আনন্দের জন্য, অথবা নিজের পুষ্টির জন্য। আমরা নেই ঐসব কারণে সাধারণত নয়, আর সবাই নিচ্ছে বলে, এবং না নিলে লোকে প্রাচীন বলবে এই আতঙ্কে। এই আধুনিকতার কোনো কোনো প্রথা—সঠিকভাবে বলতে গেলে হুজুগ—প্রায়শ যুক্তি

মানে না। এই রকম আধুনিকতার উদাহরণ আমরা দেখি (সামাজিক উদাহরণ নিলে) যখন গ্রীষ্মকালে সুসজ্জিত ভদ্রলোক ভোজসভায় অপরাপর নিমন্ত্রিতদের সহ প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে পলান্ন আহার করেন, তাঁরই পত্নী শীতের শিহরণেও আস্কন্ধ বাহু এবং পেট ও পিঠের কিয়দংশ উন্মুক্ত রাখেন, এবং শীতে-গ্রীষ্মে তাঁদের বংশধর ড্রেনপাইপ ট্রাউজার ও তাঁদের দুহিতা স্কিনটাইট পোষাক পরে, যেহেতু ঐ সুখী পরিবারটি মনে করে এইসবই আধুনিকতার লক্ষণ, এবং এসব না হলে লোকে সেকেলে বা দেশী বলবে।

সামাজিক পরিস্থিতি ছাড়াও সাহিত্যের এমন কিছু ব্যাপার আছে যা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও বিবেচ্য। একজন সমগ্র ব্যক্তি যতোটা সমাজের সৃষ্টি, ততোটা কিংবা হয়তো তার চাইতে বেশী, এবং প্রত্যক্ষতরভাবে, তিনি তাঁর পরিবারের এবং আপন স্বভাবেরও সৃষ্টি। অন্তত তিনি (পরিবারসহ) সমাজের যেমন সদস্য, তেমনি একজন ব্যক্তি। একজন কারো বিধবা মাতা তাঁকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বামী গ্রহণ করায় তিনি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হলেন, বয়স্ক জীবনে অনাচারের নর্দমায় অবগাহন করলেন এবং কুৎসিৎ কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে উন্মাদ হলেন; দ্বিতীয় জনও স্বভাববশে অনেক অনাচার করলেন, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কবিতা লিখলেন আবার কবিতা ছাড়লেন, এমনকি চার্চের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, এবং তাঁর কবিতার অভিজ্ঞতা এমনই যেন তা নরকে এক ঋতু; তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষ পরি-বেশ থেকে এই ধারণা পেলেন যে আদি রিপুর যে-কোনো প্রকার চর্চাতেই মানবজীবনের মহত্তম সার্থকতা; চতুর্থ ব্যক্তি স্বভাবত: এবং আদর্শগতভাবে এ্যাংলো-ক্যাথলিক, রাজতন্ত্রী ইত্যাদি; পঞ্চম ব্যক্তি—কিন্তু উদাহরণ আমি আর বাড়াব না। ব্যক্তি হিসাবে এবং কবি ও ঔপন্যাসিক হিসাবে এঁরা কিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছিলেন, এবং ঐ পরিস্থিতির প্রতি তাঁদের বিশেষ বিশেষ মনোভঙ্গী ছিল কিনা? আমার বলবার কথা এই যে এসব কারণে এবং এসব কারণ সত্ত্বেও এঁরা প্রতিভাবলে উত্তম কিছু সৃষ্টি করতে পারলেন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশেষ জীবনবোধ অথবা দর্শন থেকে, বিশেষ আঙ্গিকে, সমাজের একজন সদস্য হিসাবে নয় শুধু, ব্যক্তি হিসাবেও, বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছিল এবং তাঁদের প্রকৃতি বিশেষ ধরণের ছিল

বলে; তা বলে এদেশের একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা তাঁদের কারো মতো না হওয়া সত্ত্বে, তিনি ভিন্ন সমাজের ভিন্নরূপ পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এবং ভিন্ন প্রকারের ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁদের কারো এদেশী সংস্করণ হওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা অন্তত: কিয়ৎ পরিমাণে অস্বাভাবিক।

সনেট গ্রামোফোন জেট-বিমান ইত্যাদি মূলত: এদেশের নয় অতএব আমাদের এসব জিনিস নেওয়া অসঙ্গত এ-রকম উদ্ভট কথা আমি বলছি না, কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ব্যক্তি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের সেখানে, সূক্ষ্ম-তর অর্থে, প্রকরণের প্রশ্নও অবান্তর নয়। প্রতিভাধর লেখক একটা-কিছু বলেন না শুধু, বলার জন্য অনেক সময় বিশেষ একটা স্বকীয় প্রকরণও উদ্ভাবন করেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ প্রকরণের একমাত্র সার্থকতা ঐ বিশেষ লেখকের আত্মপ্রকাশের জন্য: প্রকরণ এখানে সার্বজনীন নয়, ব্যক্তিক। এবং প্রতিটি মৌলিক লেখক যেহেতু চিন্তায় ও অনুভবে স্বতন্ত্র, এই কারণে এক লেখকের উদ্ভাবিত প্রকরণ অপর লেখকের অনুপযোগী, অপর দেশের লেখকের তো বটেই।

ঐতিহ্যের দিক থেকেও ব্যাপারটি আমরা নিরীক্ষণ করতে পারি। যে-পশ্চিমের আমরা অনুসরণ করি সেই পশ্চিমের কবি-সমালোচকই কি ঐতিহ্য ও ব্যক্তি-প্রতিভা প্রসঙ্গে বলেননি যে ঐতিহাসিক বোধ লেখককে লিখতে বাধ্য করে শুধু তাঁর সমকালীন মানুষদের তাঁর অস্থির অভ্যন্তরে সংস্থিত রেখে নয়, এই অনুভব নিয়েও তিনি লেখেন যে হোমার থেকে শুরু করে ইউরোপের সমগ্র সাহিত্যের এবং সেই সাহিত্যের অন্তর্গত তাঁর স্বদেশের সমগ্র সাহিত্যের যুগপৎ অস্তিত্ব বর্তমান? এই ঐতিহাসিক বোধ তাঁকে তাঁর সমকালীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। অন্যত্র তিনি বলেছেন ঐতিহ্য-বোধের কাম্য লক্ষ্য দেশচেতনা। আরও এক স্থানে—জীবনের শেষ পর্যায়ে—তিনি বলেছেন স্থানীয় না হয়ে সার্বজনীন হওয়া দু:সাধ্য। ঐতিহ্যবোধের মধ্যে অবশ্য বাছাবাছির প্রশ্ন আছে; এবং তার উপরেও তিনি জোর দিয়েছেন। এবং বাছাবাছি বোধ হয় আমাদের ঐতিহ্যেই বেশী বাঞ্ছনীয়। তথাপি এখানে আমরা যে-প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি তা হচ্ছে পশ্চিমের লেখক-সম্প্রদায় যদি নিজেদের প্রয়োজনে পশ্চিমের ঐতিহ্যকে অস্থিমজ্জায় অনুভব করেন, তবে আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ঐ লেখক-সম্প্রদায়কে অনুভব এবং তাঁদের মধ্য

দিয়ে তাঁদের ঐতিহ্যকে অনুভব কি পরিমাণে সঙ্গত এবং স্বাভাবিক? সাহিত্য ব্যক্তিরই সৃষ্টি, কিন্তু সমাজের এবং ঐতিহ্যের সংঘাতেরও সৃষ্টি, এই হিসাবে বহুল পরিমাণে সমাজের এবং ঐতিহ্যেরও সৃষ্টি; সমাজ ও ঐতিহ্য যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য কতটা স্বতন্ত্র এবং কতটা সদৃশ হওয়া সঙ্গত?

এসব প্রশ্নের সমাধান আপাতত: আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু প্রশ্নগুলি অনিবার্য, এবং অনুপেক্ষণীয়, এই আমার ধারণা। তবে এই বলা চলে যে অন্যান্য সমাজের নিয়তি-সচেতন লেখকদের সম্বন্ধে চেতনা, এবং স্ব-সমাজ-নিয়তি-চেতনা এক জিনিস নয়; এবং দ্বিতীয়োক্ত চেতনা ব্যতীত কোনো লেখককে প্রকৃত সচেতন লেখক বলা যায় বলে মনে হয় না।

কতকগুলি সাধারণ সূত্রের কথা বাদ দিলে প্রতিটি ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির সমস্যা ও প্রয়োজন তার নিজস্ব; সে-সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেউ কাউকে সাহায্য করে না; সংগ্রাম করতে হয় নিজস্ব পদ্ধতিতে। এজন্য দরকার নিজস্ব কৌশলের, নিজস্ব মূল্যবোধের। এক দেশের প্রয়োজনে অন্য দেশ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতি অথবা সাহিত্য জিনিসটা নির্দিষ্ট ছকে কোনো কারখানায় তৈরী নয়, এ আরও জটিল এবং সমাজের দৃশ্য-অদৃশ্য নানা স্তরে তার শিকড় অনুপ্রবিষ্ট। উনিশ শতকের ফ্রান্সের অথবা বিশ শতকের ইংলণ্ডের (অথবা পশ্চিমবঙ্গের) পরিস্থিতি এবং আমাদের পরিস্থিতি —সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক—এবং বিবিধ প্রয়োজন যদি ঠিক এক রকম না হয়, তবে ঐসব দেশের সাহিত্য-লক্ষ্য এসং মূল্যবোধের প্রতি নির্বিচার গদগদ-ভাব খুব বাস্তববোধের পরিচায়ক নয়। ব্যক্তিগত বিবেচনায়ও আমরা ঐ রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাব। আমি এমন বলছি না যে, ঐসব দেশের কাছে (বা ঐসব দেশের ব্যক্তির কাছে) জানবার এবং ঐসব দেশ থেকে নেবার আমাদের কিছু নেই; বস্তুত: অনেক আছে; না জানলে আমরা অজ্ঞ থাকব এবং না নিলে দরিদ্র; কিন্তু বিচার-বিবেচনা করে না নিলে আমরা উপর্যুক্ত আধুনিক পরিবারটির মতো আধুনিক হব মাত্র।

এদেশে একটা সত্য বিশেষভাবে পরিষ্কার যে এখনো আমাদের মৌলিক সমস্যাটা হচ্ছে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তাকে আরও সাথক

করা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অর্থে; আমাদের অস্তিত্বকে আরও অর্থময় করা, আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া; আমাদের যে একটা বিশেষ সত্তা আছে তাকে তীক্ষ্ণ, প্রোজ্জ্বল, প্রবল, সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এ পরিস্থিতিতে এমন মূল্যবোধ এবং চিন্তার প্রশ্রয় অযৌক্তিক যা মূলত: ক্ষয়িষ্ণু, যা ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার লক্ষণ: যেমন (অনেকগুলি লক্ষণের মধ্যে কয়েকটি) যৌনমনস্কতা, প্রকরণসর্বস্বতা, প্রত্যয়হীনতা, জীবনবিমুখতা, নিশ্ছিদ্র হতাশা। এসবের সঙ্গে এদেশে সংযুক্ত হয়েছে পশ্চিমী বিহ্বলতা এবং চিন্তার দাসত্ব। চিন্তা বলতে আমি এখানে চিন্তা ব্যতীত অনুভব এবং মানস-প্রবণতাও বোঝাচ্ছি।

আমাদের নব্য-শিক্ষিত এবং উঠ্‌তি ধনিক সমাজে এমন কতকগুলি লক্ষণ এখনই দৃশ্যমান যা মূলতঃ এবং ঐতিহ্যগতভাবে এ-দেশের সমাজের নয়, এবং এদেশের সমাজ থেকে উদ্ভূতও নয়; এ সমাজের ধারাবাহিক বিকাশের প্রয়োজনের ব্যাপার নয়, মূলত: ব্যাধিরও লক্ষণ নয়, প্রধানত: অনুকরণ মাত্র—উল্লিখিত সুখী পরিবারটির মতো—বস্তুত: আলো এবং চক্ষুর অন্তরালে তার চাইতেও বেশী—পাশ্চাত্ত্যবিহ্বলতা থেকে। কিন্তু তা বলে এগুলি কালক্রমে রোগলক্ষণে দাঁড়িয়ে যেতে বাধা থাকে না, বাধা হচ্ছে না, সুস্থ শরীরের অর্জিত ব্যাধির মতো। (আমাদের সমাজ সর্বদা, অথবা কোনো সময়, সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল কি ?—আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি আমাদের সমাজে এমন-সব ব্যাধির প্রবেশ ঘটছে যা আগে ছিল না) এই লক্ষণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও, আমার বিবেচনায় মূল ব্যাধি যেটি তা হচ্ছে আত্মবিস্মৃতি এবং চিন্তাহীনতা; ইতিহাসের বিভিন্ন লগ্নে একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসাবে কোন্ ভূমিকা এবং কোন্ নিয়তি আমাদের জন্য প্রতীক্ষমাণ তা চিনে নিতে এবং উপলব্ধি করতে অক্ষমতা—অথবা অনিচ্ছা।

নীরো, হতাশাবাদী, অতীতমুখী, সুযোগোপজীবী ইত্যাদি নানা রকমের লোক সকল সমাজে হয়তো সব সময়েই থাকবে। কিন্তু সমাজের প্রত্যাশা দায়িত্ব-সচেতনদের নিকট। স্বীকার করা যাক সমাজ ক্ষয়িষ্ণু—কোনো ব্যক্তির মতো ক্ষয়রোগাক্রান্ত; কিন্তু তা বলে তার প্রতিকারের চেষ্টা না করে সমাজের মানুষদের গত্যন্তর আছে বলে মনে হয় না। ক্ষয়রোগের জন্য হাহুতাশ করে, ক্ষয়রোগের চমৎকার চিত্রমাত্র অঙ্কন করেই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব কি? আমি এমন বলছি

না যে ক্ষয়িষ্ণুতা সাহিত্যের বিষয়ীভূত হওয়া অসঙ্গত; বরং না হওয়াই অবাস্তব এবং অসঙ্গত, সমাজে যখন ক্ষয়িষ্ণুতা বর্তমান। কোনো কোনো বিশ্বাসের মতো অবাস্তব রোমান্টিকতাও এক ধরনের অহিফেন। মূল প্রশ্নটা হচ্ছে কিসের জন্য অঙ্গীকার—মৃত্যুর অথবা জীবনের জন্য। পশ্চিম-ইউরোপের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মতো লক্ষ্যহীন আমরা নই—একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসাবে এখনও এমন অনেক-কিছু আমাদের দরকার যা ওদের জন্য অবান্তর। আমাদের ইতিহাসের অন্তত: বর্তমান পর্যায়ে যা দরকার, এবং স্বাভাবিক, তা হচ্ছে প্রত্যয়ের সাহিত্য, এবং আত্ম-প্রত্যয়ের সাহিত্য—কেননা বাঁচবার আকাঙক্ষা স্বাভাবিক। অন্ধ বিশ্বাস আমি সমর্থন করছি না, স্বীকেন্দ্রিকতার কথাও বলছি না, কিন্তু আত্ম-প্রত্যয় ব্যতীত প্রকৃত মানবজীবন ধারণ এবং মূল্যবান কিছু করা সম্ভব হয়। লেখক স্বদেশী অথবা বিদেশী রেওয়াজের প্রতিধ্বনি মাত্র নন; তিনি ব্যক্তি, কিন্তু শুধু ব্যক্তিও নন; তিনি তাঁর সমাজের এবং তাঁর কালের কণ্ঠস্বর, এবং কখনো কখনো ইতিহাস-নায়ক: সমাজের অন্তর্নিহিত বাসনা রূপ প্রার্থনা করে তাঁরই মধ্য দিয়ে। প্রকৃত সচেতন এবং স্বস্থ লেখক এই ভূমিকার মধ্যেই নিজের সার্থকতা সন্ধান করেন। সাহিত্য দেশ ও কালকে অতিক্রম করে, সার্বজনীন এবং সর্বকালীন হয়, দেশ ও কালকে বরণ করেই।

১৯৬৭

আধুনিক কবিতা

বাংলা ভাষায় রচিত আধুনিক কবিতার কয়েকটা দিক আমরা বিবেচনা করব এই আলোচনায়, সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক নয়, পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে। এরূপ আলোচনায় অবশ্য কিছু অসুবিধা আছে। আধুনিক কবিতার সূচনা কবে থেকে, এর প্রকৃতি কি রকম এবং লক্ষণ কি কি? এক অর্থে মধুসূদন থেকে আধুনিক কবিতার আরম্ভ, কিন্তু অধুনা আধুনিক কবিতা বলতে বোঝানো হয় রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত অথবা মুক্তিপ্রয়াসী কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত কবিতাকে। কিন্তু এ-সম্বন্ধেও সমালোচকেরা একমত নন। চল্লিশের দশক থেকে এ-যাবৎ আধুনিক কবিতার যে-সব উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ বেরিয়েছে তাতে সংকলন শুরু রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায় থেকে। ঐ পর্যায় থেকে আধুনিক বলে গণ্য হন এবং আধুনিক বলে গণ্য হন না এরূপ উল্লেখযোগ্য প্রায় সব কবিই স্থান পেয়েছেন এসব সংকলনে (বাংলাদেশের কোনো কবি নয়, একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত)। এই সংকলকদের মধ্যে দু'জন সমালোচক এবং দু'জন আধুনিক কবি-সমালোচকও আছেন—এঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বলে স্বীকৃত। উত্তররৈবিক কাব্যে (সময়ের দিক থেকে নয়, কাব্যপ্রয়াসের দিক থেকে) কতিপয় লক্ষণবিচারে সময় সময় কবিদের দু'রকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়: আধুনিক এবং সাম্প্রতিক। উল্লিখিত সংকলনগুলিতে দু'রকমের কবিই আসন পেয়েছেন। অনেকেই আধুনিক কবিতার লক্ষণবিচার করেছেন; তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একজন পরিশ্রমী মহিলা-সমালোচক তাঁর সুলিখিত 'আধুনিক কাব্য-পরিচয়ে'' আধুনিক কবিতার কতকগুলি লক্ষণের তালিকা তৈরী করেছেন, সেইসব লক্ষণবিচারে তিনি নজরুল ইসলাম এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আধুনিকতার অভিধা থেকে খারিজ করেছেন (অর্থাৎ এঁরা শুধু সাম্প্রতিক), এবং বিবেচনা করেছেন মাত্র পাঁচজন কবিকে, যদিও বুদ্ধদেব বসু তাঁর "সাহিত্যচর্চা" গ্রন্থে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইসলামই প্রথম মৌলিক এবং নূতন কবি।

পক্ষান্তরে উল্লিখিত মহিলা-সমালোচক কর্তৃক বিবেচিত পঞ্চকবির অন্যতম জীবনানন্দ দাশ তাঁর "কবিতার কথা" গ্রন্থে আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন: "সব সময়ের জন্যেই আধুনিক—এরকম কবিতা বা সাহিত্যের স্থিতি সম্ভব। মানুষের মনে চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে-বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে। এই হিসাবে মহাভারতের কোনো-কোনো অংশ আধুনিক কাব্য—এবং সোফো-ক্লেস ও ঈসকাইলাসের কিছু-কিছু; আগেকার যুগের আরো কোনো-কোনো কাব্যের নাম এ-প্রসঙ্গে করা যেতে পারে......।" এই প্রবন্ধের তিন বছর পরে অন্য এক আলোচনায় তিনি বলেছেন: "বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশেরই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে—অন্যত্র নয়—একথা ঠিক নয়। আমাদের দেশের পুরনো কবিদের একটা বড় অংশে, শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক ও সনেটে, ডানের ও রবীন্দ্রনাথের ঢের কবিতায় আধুনিকত্ব ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ ঘটবে বলে আজকের দৃষ্টি দিয়ে অন্তত আমি বুঝতে পারছি না।" তিন বছরের ব্যবধানে একই অভিমত প্রকাশ থেকে মনে হয় এটি ছিল জীবনানন্দ দাশের স্থায়ী অভিমত। পশ্চিমের সমা-লোচনা-সাহিত্যেও অনুরূপ অভিমতের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি—আপাতত আমি বিশিষ্ট আধুনিক ইংরেজ সমালোচক জি. এস. ফ্রেজারের "আধুনিক লেখক ও তাঁর পৃথিবী" নামীয় গ্রন্থ থেকে এই উক্তি উদ্ধৃত করছি: '......all through the literature of the past, there are certain works, which in the attitudes they express and the problems they deal with, have a peculiar affinity with the spirit of our own time.' এবং এর কিছু পরে "...much poetry of even remote past strikes us as eminently 'modern,' while some good poetry of our own period seems to us not really contemporary with us."

এই উদ্ধৃতির দ্বারা আমি এখানে বলতে চাচ্ছি না যে জীবনানন্দ দাশ জি. এস. ফ্রেজারের অভিমতের প্রতিধ্বনি করেছেন, কেননা জীবনানন্দ দাশের প্রথম উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে যে প্রবন্ধ থেকে সেটি বেরিয়েছিল ফ্রেজারের বইটির তিন বছর আগে, বাংলা ১৩৫৭ সালে। জীবনানন্দ দাশ এবং ইংরেজ সমালোচকের অভিমত স্বীকার করেই

বলা চলে, ইরানী কবি ফেরদোসী ইতিহাসবোধ ও অন্যান্য কারণে তাঁর শাহনামার কোনো কোনো অংশে, কিছু খুচরো গীতি-কবিতায় এবং বিশেষত তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতাটিতে, ওমর খৈয়াম তাঁর প্রায় সমস্ত রুবাইয়াতে, আরব কবি আবুল আ'লা আল-মা'রী' তাঁর সমাজ-দর্শন ও মানব-নিয়তি-দর্শন-মূলক কবিতাবলীতে (এই তিনজন ইরানী ও আরব কবি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অবধি জীবিত ছিলেন) এবং নজরুল ইসলাম তাঁর অন্তত কিছু সংখ্যক কবিতায় ও গানে নিশ্চিতভাবে আধুনিক।

বিশিষ্ট সমালোচকেরা আবার এমন কথাও বলেন যে আধুনিকতার ধারণাটা যুগ-নির্ভর—রুচি ও বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী এক যুগে যা আধুনিক অন্য যুগে তা শুধু সাম্প্রতিক বলে বিবেচিত হতে পারে। তার অর্থ এই যে সব সময়ের জন্যই আধুনিক এমন কবিতা আছে—এবং নেই। অন্ততঃ একথা বলা চলে যে কাব্যের আধুনিকত্বের কোনো চিরস্থায়ী মানদণ্ড নেই এবং এ-সম্বন্ধে একমত হওয়া প্রায় অসম্ভব। অতএব কাব্যের আধুনিকত্ব নামক বিষয়ে আমি এখানে কোনো বিতর্কে যাব না ; যাকে আধুনিক বলা হয় সেই কবিতার কয়েকটি লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলব মাত্র।

॥ ২ ॥

নূতন কবিতার মৌল যৌক্তিকতা তার নূতনত্বে, এবং তার মহত্ত্বের সম্ভাবনা মৌলিকতায়। কবি ব্যক্তি হিসাবে দেশকাল-বহির্ভূত নন ; তিনি সর্বদাই এক বিশেষ কালে এবং বিশেষ সমাজে সংস্থাপিত, অতএব তাঁর ব্যক্তি-অনুভবে সময় ও সমাজ-মানসও সংযোজিত, সচেতনভাবে এবং অচেতনভাবে স্থান সময় ও সমাজ স্ব স্ব রূপে-রসে-রঙে-সুরে তাঁর চেতনায় সংক্রমিত। যেহেতু এইসবই পরিবর্তনশীল, অতএব কবির অনুভবও তাই। সময় ও সমাজের অভিসংঘাত তাঁর মনে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে অথবা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার ; কিন্তু মূল কথাটা এই যে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির অনুভবেরও পরিবর্তন ঘটে। সেই সঙ্গে কাব্য-প্রকরণও পরিবর্তিত হয়, কেননা এক যুগের কাব্য-প্রকরণ—অথবা বলা উচিত কাব্য-প্রক্রিয়া—অন্য যুগের অনুভব প্রকাশের ঠিক উপযোগী নয়। প্রত্যেক যুগের কবিকেই তাই অল্পাধিক সচেতনভাবে পূর্বযুগের এবং এমনকি সমকালীন রীতি,

ভাষা ও ছন্দকে নিজের উপযোগী করে নিতে হয়। এই কাজে কোন্ কবি কতটা কৃতকার্য হন তা দিয়েই তাঁর প্রতিভা ও সামর্থ্যের পরিমাপ হয়। পূর্বযুগের ভাষা ছন্দ ইত্যাদি নিলেই যে কবিতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় তা সব সময় নয়; তবে সচেতন মৌলিক কবি পূর্বযুগের অথবা পূর্বসূরীর পুনরাবৃত্তি করেন না। আবার প্রত্যেকেই ব্যক্তি-স্বভাবে স্বতন্ত্র, এই কারণে যে-কোনো সময়ের বিভিন্ন কবি প্রকাশভঙ্গীতে বিচিত্র হতে পারেন, এবং হয়ে থাকেন—মৌলিকত্বের পরিমাণ অনুযায়ী।

কোনো কবি অতএব যদি সচেতনভাবে তাঁর পূর্বসূরীর প্রভাবাচ্ছন্নতা অতিক্রমের প্রয়াস পান এবং নূতন স্বরে কথা বলেন তবে তা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কিন্তু মনে হয় এজন্য কখনো কখনো আধুনিক কবি অশুভ শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করেছেন ফাউস্টের মতো। বাংলা ভাষায় লিখিত আধুনিক কবিতার বয়স বর্তমানে কম নয়, আধুনিক কবির সংখ্যাও অনেক এবং এই কবিতার বিরুদ্ধবাদী অনেক থাকলেও উৎসাহী সমঝদারের অভাব কখনো ছিল না, কিন্তু নজরুল ইসলামের সহজাত এবং জীবনানন্দের অনেকটা-সহজাত কাব্যপ্রয়াসের বাইরে, পশ্চিমমুখীন অতি-সচেতন প্রয়াস (পশ্চিমবঙ্গের) বাংলা কাব্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেনি। কবিতার সাফল্যের পরিমাপ হয় বহুলাংশে তার স্মরণ-যোগ্যতা দিয়ে, বা অবিস্মরণীয়তা দিয়ে; আনন্দের জন্য কবিতা বহুদিন যাবৎ বারংবার পঠিত হয় কিনা, আবৃত্ত হয় কিনা, উদ্ধৃত হয় কিনা তা দিয়ে। স্বীকার না করে উপায় নেই, এসব গুণের বিচারে আধুনিক কবিতা 'আধুনিক'—পূর্ব কবিতার তুলনায় দরিদ্র। কাব্যপাঠক আধুনিক কবিতায় এরূপ আনন্দ বেশী পান না।

এজন্য কাব্যপাঠককে অনেক সময় যথাযথ প্রস্তুতির অভাব এবং সংবেদনহীনতার দায়ে দায়ী করা হয়। এ-অভিযোগ এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া সঙ্গত নয়, এবং এরূপ অভিযোগ কাব্যের ইতিহাসে নূতনও নয়। প্রায় সবদেশেরই নূতন কবিতার কিছু অংশ কোনো কোনো যুগে অন্তত সাময়িকভাবে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয়, পক্ষান্তরে গতানুগতিক কাব্য-সংস্কার অনুৎকৃষ্ট কাব্যকেও অতিরিক্ত মূল্যবান জ্ঞান করে। কিন্তু সময় সহৃদয় ও নির্মম সমালোচক, স্বজনতোষণ তার অজ্ঞাত, এই কারণে অকাব্যের স্তূপ থেকে যথার্থ উৎকৃষ্ট কাব্য বাছাই করে সে কোনো না কোনো দিন রসিকজনের কাছে পৌঁছে দেয়। তিরিশের

দশক থেকে এ যাবৎ আধুনিক কবিতা তো প্রচুর বেরিয়েছে; আধুনিক কাব্য-সংকলনে সংকলিত যথার্থ উৎকৃষ্ট কবিতার সংখ্যা দেখে কি বলা যায় আধুনিক কবিতার প্রতি সময় বিশেষ সদয় হয়েছে?

কবিতার ব্যাপারে আর যাই ঘটুক প্রতিভা অস্বীকৃত হয় না, যদিও মূল্যবোধের তারতম্যের জন্য কিছুকাল অনাদৃত থাকতে পারে। আধুনিক কবিতার মূল সমস্যাটা হয়তো প্রতিভার সমস্যা—যে-প্রতিভা সব প্রতিকূলতা এবং সহর্ষ সংবর্ধনাকে এক সূত্রে সংগ্রথিত-সম্মিলিত করার ক্ষমতা রাখে সেই প্রতিভার সমস্যা। এই সমস্যা ছাড়াও, আধুনিক কবিতার কতকগুলি লক্ষণ কবিতার স্বাস্থ্যের অনুকূল বলে মনে হয় না। আধুনিক কাব্যের কয়েকটি প্রধান স্বীকৃতি তো এই যে কাব্য বোধগম্য হওয়া অনাবশ্যক, ছন্দ অনাবশ্যক, সুপঠনীয়তা অনাবশ্যক, সুঠাম গঠন অনাবশ্যক, কেননা এসবের কোনোটাই বিশুদ্ধ কাব্যের মৌলিক লক্ষণ নয়। কারো কারো মতে চিত্রময়তা অনাবশ্যক, বিমূর্ততাই বরং আধুনিকতার লক্ষণ। এই স্বীকৃতিগুলি কোনো একক কবির নয়, সমষ্টিগতভাবে আধুনিক কবি-সম্প্রদায়ের: অন্তত আধুনিকতার অভিধা-প্রত্যাশী অধিকাংশ কবির।

আধুনিক কবিতার একটা গণনীয় অংশ দুর্বোধ্য; এ-অংশে এমন কবিতা লেখা হয়েছে এবং হয় যার অর্থোদ্ধার অভিজ্ঞ পাঠকেরও প্রায়শঃ অসাধ্য, যার বিমূর্ত ভাব আবছাভাবে কখনো কখনো পাঠকের বোধশক্তিকে স্পর্শ করে যায় মাত্র, কখনো-বা তাও করে না, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী 'এটা আধুনিক কবিতা' এই বলে হর্ষ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না।

সব কবিতার সমগ্র অর্থই যে পাঠককে মুহূর্তে উপলব্ধি করতে হবে এমন অসঙ্গত দাবি কারো নয়; অর্থোপলব্ধিও কাব্যের একমাত্র গুণ নয়, কেননা এমন অনেক কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা সম্ভব যা পাঠকমনে একটা অনুভব সঞ্চারিত করে, কিন্তু যার কোনো সুস্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত সারমর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই সঞ্চারণ, সংবেদন, পাঠককে কাব্যোপ-ভোগে সহায়তা করে। প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, চিন্তা ও অনুভব সঞ্চারণ নয়, দুরূহ কাব্যরচনাই যদি রেওয়াজে পরিণত হয়।

দুরূহ কাব্যরীতি বাংলা ভাষায় এসেছে পশ্চিম-ইউরোপের কতিপয় অতি-উল্লেখিত কবির কাব্য-মতবাদ ও রচনারীতির প্রভাবে (ঐ ভূভাগের সংশ্লিষ্ট কাব্য—বিশেষত ফরাসী কাব্য মূল ভাষায় আধুনিক বাঙালী কবি কতটা পড়েছেন আমি ঠিক জানি না)। ঐ ভূভাগের কয়েকটি মতবাদের একটি—সার-রিয়ালিস্ট মতবাদের মোটামুটি কথাটা এই: বিশুদ্ধ কবিতাকে যে বোধগম্য এবং অর্থবহ হতেই হবে তা নয়; কোনো কবিতা অর্থবহ বলেই যে কবিতা তাও নয়; কবিতার আবেদন বিশুদ্ধ কবিতা হিসাবে কাব্যবোধের নিকট, কাব্যার্থ তার আকস্মিক অনুষঙ্গ মাত্র। শব্দের ধ্বনি, মাত্রা এবং অস্পষ্ট স্মৃতি-উদ্বোধনের সমবায়ে সংবেদনশীল মনে যে অনুভবের সৃষ্টি হয় তাই বিশুদ্ধ কাব্যের আবেদন। এই রীতিতে রচিত কবিতা অচেতন মানসের উদ্বোধন মাত্র। পশ্চিমী সমালোচক এই পদ্ধতিকে তুলনা করেছেন দুর্বোধ্য লাতিন ধর্মসঙ্গীত দ্বারা নিরক্ষরা কিষাণী-বালিকাকে মুগ্ধ করার সঙ্গে।

কার্যত এইসব মতবাদ অন্তত বাংলা ভাষায় বিশেষ ফলোৎপাদন করেনি; অধিকন্তু অপব্যবহৃত হয়েছে। অপব্যবহার অনিবার্য, কেননা কোনো কিছু বলার দায় না থাকলে আর কোনো দায়ই থাকে না; ফলে কাব্যের অঙ্গনে অর্থহীন হেঁয়ালী স্তূপীকৃত হয়েছে। ইংরেজ কবি-সম্প্রদায়ের একাংশ এক সময় এইসব মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁদের অনুকরণে বাঙালী কবি-সম্প্রদায় (একাংশ)। তারপর সেই ব্যাপারটি ঘটলো: রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে পলায়নের জন্য দূরদেশী প্রভাব বরণ।

বৃটেনের পাঠকসমাজে এবং তরুণ কবিসমাজে এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। পশ্চিমী সমালোচকদের মারফত আমরা তার সংবাদ মাঝে মাঝে পাই। স্যার মোরিস বাওরা ১৯৫৬ সালে তাঁর "পোয়েট্স্ এ্যাণ্ড স্কলার্স" প্রবন্ধে এই প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন:
It was unwise to forget that almost all poetry begins by appealing to the understanding. Once it has done this, it can and must do much more; but this at least it has to do. The absence of any intelligible content is an unsurmountable obstacle. Poetry reaches its unique end and achieves its unique effect by appealing, at first at least, to the understanding.

আধুনিকতার যশঃপ্রার্থী অনেক কবির কবিতা গদ্যময়, কর্কশ, লাবণ্যহীন, বিস্রস্ততনু। কবিতার সুপঠনীয়তাকে, শ্রুতি-স্পর্শ-সৌরভ-ময়তাকে এইসব আধুনিক কবি যেন অবজ্ঞা করেন। বাঙালী পাঠক কতকগুলি মৌলিক কাব্যলক্ষণের সঙ্গে বরাবর পরিচিত এবং কতকগুলি কাব্যসংস্কারের অধিকারী। সে-সব সংস্কার ভাঙতেই যেন কোনো কোনো কবির সমধিক উদ্যম। কোনো সংস্কারই যে কুসংস্কার নয় এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু এ-উদ্যম মহৎ কবিতার জন্মদানে ব্যর্থ হয়েছে। যদি ব্যর্থ না হতো, এবং মহৎ কবিতার ফসল ফলতো তবেই মৌল কাব্যলক্ষণ বর্জন এবং পাঠকের কাব্য-সংস্কারে আঘাত হানার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হতো।

আধুনিক কবিতার প্রকৃত সমস্যাটা হয়তো আসলে যুগান্তকারী প্রতিভার অভাবের সমস্যা, প্রাক্তনের প্রভাব উত্তরণের নয়। আমরা সে-প্রশ্নে যাব না। তবে আধুনিকত্বের উল্লিখিত লক্ষণগুলি চর্চার পর পরিস্থিতিটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে সে-সম্বন্ধে কিছু বলব। এটা স্বীকৃত সত্য যে কবি যদি তাঁর প্রতিভা অনুযায়ী সঠিক মাধ্যম নির্বাচনে ব্যর্থ হন, যদি তিনি ভ্রান্ত মাধ্যম নির্বাচন করেন তাহলে ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হয়, এবং কাব্যের জমিতে যথেষ্ট ফসল ফলে না। কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক মাধ্যম কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততাকে নিষ্পিষ্ট এবং নিরুদ্ধ করে দিতে পারে।

বাংলা ভাষায় আধুনিক কাব্য-আন্দোলন বিশেষ করে যেখানে হল সেই পশ্চিমবঙ্গে অন্তত কবিতার সুদিন যাচ্ছে না; বিশিষ্ট সমালোচকেরা ক্রমাগত অনেক বছর যাবৎ অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতার একজন বিশিষ্ট ও দক্ষ সমালোচক, তিনি অনেকটা মিশনারীর কাজ করেছেন কোনো কোনো আধুনিক কবির সপক্ষে; কিন্তু সবাই তাঁর নজর দিয়ে আধুনিক কবিতাকে দেখেননি। এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুবিদিত—জীবনানন্দ দাশও অনেক সমসাময়িক কবিকে সুনজরে দেখতেন না (এমনকি কিয়দংশে পাউণ্ড এবং এলিয়টকেও)। আধুনিক কবিদের লক্ষ্য করে বাংলা ১৩৪৮ সালেই জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন: "এঁদের মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এইজন্যেই বিভিন্ন যে এঁরা সাহিত্যে কল্পনাপ্রতিভার

দাবি ('কল্পনাপ্রতিভা' বলতে দাশ-মশাই বুঝিয়েছেন ইংরেজীতে যাকে বলে imagination) সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে অকাতরভাবে মননজীবী এবং কবিতায় বিশুদ্ধ রসের কোনো রকম অবতারণার বিরোধী। আধুনিক বাংলা কবিতায় এইসব কবিই গদ্যপ্রায় পদ্যছন্দ অথবা গদ্যছন্দ অবলম্বন করে চলেছেন—এবং বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শববাহনের কাজ চলেছে এঁদের কবিতায়।" জীবনানন্দ দাশের এই অভিমত এবং তীক্ষ্ন বক্রোক্তি উপেক্ষণীয় নয়, কেননা তাঁর অভিমত একজন শীর্ষস্থানীয় আধুনিক কবির, অধিকন্তু "কবিতার কথা"য় তিনি একজন বিশিষ্ট সমালোচক।

আমি এখন পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন সুপরিচিত সমালোচকের অভিমত উদ্ধৃত করব। অমলেন্দু বসু বাংলা ১৩৬৬ সালে "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় লিখেছিলেন: "রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন-যুগেও নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ সম্ভব হয়েছিল। জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে'র পর এঁদের তুল্য মুখ্য কবি কাউকে বলা যায় না, এঁরা যে-বয়সে মুখ্যতা-সিদ্ধ হয়েছিলেন সে বয়সের কোনো নবীনতর কবি গৌণত্বের গণ্ডি ছাড়াতে পারেননি। বাঙলায় সম্প্রতি গৌণ কবির যুগ...।"

বসু-মহাশয় এখানে এক নিঃশ্বাসে একবার তিনজন এবং আরেকবার পাঁচজন কবির নাম উল্লেখ করে "মুখ্য কবি" কথা দু'টি ব্যবহার করেছেন। এই কথা দু'টি আটজন কবিকেই, অথবা শুধু পরবর্তী পাঁচজন কবিকে লক্ষ্য করে ব্যবহৃত? কথাটা খুব পরিষ্কার নয়, তবে মনে হয় পরবর্তী পাঁচজনকে লক্ষ্য করেই এই বিশেষণের ব্যবহার। অর্থাৎ বসু-মহাশয়ের বিবেচনায় নজরুল ইসলাম সম্ভবত মুখ্য কবি নন। আমি এখানে বলতে চাই—যাঁরা অনন্য-সাধারণ, যেমন শেকস-পীয়ার-গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ, এঁদের পরবর্তী পর্যায়ের কবিকেই শুধু মুখ্য কবি বলা সঙ্গত। বসু-মহাশয় ঐ আটজনকেই মুখ্য বুঝিয়ে থাকুন অথবা শুধু পরবর্তী পাঁচজনকেই, তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। এঁদের মধ্যে শুধু নজরুল এবং জীবনানন্দই স্বকীয়তায় সমধিক সমুজ্জ্বল। অন্যান্যদেরও স্বকীয়তা কিছু-না-কিছু আছেই, সার্থক নূতন কবিতা এঁরা কিছু লিখেছেন, কিন্তু মুখ্য কবি কেবল তঁাদেরই

বলা সঙ্গত যাঁরা যথেষ্ট সংখ্যক স্মরণীয় হৃদয়-সংবেদ্য মহৎ কবিতা রচনা করেছেন—যেমন ডান বা শেলী বা কীটস্। নজরুল এবং জীবনানন্দ ছাড়া অন্যান্য কবির কয়েকটির বেশী কবিতা সমসাময়িক রেওয়াজ উত্তীর্ণ হয়ে এবং কাল-পরিস্রুত হয়ে গবেষকের নয়, রসিক কাব্যপাঠকের স্থায়ী আনন্দসঙ্গী হতে পারবে, আধুনিক কবিতার সংকলনগুলি অন্তত সে-ভরসা দেয় না। হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থগুলিতে, এবং কোনো তরুণ সমালোচক, ঐ পঞ্চকবির কোনো কোনো কবিকে এখনই বিশেষ মূল্য দেন না।

অমলেন্দু বসুর এক বছর পরে ১৩৬৭ সালে হরপ্রসাদ মিত্র একই পত্রিকায় লিখেছিলেন: "এক যুগ পরে আর এক যুগ আসে। বাংলা কবিতার উনিশ শ' চল্লিশের দশকের শেষ প্রান্ত থেকে আজ এই উনিশ শ' একষট্টি পর্যন্ত অন্য বিশেষত্বহীন একটা পর্বই শুধু চলছে। এ কোনো যুগ নয়,—একে বরং সুদীর্ঘ, অতি-প্রলম্বিত এক যুগাবসান বলাই সঙ্গত।" একই সংখ্যায় অশোক মিত্র লিখেছিলেন: "মনে হয় না গত দশ বছরে বাংলা কবিতা সামান্যতম এগিয়েছে।"

এর প্রায় তিন বছর পরে ঐ পত্রিকার একটা বিশেষ কবিতা-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। "চতুরঙ্গ"-এর মতো অভিজাত পত্রিকার এরূপ একটি সংখ্যায় বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ কৃতি প্রতিফলিত ও আলোচিত হবে এমন আশা করাই স্বাভাবিক। ঐ সংখ্যায় অশোক মিত্র লিখেছিলেন: "তরুণরা কুপিত হবেন, কিন্তু বাংলাদেশে কবিতার ঋতু, প্রায়ই মনে হয়, হয়তো আর শীগগির ফেরবার নয়...। যা চোখে পড়ে তা অনেকের সমস্বর স্বগত সংলাপ, যার আকুতির আবেগ স্পষ্ট, কিন্তু এখন পর্যন্ত যার কোনো অবয়ব নেই। যা আদৌ চোখে পড়ে না তা কোনো প্রেমের বা প্রত্যয়ের বা জীবনবোধের উচ্ছল চীৎকার: কবিতার ধারা শান্ত হয়ে এসেছে, কবিতা টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, আধমিনিটের জন্য হয়তো কোনো কবিতা পছন্দ করা যায়, কিন্তু গেল দশ বছরের অধিকাংশ কবিতাই জীবন থেকে অবচ্ছিন্ন, দেশ এবং জনতা থেকে স'রে যাওয়া নিরালম্ব বস্তু..."

কেন আধুনিক কবিতার এই অধঃপতন? কারো কারো মতে সমাজ ও সংস্কৃতির (এবং সেই সঙ্গে মূল্যবোধের) অবক্ষয়ই এর

মূলীভূত হেতু। এই অভিমতের যৌক্তিকতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও ওঠে, কাব্যের সমৃদ্ধি ঘটে কোন্ লগ্নে—সমাজ ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির লগ্নে, না অধঃপতনের লগ্নে? এ সম্বন্ধে নিশ্চিত-ভাবে কিছু বলা যায় বলে মনে হয় না। মহৎ কাব্যের মূলে সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নত মান থাকা সম্ভব, কিন্তু এই দু'য়ের অধোপতনের কশাঘাতও কি সমাজের কাব্যপ্রতিভাকে অনেক সময় দুরন্তগতি করতে পারে না, বাংলা কাব্যেই করেনি? প্রতিভার প্রশ্ন তো আছেই, কিন্তু এখানে যা প্রাসঙ্গিক তা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের সমালোচকরাই আধুনিক কবিদের দুরূহতা, ছন্দোহীনতা, গাদ্যিকতা ইত্যাদি বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তবে মনে হয় এরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে তাঁরা এখনো পৌঁছেননি যে, এই লক্ষণগুলির চর্চা বাংলা কবিতার অনেকখানি স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছে পুষ্পকোরকে কীটের মতো। কিন্তু কথাটা বিবেচনা-যোগ্য।

কাব্যপথের কিশোর পথিক প্রথমত অগ্রজদের অনুকরণের মধ্যে দিয়েই নিজেকে আবিষ্কার করেন। অনুকরণের মূল প্রেরণা তিনি তাঁর সুপ্ত কবি-স্বভাব থেকেই শুধু পান না; অগ্রবর্তীদের জাদুতেও কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐ জাদু প্রধানত ছন্দ-ধ্বনি-বাণীময়তার জাদু। ঐ জাদু তাঁর ঐতিহ্যের অন্তর্গত। এ তাঁর সম্পদ, এ তাঁর সমৃদ্ধ উত্তরা-ধিকার। তিনি যখন পড়েন 'জল পড়ে পাতা নড়ে' তখন তাঁর কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়, ভাবী কবিগুরু আদিম কবিতার আস্বাদনে বিমুগ্ধ হন, প্রতিভার জাগরণ আসন্ন হয়ে ওঠে। সূর্যের দীপ্তিতে অনেক গ্রহও দীপ্ত হয়। কিন্তু ছন্দ-মিল-ধ্বনিময়তা-বাণীময়তা যখন কুসংস্কার তখন সে-উদ্বোধন, সে-জাগরণ কি করে সম্ভব? আধুনিক-পূর্বকালের তুলনায় অনেক অনেক দরিদ্র ঐতিহ্য নিয়ে এ-কালের কিশোর কবির যাত্রাশুরু। চতুর রহস্যময়তা, দুরূহতা ও কর্কশ গাদ্যিকতার অপরূপ খ্যাতির তিনি আবাল্য শিকার। তিরিশের দশকের পর পশ্চিমবঙ্গীয় কবিতার ক্রমিক অধোগতির এই একটা প্রধান হেতু। এইসব কাব্যলক্ষণ মাঝে মাঝে হ্রাস পেলেও, "চতুরঙ্গ" পত্রিকার সাম্প্রতিক বিশেষ কবিতা-সংখ্যা দেখে মনে হয়, সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে।

এখানে আমার বক্তব্য কিন্তু এই নয় যে অমিত্রাক্ষর কবিতা অথবা গদ্য-কবিতা অবাঞ্ছনীয়; অথবা এরূপ কবিতা মহত্ত্বে মণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। তা সম্ভব, এবং তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথে ও জীবনানন্দ দাশে যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের অন্তত একজন কবি—সমর সেন—খ্যাতিমান হয়েছেন গদ্য-কবিতা লিখেই। আমি এখানে এই বলতে চাই যে ছন্দ এবং মিল মধ্যযুগীয় ব্যাপার, এই দু'টিকে বর্জন না করা অবধি কবিতা আধুনিক হতে পারে না এমন ধারণার প্রতিবাদ ছন্দ ও মিলযুক্ত অসংখ্য উত্তীর্ণ আধুনিক কবিতা। বিশুদ্ধ কাব্যত্বের জন্য ছন্দ ও মিল অপরিহার্য নয়; বস্তুত ছন্দ ও মিলের উপর যাঁদের স্বাভাবিক অধিকার নেই যাঁদের পক্ষে এ দু'টি কৃত্রিম কসরৎ মাত্র, এবং তাঁদের আত্মপ্রকাশের অন্তরায়। কিন্তু এমন অনেক কবি আছেন এবং বরাবর ছিলেন ছন্দ ও মিল যাঁদের জন্য একান্ত স্বাভাবিক, যাঁদের প্রকৃতির অঙ্গ। ছন্দ ও মিলেই তাঁরা সাবলীল, অনুপ্রাণিত এবং উল্লসিত। এই প্রকৃতি-ভেদের অস্বীকৃতি, এবং ছন্দ ও মিলের চেষ্টাকৃত অস্বীকৃতিই বরং কৃত্রিমতা। গদ্যকবিতাই আধুনিকতা এই জনশ্রুতি অনেক কবিকে তাঁর ছন্দ ও মিলের স্বাভাবিক প্রবণতা ও এতদ্‌সংক্রান্ত সম্ভাবনা থেকে আত্মবিচ্ছেদে ও আত্ম-অবদমনে প্ররোচিত করেছে, এবং কাব্যের অঙ্গনে এমন অনেক নায়কের অনুপ্রবেশ রটিয়েছে যাঁদের ক্ষেত্রে এটা নয়, অন্য কিছু, অথবা কিছুই নয়।

॥ ৩ ॥

দুরূহতা, চিন্তায় ও প্রকরণে সুদূরাশ্রয়িতা, চতুর রহস্যময়তা, গাদ্যিকতা ও অন্যান্য লক্ষণের অতিরিক্ত চর্চা কবিতার স্বাস্থ্যের পক্ষে যে প্রতিকূল, পশ্চিম-জগতে এবং পশ্চিমবঙ্গে তা প্রায় প্রমাণিত; তা সত্ত্বেও ওঁদের দেখাদেখি পূর্ব-পাকিস্তানের কারো কারো কবিতায় সেইসব লক্ষণচর্চা চলছে। কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থে, এবং কোনো কোনো সাময়িক পত্রে তার নমুনা দেখা যায়। ছন্দ, ধ্বনি, অর্থময়তা, সুঠাম গঠন, লাবণ্য এসবকে মনে হয় কেউ কেউ কুসংস্কার বিবেচনা করেন। শুধু এসবের সম্মিলনে কবিতা হয় না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক কবিতা যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে তবে তা এই যে, অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংস ব্যতীত কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আধুনিক বলে আশ্বাস দেওয়া হয়

এমন বহু কবিতার প্রায়শ: কোনো বক্তব্য নেই: এই বক্তব্য ব্যতীত, চিন্তাকে কেন্দ্র করে শুধু নয়, অনুভবকে কেন্দ্র করে কোনো বক্তব্য ব্যতীত কবিতা একটা কাঠামো মাত্র। আধুনিক কবিতা অনেক সময় এই কাঠামো-চর্চা, আঙ্গিকচর্চা, তাও বিকলাঙ্গের। আধুনিক কবি আত্ম-প্রকাশের উত্তাপে নব নব প্রকরণ উদ্ভাবন করেন না, পশ্চিমী সাহিত্য-অধ্যয়নলব্ধ প্রকরণ-জ্ঞান ও ভাববস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন, "বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজসংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।" কথাটা কি খুব ঠিক? সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ করলে কল্পতরু জন্মানো সম্ভব; কিন্তু এখনও—('এখন' বলতে সুধীন্দ্রনাথের সমকালকেই ধরছি)—সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ-সংগ্রহ না করলেও কাব্যের কল্পতরু অন্তত বাংলা ভাষার অঙ্গনে জন্মায়, যেমন তাঁর প্রায়-সমবয়সী নজরুল ইসলাম এবং আরও দু'একজন পূর্ব-পাকিস্তানী কবির কবিতা—অবশ্য তাঁদেরকে আধুনিক বলে গণ্য করা হয় না; এবং সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজসংগ্রহ করলেও কাব্যের কল্পতরু সবসময় জন্মায় না, সুধীন্দ্রনাথেরই কবি-জীবনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—চল্লিশের দশকে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। তাঁর এই উক্তিতে একটি ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে মনে হয়: তা হচ্ছে সহজাত কাব্যপ্রতিভা; এবং আরেকটি ব্যাপারকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: তা হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়ন এবং সে সাহিত্য থেকে ভাববস্তুর প্রেরণা ও প্রকরণ সংগ্রহ। মৌলিক কাব্যপ্রেরণার জন্য মনে হয় এ একটা কঠিন শর্ত; অন্তত কাব্যোপ-ভোগের জন্য এ একটা অতিশয় কড়া শর্ত। সোনার হরিণের পেছনে পেছনে ছুটতে সবসময় রাজী—কোনো সময় ক্লান্ত বা অনিচ্ছুক নন—এমন পাঠকের সংখ্যা এই কর্মব্যস্ত শতাব্দীতে বিরল হওয়াই স্বাভাবিক।

সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানে যে আধুনিক কবিতা লেখা হচ্ছে তার আগে থেকেই এ প্রদেশে একটা মোটামুটি সমৃদ্ধ কাব্যধারা প্রবহমান। স্বাধীনতার লগ্নে যে-সব কবি পূর্ণ-পরিণতি অথবা আংশিক পরিণতি লাভ করেছিলেন এবং তখন থেকে অথবা তারপরে পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বদেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, স্বাধীনতার পূর্বে অথবা পরে তাঁরা সাধারণত আধুনিকতার চর্চা করেননি (তাঁদের সকল কবিতাকেই

পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্যধারার অন্তর্গত ধরছি)। ঐ লগ্নে যাঁরা প্রবীণ হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা হয় রবীন্দ্রনাথের না হয় নজরুল ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং কিয়দংশে তিরিশের ভাবধারাও তাঁদের স্পর্শ করেছিল; কেউ পল্লীসাহিত্য আত্মস্থ করে নূতন কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন; যাঁরা নবীন ছিলেন তাঁরাও কেউ কেউ রবীন্দ্র-নজরুল-ইকবাল এবং আধুনিক কবিদের দ্বারা ঈষৎ প্রভাবিত ছিলেন অথবা মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন; পরেও কতকটা সেই রকম চলছে; কিন্তু যে-সব লক্ষণের কথা আমরা বিবেচনা করছি সে-সব লক্ষণের বিচারে তাঁরা কেউ পুরোপুরি 'আধুনিক' ছিলেন না। বিভিন্ন হৃদয়াবেগ, মধ্যবিত্তের বঞ্চনাবোধ, মুসলিম স্বাতন্ত্র্যচেতনা এবং অন্যান্য বিষয় ও অনুভব নিয়ে স্বাধীনতার আগে ও পরে বাণীময়তায়, ছন্দ-প্রিয়তায়, ধ্বনিময় শব্দ-ব্যবহারে, চিত্রময়তায়, সুঠাম ভাস্কর্যে তাঁরা অপেক্ষাকৃত 'অনাধুনিক' বাংলাকাব্যের ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের কিছু বলবার ছিল এবং প্রকাশ করার মতো ছিল গভীর আবেগ। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা এসবের কথা বলতে চেয়েছেন, এই কারণে তাঁরা কিছু বলতে পেরেছেন এবং পাঠযোগ্য কবিতা লিখতে পেরেছেন।

কবিতা আধুনিক হোক অথবা শুধু সাম্প্রতিক, সমকাল-চেতন অথবা বিশেষ কোনো ঐতিহ্যচেতন ও নিয়তি-চেতন, এবং বিশ্বাস ও প্রত্যয় সম্বন্ধে যাঁর যেরূপ ধারণাই থাকুক, যা কবিতা তা কবিতা হিসাবেই স্বীকার্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, একথা বলা চলে বলে আমার ধারণা যে, চল্লিশের দশকে যাঁদের খ্যাতির সূচনা মোটামুটিভাবে তাঁদের সমবয়সীদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ধরলে, পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের তুলনায় বাংলাদেশীয় কবিরাই পাঠযোগ্য ও প্রকৃত কবিতা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে লিখেছেন, এবং প্রকৃত প্রতিভার লক্ষণ বস্তুত তাঁদের কবিতায়ই অভ্রান্ত। তাঁদের কবিতা বিশেষত্বহীন নয় এবং যুগাবসানে তাঁদের অবস্থিতি নয়। চল্লিশের দশকে, পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের দশকে তাঁরা সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, একক আধিপত্য কারো নয়, কিন্তু যৌথভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে; এবং এ ধারা পরিপুষ্টিমান। তাঁদের উপর বিভিন্ন প্রভাব আছে, কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে সেইসব প্রভাব আত্মস্থকরণ, আত্ম-আবিষ্কার এবং সৃষ্টিশীলতা। চল্লিশের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের তুলনায় বাংলাদেশীয়

কবিদের সৃষ্টিশীলতা অধিকতর সক্রিয়; তাঁদের কবিতা অধিকতর সুগঠিত ও দৃঢ়পেশী।'

এই অভিমতের স্বীকৃতির জন্য সমালোচক ও কাব্যপাঠকের কিছু মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, ওদেশেও এবং এদেশেও। কাব্যের মূল্যনির্ণয়ে অনেক সময় তারতম্য হয় প্রতিকূল রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং অন্যবিধ সংস্কারবশত। এইসব সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে কাব্যোপভোগ সুদূরপরাহত। কবি তাঁর প্রত্যয়ের অথবা প্রত্যয়হীনতার (প্রত্যয়হীনতাই অনেক সময় অন্য এক ধরনের প্রত্যয়) অভিব্যক্তিতেই সার্থকতা খোঁজেন এবং এর সপক্ষে অথবা বিপক্ষে যার যা-কিছুই বলার থাকুক, একটা কবিতা লেখা হয়ে গেলে তা শেষ পর্যন্ত কবিতা হিসাবেই বিবেচ্য। কাব্যোপভোগের আরেকটি প্রতিবন্ধক আধুনিকতা-অনাধুনিকতা সম্পর্কিত সংস্কার। কবিতা আধুনিক না হলেই নিরর্থক হয় না। স্থির মনে বিভিন্ন সংস্কার জয় করা সম্ভব হলে, কাব্যের আপেক্ষিক লক্ষণসমূহের পরিবর্তে স্থায়ী লক্ষণসমূহের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে, শক্তির প্রকাশকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত থাকলে এবং কোলরিজ যাকে বলেছেন willing suspension of disbelief তা সম্ভব হলে, সহৃদয় পাঠক উল্লিখিত কালবৃত্তে বাংলাদেশীয় কাব্যেই অধিকতর সংখ্যক পাঠযোগ্য ও উপভোগ্য কবিতার, এবং প্রকৃত কবিতার, সন্ধান পাবেন।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বাংলাদেশীয় কবিতার সর্বাঙ্গীণ কুশল। এই কবিতার একাংশ সম্প্রতি আধুনিকতার এমন কিছু লক্ষণাক্রান্ত যা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে উত্তম ফলোৎপাদন করেনি; এখানে করবে এমন ভরসা করা যায় না। এ এক ধরনের পশ্চিমমুখীনতা, এবং বদ্ধমানসিকতাও। বাংলাদেশের কবিতায় অন্য ধরনের বদ্ধমানসিকতার হয়তো অবসান হয়ে আসছে (এ-সম্বন্ধে অন্যত্র আমি কিছু বলেছি), কিন্তু ঐ পশ্চিমমুখীনতা হয়তো আরও কিছুদিন চলবে। কিন্তু পরিস্থিতির এটা একদিক। অন্য দিকে এমন কবিও কিছু আছেন যাঁরা দুরূহ না হয়েও আধুনিক। তাঁরা চিন্তা ও অনুভব করেন এবং তা সঞ্চারণে ইচ্ছুক। তাঁরা ধ্বনি, চিত্রময়তা, ছন্দ ও কবিতার সুঠাম গঠনকে অস্বীকার করেন না। তাঁদের কেউ কেউ

গান এমনকি ছড়াও লেখেন। (রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলাম নামক দু'জন প্রাচীন কবির পরে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও উৎকৃষ্ট কবিতার একাত্ম সম্মিলন খ্যাতনামা আধুনিক কবিদের অনুমোদিত, অথবা সে-ক্ষমতা তাঁদের আয়ত্তাধীন ছিল, অথবা আছে কিনা, আমি ঠিক জানি না) বাংলাদেশীয় কবির কবিতায় বিপুল-বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে দেশ-কাল-মানুষ এবং মৃত্তিকা-চেতনাও সংগ্রথিত। এঁদের মধ্যেই নূতন ও প্রকৃত প্রতিভাকে আমরা হয়তো একদিন চিনতে পারবো। বাংলাভাষায় রচিত কবিতাব ভবিষ্যৎ আপাতত পশ্চিমবঙ্গে সম্ভাবনাহীন; এখানকার কবিতার হস্তে হয়তো সেই ভবিষ্যৎ ধৃত—যদি সেখানকার মতো অস্বাভাবিকতার সাধনায় এখানকার কবি আত্ম-অপচয় না করেন।

১৯৬৭

সাহিত্য-উপভোগ ও সংস্কৃতি

সাহিত্যের পাঠক অনেক রকম হতে পারেন। তিনি এরূপ নীতিবাদী হতে পারেন যে সাহিত্যে কতটা নীতিকথা প্রচার করা হয়েছে অথবা হয়নি, অথবা, তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী, কতটা নীতি-বিগর্হিত বস্তু সাহিত্যকে কলুষিত করেছে শুধু তাই তিনি দেখবেন। গোঁড়া ধর্মবাদী পাঠক সাহিত্যকে একই ভাবে দেখতে পারেন তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় ধারণা এবং দৃষ্টিকোণ থেকে; এবং তেমনি নিজের আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন গোঁড়া রাজনৈতিক আদর্শবাদী—নানা রকমের। এঁরা সাহিত্যের প্রকৃত পাঠক নন। কোনো নীতিবাদী অথবা ধর্মবাদী অথবা রাজনীতিকই সাহিত্যের পাঠক হতে পারেন না এবং সাহিত্য উপভোগ করতে পারেন না যদি একই সঙ্গে সাহিত্য-উপভোগের মতো শিক্ষা, রুচি এবং রসবোধ তাঁর না থাকে। আমি এখানে এই বলছি না যে নীতিবাদী, ধর্মবাদী অথবা রাজনীতিক সাহিত্যের পাঠক হতে পারেন না, অথবা সাহিত্যের পাঠক নীতিবাদী অথবা ধর্মবাদী অথবা রাজনীতিক হতে পারেন না। আবহমান কাল ধরে হয়ে আসছেন। আমি এই বলতে চাই যে যাঁদের চিন্তায় ও অনুভবে নীতিবাদ ধর্মবাদ অথবা নানা রকমের গোঁড়া রাজনৈতিক আদর্শের একান্ত এবং সার্বভৌম আধিপত্য এবং যাঁরা শুধু এইসব "বাদ"-এর অথবা রাজনৈতিক আদর্শের গজকাঠিতে সাহিত্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে উৎসাহী তাঁরা সাহিত্যের প্রকৃত পাঠক নন। কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পালন না করলে যেমন কেউ নিজেকে প্রকৃত নীতিবাদী অথবা ধর্মবাদী অথবা রাজনৈতিক আদর্শবাদী বলে দাবি করতে পারেন না, তেমনি কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পালন না করলে কেউ প্রকৃত রসজ্ঞ সাহিত্য-পাঠক হতে পারেন না।

সাহিত্য-উপভোগের একটি প্রাথমিক শর্ত এই যে, সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে নিতে হবে। শুধু এভাবেই সাহিত্য উপভোগ করা

সম্ভব। এভাবে নিতে না পারলে সাহিত্য উপভোগ করা সুকঠিন এবং সাহিত্যের প্রকৃত রসজ্ঞ পাঠক হওয়া প্রায় অসম্ভব, কেননা পৃথিবীতে, এমনকি যে কোনো দেশে ও সমাজে নৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আদর্শ এক নয়, বহু এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরুদ্ধ।

সাহিত্য-উপভোগের ক্ষেত্রে এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে যে একজন পাঠক একজন লেখকের রচনাবলী উপভোগ করতে পারেন না, অথবা একজন লেখকের বিশেষ কোনো রচনা উপভোগ করতে পারেন না— রুচিগত কারণে। কিন্তু এটা ব্যক্তিগত সমস্যা। এই ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে দলগত অথবা সম্প্রদায়গত অথবা দেশগত নীতিতে পরিণত করতে চাইলে বহুগুণ জটিলতর সমস্যার উদ্ভব হয়: কেননা সাহিত্যের উদার উন্মুক্ত জগৎ ত্যাগ করে বিস্তৃত পাঠক-সমাজ বিভিন্ন অসাহিত্যিক মতামতের অলিগলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আস্তানায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিপদ দেখা দেয়; এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় যখন একদল অন্য দলের, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের এবং এক দেশ অন্য দেশের সাহিত্য উপভোগ করতে চাইবে না এবং উপভোগ করতে পারবে না। এর অর্থ এই যে বিচ্ছিন্নকরণ নীতি অপরকে বিচ্ছিন্ন করবে না শুধু, নিজেকেও অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। অপরকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রকারান্তরে নিজেকে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করাও। অধিকন্তু মানব-সমাজের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, আমি অপরকে স্পর্শ করা অবাঞ্ছনীয় জ্ঞান করলে অপরেও আমাকে স্পর্শ করা অবাঞ্ছনীয় জ্ঞান করবে।

কোনো লেখকের সমগ্র রচনাবলী, অথবা তাঁর বিশেষ কোনো রচনা অথবা আদৌ সাহিত্য পাঠ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই; পাঠে অসমর্থ হলে, অথবা পাঠ করে উপভোগ করতে না পারলে সবিনয়ে সে কথা স্বীকার করাই ভালো। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে পাঠক সংস্কৃতিবান কিনা, অথবা হলেও কি ধরনের সংস্কৃতিবান এরূপ প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়। লেখকের লক্ষ্য শুধু শিল্প হতে পারে, অথবা গভীর জটিল নির্মম জীবন, তবে বহু ক্ষেত্রে মূলত নৈতিকতা, ধর্মবোধ অথবা রাজনৈতিক আদর্শপ্রাণতাও হতে পারে; বস্তুত সব সাহিত্যেরই একটা বিস্তৃত অংশ প্রেরণাগত বিবেচনায় এইসব শ্রেণীর অন্তর্গত। এবং অনেক সময় এমনও ঘটে থাকে যে, এইসব লক্ষ্যের মূলীভূত প্রত্যয়ের একতারা

অবলম্বন করেই তিনি সমাজের লুব্ধ ক্রুদ্ধ কোলাহলের মধ্যে সুরের মোহন জাল বিস্তার করেন। কিন্তু মূল লক্ষ্য যাই থাক, এরূপ রচনা অনেক সময় লেখকের অজ্ঞাতসারে এমন অলৌকিক আলোকে মণ্ডিত এবং সর্বজনীন অনুভবে জীবন্ত হয়ে ওঠে যে সেইসব লক্ষ্য অতিক্রম করে তা সর্বজনীন আবেদনে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। লক্ষ্য তখন হয়ে ওঠে উপলক্ষ। সেটা হয়ে ওঠে কিনা, এবং কি পরিমাণ হয়ে ওঠে তার উপরেই নির্ভর করে রচনা-বিশেষ সাহিত্য কিনা অথবা আংশিক সাহিত্য, অথবা প্রচার-পুস্তিকা মাত্র। সাহিত্যের লক্ষ্য অথবা উপলক্ষ যাই হোক, তা যদি মহৎ সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তাহলে তার যে হার্দ্য আবেদন, যে সুরের অনুরণন, যে অলৌকিক আলোকের বিচ্ছুরণ তাতে সাড়া দিতে পারছেন কিনা তা থেকে বোঝা যায় পাঠক প্রকৃত রসজ্ঞ কিনা। সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিবান রসজ্ঞ পাঠকই যথার্থ সাহিত্য উপভোগ করতে পাবেন।

সাহিত্য-উপভোগের রুচি ও সামর্থ্য সংস্কৃতির লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিবিধ ললিতকলা উপভোগের রুচি ও সামর্থ্য, উন্নত মূল্যবোধ, চিন্তা ও অনুভবের সূক্ষ্ম ও মার্জিত আচরণ ইত্যাদি। এইসবের অনুশীলন থেকে যিনি বিরত তাঁকে কেউ সংস্কৃতিবান বলে না। সমাজ সম্বন্ধেও সেই কথা। সমাজের নৈতিকতা-বোধ ধর্মানুভূতি অথবা আদর্শবাদ যাই হোক, সংস্কারমুক্ত মনে সাহিত্য ললিতকলা ও বিবিধ শিল্প উপভোগের উপযোগী মানসিকতা ও রুচির অনুশীলন কে কতটা করতে পেরেছেন তা থেকে বোঝা যায় ব্যক্তি এবং তাঁর সমাজ সংস্কৃতির কোন্ পর্যায়ে অবস্থিত।

সাহিত্যকে কেউ কেউ ওজন করতে চান নিজের নীতিবোধ, রাজনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদির বাটখারা দিয়ে। ছোটখাটো ব্যাপারে হয়তো বোঝা যায় না কিন্তু মহৎ প্রতিভাকে একই বাটখারা দিয়ে ওজন করতে গেলে সেই নীতিবাদী, রাজনীতিক অথবা ধর্মবাদীর ওজনই ধরা পড়ে। ব্যাপারটা শোচনীয় হয়ে ওঠে যখন লেখককে সমগ্রভাবে অবলোকন এবং উপলব্ধি না করে তাঁর একাংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়, এবং ঐ অংশকেই বলা হয় সমগ্রে সমান। এরূপ বিচার পাঠককে এমন কানাগলিতে নিয়ে যেতে পারে যেখানে রুচি-বিভ্রান্তি অনিবার্য। দেশী-বিদেশী কয়েক-জন কবি ও নাট্যকারের উদাহরণ দিলে এ-সঙ্কটের স্বরূপ কিছু বোঝা যাবে। ইংরেজী সাহিত্যের মার্লো, ড্রাইডেন, শেলী; নরওয়েজীয়

সাহিত্যের ইবসেন ; বাংলা সাহিত্যের নজরুল ইসলাম—এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দীপ্ত ; এমনকি কারো কারো আলোকে সমগ্র মানব-সংস্কৃতি আলোকিত। এঁদেরকে বয়কট করার অর্থ মানব-সংস্কৃতির কয়েকটি প্রোজ্জ্বল বিন্দুকেই বয়কট করা। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে খুব কড়াকড়ি করলে এইসব কবি ও নাট্যকারকেও বয়কট করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব। 'ট্যাম্বারলেন' নাটকে মার্লো এক খ্যাতনামা মুসলিম দিগ্বিজয়ীকে রক্তপিপাসু রণ-দানবরূপে চিত্রিত করেছেন ; ড্রাইডেন তাঁর 'আওরঙ্গজেব' নাটকে তাজমহলের স্রষ্টা এবং তাঁর বেগমকে চিত্রিত করেছেন অবৈধ কামনার অবতাররূপে ; 'হেলাস' কাব্য-নাটকে শেলী এক তুর্কী সুলতানকে এরূপ নীচ নিষ্ঠুররূপে চিত্রিত করেছেন এবং এভাবে স্বধর্মীয়দের উত্থান কামনা করেছেন যা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ; (তিনি ঐ নাটকের প্রস্তাবনায় হজরত মোহাম্মদের আত্মাকে অবতীর্ণ করে তাঁরা দ্বারা অশোভন উক্তি করিয়েছেন) ; ইবসেন তাঁর 'পীয়ার গিণ্ট' নাটকের একটি দৃশ্যে 'পয়গম্বর' (প্রফেট) শব্দটি বার দশেক এরূপ তাৎপর্যসহ ব্যবহার করেছেন যা বিশদভাবে আরবের পয়গম্বরদের প্রতি অমর্যাদাসূচক (অধিকন্তু কা'বা শরীফের উদ্দেশেও উদ্ভট উক্তি করা হয়েছে) ; নজরুল ইসলামের এরূপ কতকগুলি গান আছে যা শিব-দুর্গা-সরস্বতী-শ্যামা-বন্দনারই নামান্তর।

এসব সাহিত্য-কর্মের প্রায় প্রতিটিই আমাদের পক্ষে আপত্তিকর। কিন্তু স্বাধীনতার আমলে এদেশে এসবের কোনো সমালোচনা অন্তত আমার চোখে পড়েনি। বস্তুত এইসব কবি ও নাট্যকার এসব কারণে কুখ্যাত নন, কেননা তাঁদের সমগ্র সাহিত্যকর্মের তুলনায় এগুলি এত সামান্য যে অনেকের নজরেই পড়ে না। তাঁদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ব্যাপকতর মহত্তর অবদানের উপর স্থাপিত। তাঁদের সম্বন্ধে রসজ্ঞ সমালোচকদের যা বক্তব্য তার মধ্যে এসব প্রসঙ্গের গুরুত্ব সামান্যই। তাঁদের সমগ্র কৃতিত্বের জন্যই তাঁরা রসজ্ঞ পাঠক-সমাজে পঠিত ; অধিকন্তু ইবসেন ব্যতীত অন্যান্যরা পাকিস্তানের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও পঠিতব্য। তথাপি বিশেষ করে উক্ত প্রসঙ্গসমূহের উল্লেখ করে কেউ তাঁদের সমগ্র মহৎ কীর্তিকে অবজ্ঞা করতে পারেন ; কিন্তু তা স্থিতধী রসজ্ঞ পাঠকের কাজ হবে না ; অধিকন্তু তিনি কিছু আলোককেও বয়কট করবেন, যার অর্থ প্রকারান্তরে অন্ধকারকেও বরণ করা।

কোনো লেখককে সমগ্রভাবে না জানলে প্রকৃত জানা হয় না। অংশ কখনো সমগ্রের সমান নয়। এটা জ্যামিতির শুধু নয়, সাধারণ জ্ঞানেরও একটা প্রাথমিক কথা। সকল লেখককে সমগ্রভাবে উপভোগ করা সকলের পক্ষে সম্ভব না হতে পারে; কিন্তু অংশকেই—এমনকি অপ্রধান অংশকেও—সমগ্র বলে জানা সত্যিকারের জানা নয়। এটা জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা; এমনকি এক ধরনের অজ্ঞানতা। কেউ কেউ আবার এখানেও ক্ষান্ত হন না। তাঁদের বক্তব্য, বিশেষ বিশেষ লেখককে এই যে আংশিকভাবে দেখা, এটাই চরম দেখা, এবং এভাবে দেখাই সকলের উচিত; কোনো সুপুরুষ ব্যক্তির শরীরে কোথাও একটি কি দু'টি ফোড়ার চিহ্ন থেকে থাকলে, সেটাকেই ঐ ব্যক্তির সমগ্র পরিচয় বলে জানা সকলের পবিত্র কর্তব্য, এবং এই পবিত্রতায় সন্দেহ এক ধরনের বিশ্বাসহীনতা। পৃথিবীকে প্রসন্ন মনে, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, নির্ভীক চিত্তে কোনো কোনো সমাজ বহুদিন যাবৎ নিরীক্ষণ করতে পারেনি। সেইসব সমাজ যেখানে যা-কিছু ভালো তাকে আহরণ করেনি, সন্দিগ্ধ চিত্তে বর্জন করে এসেছে; মনের দিক দিয়ে এখনো যে পৃথিবীর কতিপয় সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিম্নতম স্তরে, তার একটি প্রধান কারণ এই, আমার মনে হয়।

১৯৬৮

শিক্ষা ও সাহিত্য

শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শিক্ষার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বহুলাংশে সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত; বিশেষ করে ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতার কথা বিবেচনা করলে তা বোঝা যায়। কোনো একটা সাহিত্য—সৃষ্টিমূলক সাহিত্য নয় শুধু, ব্যাপকতর সাহিত্য—একটা ভাষাকে কতখানি প্রকাশক্ষম করে তুলতে পারে তার ওপর নির্ভর করে ঐ ভাষা যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়কে সন্তোষজনকভাবে প্রকাশ করতে পারে কিনা। কিন্তু এখানে আমার প্রধান বক্তব্য শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পর্কের এই দিকটা নয়। আমার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বহুলাংশে শিক্ষার উৎকর্ষ-অপকর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত। আরেকটু সংক্ষেপে এবং অন্যভাবে বললে, সাহিত্যের উৎকর্ষ বহুলাংশে শিক্ষার উৎকর্ষের ওপর নির্ভরশীল, যদিও 'সংযুক্ত' এবং 'নির্ভরশীল' বলতে ঠিক এক কথা বোঝায় না।

শিক্ষা বলতে আমি এখানে বোঝাচ্ছি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষা, তবে বিশেষ করে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক, অর্থাৎ উপাধি-পূর্ব, স্তর অবধি। সাহিত্যিক এই স্তরেই তাঁর মাতৃভাষা—অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যচর্চার স্বাভাবিক ভাষা—শিক্ষা করেন, সাহিত্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন, সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। সাহিত্যিকের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট নয়; এর বাইরেও নানা সূত্রে তাঁকে সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করতে হয়, যেমন বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এবং কোনো অগ্রজ সাহিত্যিকের সংশ্রবে এসে। কিন্তু সাহিত্যের পাঠ গ্রহণের জন্য অন্তত উপাধি-পূর্ব স্তর অবধি শিক্ষা তাঁর জন্য অপরিহার্য। আমি এমন বলছি না

যে এই নিয়ম চিরকাল ছিল অথবা অপরিহার্য ছিল এবং এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। মধ্যযুগের স্মরণীয় কবিরা আজকের মত শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করেছিলেন কিনা, এবং আজকের মতো সংগঠিত ও স্তরবিভক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা সেকালে ছিল কিনা আমি ঠিক জানি না। তবে এ যুগে সংগঠিত ও স্তরবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতীত শিক্ষার ব্যাপক অগ্রগতি, এবং সাহিত্যের প্রয়োজনীয় পাঠ গ্রহণ, সাধারণত সম্ভব বলে মনে হয় না। অবশ্য কয়েকটি উজ্জ্বল উদাহরণ অন্য কথা বলে। রবীন্দ্রনাথ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এবং নজরুল ইসলাম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা অবধি বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেননি। ব্যক্তিগত পাঠোদ্যম ও প্রতিভা-বলেই তাঁরা বরেণ্য কবি হতে পেরেছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে এরকম ঘটনা খুবই বিরল। তবে এটাও কি মাঝে মাঝে মনে হয় না যে নজরুল ইসলাম যদি আরও অধ্যয়নের সুযোগ পেতেন, বিদ্যালয়ে না হলেও ব্যক্তিগত উদ্যমে, তাহলে তাঁর রচনা হয়তো আরেকটুকু উৎকর্ষ লাভ করতো?

মাতৃভাষা শিক্ষা এবং সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ উপাধি-পূর্ব স্তরেই সমাপ্ত হয়ে যায় না; এই ক্রিয়া বস্তুত তার পরেও, এমনকি বিশ্ব-বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও, চলতে থাকে। তবে উপাধি-পূর্ব স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তিনি মাতৃভাষায় এবং সাহিত্যে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। এই পর্যায়েই তাঁর মানসিক প্রবণতা ও সংবেদন-শীলতা রূপলাভ করতে থাকে এবং তাঁর সাহিত্যজীবনের বুনিয়াদ গঠিত হয়। এই পর্যায়ে তিনি কিরূপ শিক্ষা লাভ করেন তার ওপর, তাই, সাহিত্যে তাঁর অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করে।

কিন্তু আমাদের দেশে এই পর্যায়ের শিক্ষা সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল বলে মনে হয় না। যে-সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মাতৃভাষা শিক্ষা এবং সাহিত্যের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণে আদৌ সাহায্য করছে না, এমনকি অনেকাংশে বিরোধিতা করছে, অথবা মাতৃভাষা শিক্ষাকে খুবই গৌণ বিবেচনা করছে আমি প্রথমে তাদের উল্লেখ করব।

এদেশে এক শ্রেণীর স্কুল আছে যাদের শিক্ষা-মাধ্যম ইংরেজী। আমি এক সময়ে দেখেছি, নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র বাংলা "ক" অক্ষর পর্যন্ত জানে না। ভাষা-আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি কয়েক বছর

থেকে এসব স্কুলে বাংলা শেখানো হয়, কিন্তু একান্ত গৌণ বিষয় হিসাবে। আমি জানি না এদেশে এ-রকম স্কুলের সংখ্যা কত —তবে আমার ধারণা বেশ কয়েক হাজার করে ছাত্র এসব স্কুলে প্রতি বছর ভর্তি হচ্ছে। কী মহৎ আশায় যে এদেশের পদস্থ ও বিত্তমান এবং অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিবর্গ এসব স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে স্মার্ট করে তুলতে চান তা নিয়ে আমি আলোচনা করব না——কারণ তা সুবিদিত এবং নানা উপলক্ষে, বিশেষত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এককালে যে-সব স্বর্গীয় অক্ষম পিতামহ নাসারার ভাষা শিক্ষা অবাঞ্ছনীয় জ্ঞান করতেন, ঐ শিক্ষা যেন তাঁদের ওপর অকরুণ প্রতিশোধ। এবং বর্তমানে যাঁরা ইসলামী নীতিমালা ও মূল্যবোধের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, অথবা স্বদেশের ঐতিহ্যের অনুরাগী —বিশেষ ধরনের শিক্ষা-নীতির ফলে ঐসব স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকসমূহ তাঁদের উদ্দেশ্যে উদ্যত লোষ্ট্রস্বরূপ। স্কুলগুলি বিদেশী ভাবধারার পকেট নয় শুধু; এসব স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক হাজার ছাত্রের মধ্যে—প্রতি বছর তাদের সংখ্যা বাড়ছে—যদি কোনো সাহিত্য-প্রতিভা থেকে থাকে তবে মাতৃভাষার সোনার কাঠির স্পর্শের অভাবে কখনো তা জাগবে না। এবং এরা যেহেতু কখনো বাংলা বই পড়বে না এবং কিনবে না (প্রায় ক্ষেত্রেই), অতএব এরা কালক্রমে অর্থ ও প্রতিপত্তির যাদুকর হয়ে পিতামাতার মুখোজ্জ্বল করলেও পরোক্ষভাবেও এদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য উপকৃত হবে না।

এদেশের মাদ্রাসাগুলিতে প্রধান পাঠ্য ইসলাম এবং মধ্যযুগের বিভিন্ন বিদ্যা। এসব প্রতিষ্ঠানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বাংলা শিক্ষা একান্ত গৌণ অথবা নগণ্য বিষয়। ফলে এ-যুগ এবং এদেশের সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু হাজার ছাত্রের আত্মার সংযোগ বিশেষ নিবিড় নয়।

এই দু'শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে একত্রে বলা যায়, এ দেশের এককালীন প্রায় লাখো খানেক ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সংযোগ হয় অনুপস্থিত না হয় নগণ্য। শুনেছি, এই দুই প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত এককালীন মোট ছাত্রসংখ্যা এর ইতেও বেশী। (হিন্দু সমাজের টোলকেও বোধ হয় এই সঙ্গে ধরা যায়, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ জানি না।) এটা তাই আদৌ অস্বাভাবিক নয়,

যে, এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রতিভার আবির্ভাব হয় না, কখনো হয়নি, সাহিত্য অথবা অন্যান্য বিষয়ে। প্রতিভার স্ফুরণ একমাত্র মাতৃভাষাতেই সম্ভব—কৃচিৎ নগণ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত। 'প্রতিভা' বলতে আমি এখানে বুঝাচ্ছি ইংরেজিতে যাকে বলে জিনিয়াস, ট্যালেণ্ট নয়। সব দেশের সব যুগের সাহিত্যেই এবং বিভিন্ন বিদ্যায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। বাঙালী মুসলমান যে প্রতিবেশী সমাজের তুলনায়, বস্তুত আরও বহু দেশের মুসলমানের তুলনায় সাহিত্যে পশ্চাদপদ, এবং সর্বপ্রকার মনীষাতেও তার প্রধান কারণ মুসলিম সমাজের একটা খুব বড় অংশ কয়েক শতাব্দী যাবৎ মাতৃভাষাকে অবহেলা করে এসেছে— এমনকি মাতৃভাষার প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে এসেছে। উল্লিখিত দু'শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সেই ঐতিহ্যই বহন করছে কিয়দংশে।

এদেশে জেনারেল এডুকেশন যাকে বলে তার উচ্চতর পর্যায়ে—কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে—মাতৃভাষা তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি এখনো। আমরা এই তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অনেককেই দেখেছি বৈদেশিক ভাষায় নৈপুণ্য অর্জন করে শ্লাঘা অনুভব করতে—বাঙ্গালীত্বের অগৌরব মোচনের জন্য। সে মনোভাব সম্প্রতি কমে আসছে ; আরও কমবে আশা করি। কিন্তু জেনারেল এডুকেশনের উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর অবধিও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না ; এসং এ স্তর অবধি শিক্ষা মাতৃভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রথম পাঠ গ্রহণের খুব অনুকূল নয়।

আমার বলার কথা কিন্তু এই নয় যে, একমাত্র বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে পাঠ গ্রহণই সাহিত্যিকের জন্য প্রয়োজন। এমন পাঠ্যবিষয় খুব কমই আছে যা তাঁর বিষয়বস্তু হতে পারে না, বা অন্তত পঞ্চভূতের মতো এবং পঞ্চভূতের বিভিন্ন উপাদানের মতো কখনো দৃশ্যত কখনো অদৃশ্যত তাঁর সাহিত্যের স্বাস্থ্য বর্ধনে সহায়তা করে না। স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি, বিভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা এবং আরও অনেক বিষয় থেকেই তাঁর সাহিত্যের উপাদান আহৃত হতে পারে, যদি আহরণ তিনি করতে পারেন। এইসব বিষয়ই জগৎ-সংসার সম্পর্কে তার জ্ঞানকে প্রসারিত এবং দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করতে

পারে; তাঁর ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে পারে; এবং করে থাকে। ঐ রকম হবু-সাহিত্যিক সম্বন্ধে ভরসা করার খুব কমই আছে যার সম্বন্ধে বলা হয় "ছেলেটির সাহিত্যে খুব নেশা, কাজেই ভাল লেখাপড়া করে না।" অর্থাৎ সাহিত্য ছাড়া আর কিছু পড়ে না। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রসঙ্গেও দু'একটি প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই, কেননা আমার প্রধান বক্তব্য, সাহিত্যের উৎকর্ষ বহুলাংশে শিক্ষার—যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। প্রশ্ন এই, উল্লিখিত বিষয়গুলির পুস্তক কি সুলিখিত, ভাষা শুদ্ধ, পাঠ্য-সূচী, রচনারীতি, পরিবেশন-ভঙ্গী বিশেষ বিশেষ বয়সের শিশুমনের এবং কিশোর-মনের উপযোগী? উৎকৃষ্ট শিক্ষা এইসবের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়ে এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ পৌরনীতির কথা ধরা যাক। রাজনীতি সম্বন্ধে কতখানি জ্ঞান থাকলে এবং কতদিন যাবৎ সংবাদপত্র পাঠ করলে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের সমগ্র বিবরণ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলির ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি, বিভিন্ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সরাসরি ইংরেজী শাসনতন্ত্র থেকে বাংলায় সংক্ষিপ্তমাত্র করে দিলে ছাত্র দূরে থাক, বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে বোঝা সম্ভব? মাধ্যমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী-নির্ধারণকর্তা অথবা লেখক কেউ এসব কথা ভেবে দেখেন না। ফলে এই উপাদেয় তথ্যগুলি পরম সন্তোষের সাথে পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশন করা হয় সাধারণত আমার এই প্রবন্ধের চাইতেও কঠিন ভাষায় এবং ভাবাত্মক রীতিতে। রাজনীতি-অনভিজ্ঞ কিশোরকে এসব বিষয় বুঝে মুখস্থ করতে বলা আর দড়িতে ঝোলোনো ফুট-বল বারংবার হেড করে তাকে ফুটবল খেলা শিখতে বলা, অথবা কাঠে যেমন করে পেরেক ঠোকা হয় তেমনি করে এই উপাদেয় তথ্যগুলি ঠুকে ঠুকে কিশোর-কিশোরীর মগজে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া প্রায় একই রকমের অধ্যবসায় বলে আমার মনে হয়।

শুধু এই বিষয়ের নয়, আরও অনেক বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক-লেখক মনে মনে যে ছাত্রটিকে কল্পনা করে বই লেখেন সে আকারে ছোট, কিন্তু তার মুখের আদলটি অনেক ঘা-খাওয়া বয়োবৃদ্ধ নাগরিকের।

কি কারণে বলা কঠিন, ইতিহাসের বইগুলিতে বাংলার ইতিহাস প্রায় উপেক্ষিত। একজন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত কি ইতিহাস পড়েছে আমি সম্প্রতি তার সন্ধান নিয়েছিলাম। একমাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে সে পড়েছে বাংলার কিছু ইতিহাস—বখতিয়ার খিলজির দিগ্বি-জয় থেকে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা অবধি—তারপর আর নয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে তার পাঠ্য ছিল আরব জাতির কথা, ইসলামের কথা এবং আব্বাসীয় আমল পর্যন্ত খেলাফতের ইতিকাহিনী; এবং আদিযুগ থেকে পাকি-স্তান-প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বর্তমান ভারত ও পশ্চিম-পাকিস্তানের ইতিহাস, কিন্তু বাংলার অথবা পূর্ব-পাকিস্তানের নয়। অবশ্য শুধু ম্যাট্রিকুলেশন-এর ইতিহাসে পলাশী উপলক্ষে আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে যতটা বিবরণ দেওয়া সম্ভব তা ছিল। এ যেন অমিতবিক্রম অসংখ্য রাজা-বাদশার কীর্তি-অভিনীত বহু শতাব্দী-ব্যাপী রাজকীয় নাটকে ক্ষণিকের জন্য এক অপদার্থ ন্যুব্জদেহ সামন্তের অকস্মাৎ প্রবেশ ও প্রস্থান।

ভারতের নয় শুধু, বাংলাদেশ এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের পূর্ণ ইতিহাস ব্যতীত এ-রাষ্ট্রের তরুণ নাগরিকদের ইতিহাস-পাঠ, এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে বলে মনে হয় না। কেননা আত্ম-বিস্মৃতের পক্ষে সৃষ্টিমূলক উদ্যম সম্ভব নয়, রাজনীতিতে, সাহিত্যে, অথবা সংস্কৃতিতে। সৃষ্টিমূলক উদ্যমের জন্য চাই, আরও অনেক কিছু সঙ্গে আত্ম-পরিচয় এবং আত্ম-উপলব্ধি, মাতৃভূমির ইতিহাস-পাঠ ব্যতীত যা অসম্ভব। এবং চাই গৌরববোধ—অসার আত্মাভিমান নয়, প্রকৃত গৌরববোধ—ধার করা বীরত্বে যা সম্ভব নয়।

ভাষা ও সাহিত্যের কথা বলতে গেলে, আমার ধারণা, স্বাধীনতা-পূর্ব আমলের তুলনায় বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষা—তার মধ্যে আবশ্যিকভাবে আমি ব্যাকরণও ধরছি—এবং সাহিত্যপাঠের মান অপেক্ষাকৃত নীচু: প্রধানত রচনা মনোনয়নে, অথবা পুস্তক নির্বাচনে, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অভাব বশত। এ ব্যাপারে আমাদের বিচার-ক্ষমতা শুধু নয়, বিবেকও হয়তো সর্বদা নির্মল নয়। এমন পুস্তক, কবিতা, রচনা, ভ্রমণ-কাহিনী এবং নাটক নির্বাচিত হতে আমরা দেখেছি—তাদের মধ্যে কতকগুলি সদ্য:প্রকাশিত—যা চিরায়ত সাহিত্য বলে গণ্য হয়নি, কখনো হবে কিনা তার স্থিরতা নেই; এদের কোনো কোনোটা মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে হতে, অথবা,

রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হওয়ার পরেই, অথবা মুদ্রিত হওয়া মাত্র পাঠ্যপুস্তকরূপে ছাত্রদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। স্কুলের বাইরে ছাত্ররা এবং ভাবী সাহিত্যিকেরা উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠের সুযোগ কতখানি পাবে আমাদের গ্রন্থ-ও-গ্রন্থাগার-বিমুখ সমাজে তার স্থিরতা নেই; উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠের সুযোগ তাদের অতএব বিদ্যালয়েই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তা যদি তারা না পায়, তবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য তাদের কাছে আশা করা যায় কি?

শিক্ষার উৎকর্ষ-অপকর্ষ আরও অনেক দিক থেকে বিবেচনা করা যায়ঃ করলে ঐ একই সিদ্ধান্তে আমরা পোঁছাবো যে এদেশে শিক্ষা-য়োজন সন্তোষজনক এমন আত্মপ্রসাদের বিশেষ হেতু নেই। প্রতি বছর পরীক্ষার যে ফল বেরোয় তাই তার প্রমাণ। শিক্ষায়োজন যদি পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তবে তা যে সাহিত্যের বিশেষ হিত-সাধনে সমর্থ হবে এরূপ মনে করা কঠিন। সময়ই একদিন সঠিক কথা বলবে, তবে আপাতত আমার মনে হয়, স্বাধীনতা-পূর্বকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকদের তুলনায় বর্তমান শিক্ষায়োজনের প্রচ্ছায়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ লেখকদের ভাষার ওপর দখল অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত; এবং আট-দশ বছর আগেও যেমন নতুন নতুন মেধাবী সাহিত্যিকের আবির্ভাব লক্ষ্য করে উল্লসিত হতাম সম্প্রতি আমরা অতটা হচ্ছি না, যদিও শিক্ষার সুযোগ পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারিত, এবং লেখকের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতা-পূর্বকালে এমনকি মাদ্রা-সায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদেরও কেউ কেউ অতি উত্তম গদ্য লিখতেন, যা একালের মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকদের কাছে আমরা পাচ্ছি না, এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকদের কাছেও না।

সাহিত্যের বীজ শিক্ষার উর্বর ক্ষেত্রে উপ্ত হলেও তার সমৃদ্ধ বিকাশ একমাত্র বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষার ওপর নির্ভর করে না, এজন্য আরও অনেক-কিছুর দরকার, বিশেষ করে সমাজের অনুকূল পরিস্থিতি —ব্যাপক অর্থে, কিন্তু উৎকৃষ্ট শিক্ষাও সাহিত্যের জন্য অপরিহার্য। এ ব্যাপারে আমরা বর্তমানে একটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি বলে মনে হয়। সাহিত্য-মানের অবনমনের যে-সব লক্ষণ আমরা সম্প্রতি লক্ষ্য করছি তা হয়তো তাই আমাদের আরও কিছুকাল উদ্বেগের হেতু হবে।

১৯৬৬

সাহিত্যের দিগন্ত

বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা কেমন হওয়া উচিত, কি হওয়া উচিত তার আদর্শ, সে সম্বন্ধে এদেশে কয়েক রকমের মতামত প্রচলিত। অনেক রকমের, এমনকি পরস্পর-বিরোধী মতামত সব দেশেই থাকে, থাকা উচিত, নইলে সাহিত্যে বৈচিত্র্য আসে না, লেখকেরা নিজেদের প্রতিভা, দৃষ্টিকোণ, আদর্শ অনুযায়ী পথ বেছে নিতে পারেন না, এক-ঘেয়েমির রুদ্ধদ্বার পরিবেশে সাহিত্য নিরক্ত নির্জীব হয়ে ওঠে। সাহিত্যের শরীরে নানা দিক থেকে হাওয়া এসে লাগা চাই, সেটাই তার পক্ষে স্বাস্থ্যকর, যেমন স্বাস্থ্যকর মানুষের পক্ষে। কিন্তু এদেশে কতকগুলি মতামতকে প্রায় ধর্ম-বিশ্বাসের মতো, অথবা অলংঘনীয় আদর্শের মতো চালাবার চেষ্টা দেখা গেছে। সাহিত্যের কোনো কোনো মহল কতকগুলি মতামত উপস্থিত করে বলেন, এগুলি সকলেই গ্রহণ না করলে তার ফলাফল শুভ হবে না। তাঁদের মতামতের পেছনে যে যথেষ্ট যুক্তি থাকে তা নয়, এমনকি কোনো কোনো মতামত উদ্ভট, কিন্তু ক্রমাগত যা প্রচার করা হতে থাকে তা অযৌক্তিক ও উদ্ভট হলেও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে; এমন একটা কুয়াশার সৃষ্টি করতে পারে (এবং কিছু পরিমাণে করেছেও) যাতে আমাদের সাহিত্যের অনভিজ্ঞ ছোট্ট তরণীর দিগভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

এর মধ্যে ভাষার প্রশ্নটাই সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ। মধ্যযুগে অথবা আধুনিককালে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান নগণ্য নয়, লোক-সাহিত্যে অজস্র ধারায় সৃষ্টি তার উৎসারিত, এবং আজ যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা ভাষা স্বীকৃত

সে কৃতিত্ব একান্তভাবে তারই, তবু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ বাংলা ভাষাকে নিয়ে বরাবরই বিব্রত বোধ করেছেন। বাঙালী হয়ে জন্মেছেন বলে বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা এই বিধির বিধানকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি, কিন্তু একে তাঁরা পুরোপুরি গ্রহণ করতেও পারেননি। তাই এক সময় পুঁথির পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু তৈরী করা হয়েছিল আরবী হরফে। এবং কোনো কোনো পুঁথির শব্দ-প্রয়োগরীতির পেছনে (হয়তো অজ্ঞাতসারে) কতকটা যেন এই মনোভাব সক্রিয় ছিল যে, এদেশের মুসলমানেরা এসেছে আরব-পারস্য-উত্তর-ভারত থেকে, কাজেই প্রচুর আরবী-ফারসী-উর্দু হিন্দী শব্দ ব্যবহার না করলে তারা সাহিত্য বুঝবে না। এবং এই শতাব্দীতে, এই বিংশ শতাব্দীতেও এক সময় রব উঠে গিয়েছিল যে বাংলা নয়, উর্দুই হওয়া উচিত বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন। অস্বাভাবিক বলেই সে রব অবশ্য জনরবের পর্যায়েই থেকে যায়। তারপর একদিন এলো স্বাধীনতা। ততদিনে বাঙালী মুসলমান এগিয়েছিল অনেকখানি। স্বাধীনতা লাভের পরে নবযুগের বাঙালী মুসলমানের কণ্ঠে উচচারিত হল : "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" তারপর কি ঘটেছিল তা, এখন ইতিহাস। এ আন্দোলনের প্রতিপক্ষীয়দের দাবী ছিল উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পশ্চিম-পাকিস্তানীদেরই এটা দাবী ছিল কিন্তু আমার বক্তব্য তা নয়। আমার বক্তব্য—পূর্ব-পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক বাংলাভাষী মানুষও ওই দাবী তুলেছিলেন। কারো কারো দাবী ছিল আরো উচচ গ্রামের। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হোক আর না হোক—তাঁরা বলেছিলেন—আরবী হরফে বাংলা লেখা চাই। বাংলা রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃত হওয়ার পরে সে দাবী আর শোনা যায় না, কিন্তু এখন কেউ কেউ যা বলছেন তার নির্গলিতার্থ : "আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ এ ভাষায় আরও প্রচুর পরিমাণে আমদানি করতেই হবে। তাই যদি না করা গেল তবে পাকিস্তান হয়েছে কেন?"

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার দরুনই অঢেল আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ আমদানির যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এরূপ মনে করার কোনো সঙ্গত

১. পঞ্চাশের দশকে এদেশে বাংলা ভাষার জন্য আরবী হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল, এবং সম্প্রতি, এই ষাটের দশকে, রোমান হরফ প্রবর্তনের ওকালতিতে এ প্রদেশেরই ইংরেজী দৈনিকে প্রচুর উদ্যম খরচ করা হয়েছে। (পাদটীকা ১৯৬৮)

শব্দের মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দও থাকবে, তাদের নিজস্ব কোনো বিশেষ অধিকারে নয়, জোর-জবরদস্তি করে নয়, আমাদের প্রয়োজনে। শুধু গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে কত বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঙ্গণে স্থান করে নিল। নানা উপলক্ষে, নানা প্রয়োজনে, অগ্রসরমান চিন্তাধারা ও বিকাশমান বাক্‌ভঙ্গীর প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ চিরদিন চালু হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। সেইসব আরবী-ফারসী শব্দও বাংলা সাহিত্যে স্থান পাবে যে-সব শব্দ মুসলমানেরা বোঝে, ব্যবহার করে, এবং দেশ-বিদেশের মুসলিম-জীবন, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির রূপায়ণের জন্য যেসব শব্দ ব্যবহার করা অপরিহার্য। কিন্তু যে-সব শব্দ অপরিহার্য নয় এবং আমরাও বুঝি না সে-সব শব্দের বিশাল বোঝা যদি আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে।

অনেকের ধারণা, মুসলিম-জীবন, মনন ও সংস্কৃতির রূপায়ণের জন্য আরবী-ফারসী শব্দ অপরিহার্য। এরূপ ক্ষেত্রে আরবী-ফারসী শব্দ উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হলে ভাল হয় একথা ঠিক, কিন্তু আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার না করলেই যে সর্বত্র অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা নয়। এবং আরবী-ফারসী শব্দ মানেই যে ইসলাম বা ইসলামী তমদ্দুন এবং সংস্কৃত শব্দ মানেই যে হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সংস্কৃতি তাও নয়। তাই যদি হয় তাহলে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগে লিখিত অগ্নিদেবতা-প্রশস্তিকে ইসলামী সংস্কৃতি এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত কলেমা তৈয়বকে হিন্দু-মন্ত্র বলে স্বীকার করতে হয়। বস্তুতঃ অনাবশ্যক আরবী-ফারসী শব্দের জন্য যে মোহ অনেকের মধ্যে দেখা যায় তা অসঙ্গতই বলতে হবে। কোনো পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্যিক—তিনি মুসলমান হোন আর হিন্দু হোন—যদি আরবী-ফারসী শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেই ভালোভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তবে তাতে আপত্তি করার কি আছে? আমাদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন তবু একথা সত্য যে কিছু সংখ্যক লেখক যে আর কিছু সংখ্যক লেখকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত

ভালো লেখেন তার একটা কারণ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দরীতির উপর তাঁদের অপ্রতিহত অধিকার। দোভাষী পুঁথিসাহিত্যের বিরাট অংশ যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হতে পারেনি তার একটা প্রধান কারণ এই সাহিত্যের লেখকেরা তৎসম শব্দরীতি এবং বাংলা ভাষার-শব্দ-প্রয়োগ-ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন।

আমাদের সাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এর আদর্শ সম্বন্ধে। ইসলাম হবে এ সাহিত্যের আদর্শ একথা কেউ কেউ বলেন। অবশ্যই হবে, কিন্তু সব সময়ে এবং সবাইকে এই আদর্শ মানতে হবে এমন কথা বলা যায় না। এদেশে সংখ্যালঘু-সমাজের কোনো লেখক যদি শুধু তৎসম-শব্দ-প্রয়োগ হিন্দু-সংস্কৃতিমূলক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করেন তবে সে সাহিত্যকে আমরা ভারতীয় সাহিত্য বলব না, পাকিস্তানী সাহিত্য বলেই স্বীকার করব। কিন্তু সাহিত্য বাধ্যতামূলকভাবে এই ধর্মভিত্তিক বা ওই ধর্মভিত্তিক হবে একথাই বা মনে করা কেন? সাহিত্য নিছক সাহিত্য হতে পারে, হওয়া সম্ভব এবং আধুনিক যুগে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে। তার আদর্শ হতে পারে সুধু সুন্দরের ধারণা, শুধু মানবপ্রেম, কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী যে কোনো মতবাদ। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার বা চিন্তাধারার সঙ্গে এসব আদর্শের মিল থাকতে পারে, নাও পারে। যিনি যে ধর্মেরই অনুসারী হোন, প্রত্যেক সাহিত্যি-কেরই আরেকটি ধর্ম থাকে, সেটি সাহিত্য-ধর্ম। যে-মুহূর্তে হাতে কলম থাকে সে-মুহূর্তে এ ধর্মই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়, এ ধর্মেরই তিনি নিষ্ঠা-বান কর্মী। আমরা বলতে পারি সাহিত্য যেন আরো ধর্মভাবে আঘাত না হানে, যেন রাষ্ট্রবিরোধী না হয়, নৈতিকতা বিরোধী না হয়, এবং মানবতাবিরোধী আদর্শ প্রচার না করে, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো মতবাদই আমরা সাহিত্যিকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। ফরমায়েশ দিয়ে রেজিমেণ্টেশন করে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তার প্রমাণ।

আমি সাহিত্যিকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি কিরূপ শব্দপ্রয়োগ সবচেয়ে ভালোভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন, কথ্য, আঞ্চলিক ও বিদেশী শব্দরীতি তিনি কি পরিমাণে ব্যবহার করবেন, কি হবে তাঁর আদর্শ, তাঁর বিষয়বস্তু, তা নির্বাচনের প্রাথমিক অধিকার তাঁরই, এবং

আমরা যতই সমালোচনা করি না কেন, তিনিই তাঁর লেখনীর চূড়ান্ত অধীশ্বর। এসব বিতর্কের তিনিই মীমাংসা করতে পারেন তাঁর প্রতিভার সৃষ্টি দিয়ে। এই সৃষ্টিরই প্রয়োজন বেশী, বিতর্কের নয়। বিতর্কের কিছু মূল্য থাকতে পারে, তবে বিরোধমূলক বিতর্কের দ্বারা সৃষ্টি সম্ভব নয়, অনা-সৃষ্টিই তার সম্ভাব্য পরিণতি।

ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরো দু' একটি ছোটখাট দাবী সময় সময় শুনতে পাই। বলা হয় পুঁথি-সাহিত্যের ভাষায় আমাদের সাহিত্য রচনা করা উচিত, এবং এ প্রদেশেব আঞ্চলিক ভাষাই হওয়া উচিত আমাদের সাহিত্যের ভাষা, কোলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষা নয়। এসব প্রচারকার্যের ফলে সত্যিই পুঁথি-সাহিত্যের ভাষায় এবং আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা কিছু হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে এমন কোনো লেখা এখনো টেকেনি। হতে পারে প্রশ্নটা মূলতঃ মাধ্যমের নয়, প্রতিভার। তবু একটি কথা বিবেচনা করার আছে। স্বাদেশিকতা এবং স্বাজাত্য খুব প্রশংসনীয় মনোভাব, কিন্তু জাতীয় বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কোথাও একটা সীমারেখা টানতে হবেই। কোনো জিনিস ভিনদেশে তৈরী শুদ্ধ এই কারণে সে-জিনিস কেউ বর্জন করে না। সে-জিনিস আমার কাজে লাগছে কিনা, আমি কাজে লাগাতে পারছি কিনা এইটে একটা বড় প্রশ্ন। তা ছাড়া এক যুগের পর অন্য যুগে প্রতিভাবানের দ্বারা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ভাষাও প্রকাশভঙ্গীর রূপান্তরের সম্ভাবনা তো সব সময়েই আছে। কিন্তু এজন্য সময় ও ধৈর্যের দরকার। এবং এ ধৈর্য হওয়া উচিত শিল্পীসুলভ, রাজনীতিকসুলভ নয়।

সাহিত্যের নানা বিষয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ততা এবং পিউরিটান-মনোভাব যেন কেউ কেউ বেশ উদ্দীপনার সঙ্গেই প্রকাশ করে। পৃথিবীতে যতগুলি রেনেসাঁ সংঘটিত হয়েছে তার কোনোটাই কিন্তু পিউরিটান-মনোভাবেরর দ্বারা সম্ভব হয়নি, পিউরিটানিজমের খোলস ছিঁড়েই তা সম্ভব হয়েছে। পিউ-রিটানিজম রেনেসাঁর শত্রু, এই হচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম জগতে যে রেনেসাঁ এসেছিল তার একটা বড় উৎস ছিল প্যাগান যুগীয় গ্রীক কালচার, এবং তার কয়েক শতাব্দী পরের খৃষ্টীয় ইউরোপীয় রেনেসাঁরও বড় উৎস ছিল গ্রীক ও মুসলিম কালচার। (কালচার শব্দটা এখানে প্রধানত জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন অর্থেই ব্যবহার করা হল)। এই দু'টি রেনেসাঁর লক্ষণ গুলির মধ্যে ছিল বুদ্ধির মুক্তি, চিত্তের প্রসার, জ্ঞানের

পিপাসা। এর মধ্যে তারতম্য অবশ্যই ছিল, কিন্তু লক্ষণগুলি বর্তমান। মুসলিম রেনেসাঁ কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয়নি, এবং স্থায়ী হয়নি গোঁড়া পিউরিটান-মনোবৃত্তির প্রত্যাবর্তনের জন্যই। কিন্তু ইউরোপীয় রেনেসাঁর অবসান হয়েছে একথা আজও বলা চলে না। বিদেশী শিল্প-সাহিত্য-চিন্তাধারাকে জানবার পিপাসা ওই ভূভাগে আজও প্রবল, তাই আমাদেরই সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাঠ নিতে হলে যেতে হয় ইউরোপে,—আরবে বা ইরানে নয়। শুচিবায়ুগ্রস্ততাকে ইউরোপ বর্জন করতে পেরেছিল, পিউরিটানিজমের জীর্ণ খোলস ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছিল বলেই আমাদের রক্ষা। আমাদের সংস্কৃতিকে বহুলাংশে বাঁচিয়ে রেখেছে ওরাই। বিনা দ্বিধায় অন্যের সংস্কৃতির চর্চা করতে পেরেছিল এবং দুনিয়ার যা-কিছু ভালো তাকে আত্মসাৎ করতে পেরেছিল বলেই বাঁচবার সংগ্রামে ওরা জয়ী হয়েছে। ইতিহাসের এই কয়েকটি শিক্ষার প্রতি চোখ বুঁজে থাকলে আমাদের মঙ্গল হবে না।

ইতিহাসের এই শিক্ষার প্রতি এদেশের মানুষ—প্রচুর মানুষ আজ বিমুখ। বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্য-পরিস্থিতি, চিন্তাধারা এবং জীবনদৃষ্টি উদারতার নয়, সঙ্কীর্ণতার; রেনেসাঁর নয়, ক্ষয়িষ্ণুতার। একটা সন্দেহপ্রবণ পরাজিত মনোভাব, বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র জীবনপ্রবাহ থেকে গা বাঁচিয়ে নিরাপদ নির্জনবাসের তাগিদ, এই দেখতে পাই অনেকের মধ্যে। অতীতমুখী রোমাণ্টিকতা, অবাস্তব আত্মপ্রসাদ, কল্পনাসর্বস্ব আত্ম-রঞ্জন, এবং অস্পষ্ট চিন্তার কুয়াশায় আমাদের সাহিত্যের দিগন্ত অপরিচ্ছন্ন।

অতীতের চিন্তাধারার প্রতি বিপুল আমাদের নিষ্ঠা। এ নিষ্ঠা শ্রদ্ধেয় কেননা তার কাছে আমরা অনেক ভালো জিনিস পেতে পারি, এবং দ্বিধাহীন-ভাবে স্বীকার করা উচিত যে, ভালো ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে ভালো ঐতিহ্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়, কিন্তু শুধু অতীতকে দিয়ে কারো চলে না। দুনিয়ার প্রগতির মিছিলে আমাদেরও শরিক হতে হবে, এগোতে হবে সামনের দিকে, কিন্তু মুখটাকে কেবলই যদি পেছনের দিকে ঘুরিয়ে সামনের দিকে চলি তবে তাতে দুর্ঘটনায় পড়বার আশঙ্কা। মানবজাতির জীবন যখন এখনো শেষ হয়ে যায়নি, চিন্তার যখন ইতি হয়নি, এবং অতীতের ঐতিহ্যকে নূতন ঐতিহ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করার অধিকার এখনকার মানুষেরও আছে, তখন অতীতকে সময় সময় লংঘনও একান্ত স্বাভাবিক। এজন্যই স্বাভাবিক চিন্তার দু:সাহস, কল্পনার ঔদ্ধত্য, এবং বিদ্রোহ—শেলীর মতো, নজরুলের মতো। এতে ভুল হয়ে যেতে পারে, মারাত্মক রকমেরই ভুল হয়ে যেতে পারে,

কিন্তু ভুল করবার ঝুঁকি না নিলে, ভুলকে ভয় করলে পৃথিবীকে মৌলিক কিছু দেওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

রেজিমেণ্টশন বলতে যা বোঝায় এবং কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে যে ধরনের রেজিমেণ্টেশন আছে তা এখনো এদেশে নেই। কিন্তু তার চেষ্টা আছে; বিশেষ করে কিছু সংখ্যক চিন্তানায়ক' এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিকের পক্ষ থেকে। সুসংবদ্ধভাবে নেই, তবু আছে এবং প্রবলভাবেই আছে, আছে এদেশের আবহাওয়ার মধ্যেও। আমরা অনুভব করি যে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের নেই সে মতামত যতই ভালো হোক, যতই যুক্তিসঙ্গত হোক, আমাদের দেশ, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের সাহিত্যের পক্ষে তা যতই কল্যাণজনক হোক। এর উপর আছে দেশের চিন্তাধারা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশেষ ছাঁচে ঢেলে তৈরী করার প্রয়াস। কিন্তু সাহিত্য-জগতের একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা এই যে, রেজিমেণ্টেশন সাহিত্যের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। বৈচিত্র্য সাহিত্যের প্রাণময়তার লক্ষণ, চিন্তার বৈচিত্র্য অনুভবের বৈচিত্র্য, প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য—তা বলে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। এ বৈচিত্র্যকে ভয় করার কিছু নেই। টি. এস. এলিয়ট ক্যাথলিক, এবং বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল নাস্তিক, কিন্তু উভয়ের জন্যই ইংরেজ গর্বিত। সুন্নী শেখ সাদী, শিয়াপন্থী ও সংশয়বাদী নাসিরুদ্দিন তুসী, মুক্তবুদ্ধি ওমর খৈয়াম, এঁদের নিয়েই ফারসী সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্য। এমনকি আবুল আলা মা'রী যিনি মুসলমান হয়েও কেয়ামতে বিশ্বাস করতেন না, মুর্দার দাফনের চেয়ে শব-দাহই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন, তিনিও আরবী সাহিত্যে গৌরবময় স্থানই পেয়েছেন, অপাংক্তেয় হননি। এঁদের মতো সাহিত্যিক, এবং ইবনে সিনা ও মোতা-জিলাবাদীদের মতো দার্শনিক যে মুসলিম-জগতে আর জন্মালো না তার কারণ এই নয় যে মুসলিমসমাজের প্রতিভা নেই, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতিও এর প্রধান কারণ নয়, কেননা পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ছিল উনিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি; এর প্রধান কারণ আল-আশারীর সময় থেকে চিন্তার প্রতিক্রিয়া এবং গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণ চেতনায় নিমজ্জন, এবং পিউরিটানিজম। যেখানেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং সাহিত্যে ও চিন্তায় স্বাধীনতা অনুভূত হয়েছে সেখানেই স্মরণীয় ফসল ফলেছে।

সাহিত্যিকের স্বাধীনতা

একালের পৃথিবীতে সাহিত্যিকের স্বাধীনতা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন বহু দেশ আছে যেখানে কোনো না কোনো একটা দলীয়,-রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শের পতাকা তাঁকে বহন করতেই হবে, নইলে তিনি অপাংক্তেয়। কিন্তু এতেও তাঁর নিস্তার নেই। দুনিয়ায় যেহেতু দল, রাষ্ট্রনীতি বা ধর্ম একটা নয় এবং যেহেতু বিভিন্ন দল, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মের সংঘাত অনেক সময়েই ঘটে থাকে, অতএব আদর্শভেদে সাহিত্যিককেও ভিন্নতর আদর্শবাদী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়, এবং যদি-বা আক্রমণ থেকে তিনি বেঁচে যান, বিরুদ্ধবাদীদের শীতল ঔদাসীন্য তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। বিশেষ একটা চিহ্নে চিহ্নিত না হলে যেমন চলে না, তেমনি বিশেষ একটা চিহ্নে চিহ্নিত হয়েও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

সাহিত্যে এই শ্রেণী-বিভাগের ফলে সমঝদারদের রস-গ্রহণ-বৃত্তিও বিচিত্রভাবে গড়ে ওঠে। এমন ঘটনা তাই আদৌ দুর্লভ নয় যে একটি দলের আদৃত বা অপাংক্তেয় হন কেবল সেই দলের অনুসারী হওয়ার জন্য। নিজ দলীয় সাহিত্য নিকৃষ্ট হলেও অন্য দলীয় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের চেয়ে মূল্য পায় বেশী। সাহিত্যের মাপ-কাঠিতে হয়তো এ-দলের সাহিত্যও মূল্যবান, ও-দলের সাহিত্যও মূল্যবান, আদর্শ দিয়ে মাপতে গিয়ে কিন্তু সেই সাহিত্যই অসাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যিক মূল্যবোধ পথভ্রান্ত হয় আদর্শের ঠেলাঠেলিতে। এর প্রতিক্রিয়া শোচনীয় হয়েই দেখা দেয় সাহিত্যে। এক দলকে খুশী করার এবং অন্য দলকে না-খোশ না করার দো-টানায় পড়ে অনেক সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন।

সাহিত্যিকের পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্য কোনো কালেই ছিল না। যে-কালে রাজা-বাদশাদের অনুগ্রহই ছিল সাহিত্যিকদের একমাত্র বৈষয়িক অবলম্বন, সেকালে সব রাজা-বাদশাই ছিলেন সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি, দীন-তারণ

দেবতুল্য, মহাত্মন। সেকালের সাহিত্যিকেরা আত্মিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকে মুক্ত ছিলেন না, তবু অনুমান করতে পারি, আজকের মতো আদর্শবাদী সংঘর্ষ এমন তীব্র নির্মম নিরাপোষ হয়ে তাঁদের কালে দেখা দেয়নি।

সেকালের মানুষের জীবনে ও মনে আজকের মতো জটিলতা ছিল না, কিন্তু বিস্ময়বোধ ছিল গভীরতর। শক্তির প্রকাশে তারা মুগ্ধ হতো, অভিভূত হতো--হতো এখনকার চেয়ে বেশী। সেকালে গুণী গুণীই ছিলেন, প্রবলভাবে এবং নিরাপোষভাবে দলীয় লোক ছিলেন না। এবং সেকালে ছিল তাঁকে গ্রহণের আকাঙক্ষা, সন্দিগ্ধ মনের অতি-সচেতনতা নয়। কাব্যের আদিতে বা অন্তে, অথবা মাঝখানেও কখনো কখনো, দু'টি-চারটি স্তুতিবাক্য শুনতে পেলেই রাজা-বাদশারা খুশী হতেন, বাকী-টুকু তাঁরা শুনে যেতেন খোশমেজাজে, গুলজার হয়ে উঠত তাঁদের দরবার। কিন্তু একালে যাঁরা রাজা-বাদশা সেই আদর্শ বা দলের বিধায়কগণ নিছক স্তুতিবাক্যে খুশী হন না, নির্জলা স্তুতিও তাদের কাম্য নয়, যুগেরও দস্তুর নয় সেটা। তাঁরা চান আপাদ-মস্তক আনুগত্য ও কর্তব্যপালন, এ বিষয়ে তাঁরা সজাগ। রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রখর দৃষ্টি, আনুগত্যের তৌলে প্রত্যেকটি শব্দ মেপে হিসাব না মেলানো পর্যন্ত তাঁদের অস্বস্তি।

এ যুগের সাহিত্যিক তাই দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁর পথ বিঘ্ন-কণ্টকিত। সেই নির্দ্বন্দ্ব প্রেরণা ও তন্ময়তা তাঁর নেই যা তাঁকে একাগ্র করতে পারে সৃষ্টির পথে, অতি-সচেতনতা থেকে রক্ষা করতে পারে বর্মের মতো। সাহিত্যের এই সংকটকে আরো ঘোরালো করে তোলেন কোনো কোনো দেশের ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ, তাঁদের আপাত-সর্বজ্ঞতা এবং ক্ষমতার জৌলুস দিয়ে। রাজনীতি দর্শন ও অর্থনীতির তাঁরা প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা, অবশ্য তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, নিজস্ব পরিমণ্ডলে। সাহিত্যের মৌলিক নীতির দিক থেকে দেখতে গেলে হয়তো এতে বলার বেশী-কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা যখন পার্টি ও রাষ্ট্র পরিচালনা ছাড়াও সাহিত্যের পরিচালন-ভারও গ্রহণ করেন, সাহিত্যের দার্শনিক ও নির্দেশক হয়ে ওঠেন তখন অনেক রকমের সমস্যা কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তখন অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে তা সাহিত্যের উপরেও প্রযুক্ত হয়ে একে এমন কোনো দিকে প্রভাবিত করতে পারে যা এর জন্য অপরিহার্য এবং স্বাভাবিক নয়। তাঁদের প্রভাবের সামনে সাহিত্যের প্রামাণ্য সমালোচক ও দার্শনি-ককে হয় নীরব থাকতে হয়, নয়তো করতে হয় অরণ্যে রোদন।

সাহিত্যের পথ-নির্দেশ বা সমালোচনা কেবল তাঁদেরই অধিকারভুক্ত যাঁরা প্রকৃতই সাহিত্যিক বা সমালোচক। প্রামাণ্য সমালোচনা ও দর্শন কেবল তাঁদের কাছ থেকেই আসতে পারে এক্ষেত্রে যাঁরা অধিকারী। কিন্তু এটা স্বীকার করা সম্ভব নয় যে যেহেতু একজন কেউ রাজনীতি, অর্থনীতি বা দর্শনে কৃতী ব্যক্তি অতএব তিনি আবশ্যিকভাবে সাহিত্য-রথীও বটেন।

মানব-সমাজে সাহিত্যিকের ভূমিকা প্রমোদমূলক এবং প্রেরণাদায়ক উভয়ই। এদিক দিয়ে তাঁর রচনার নৈতিক, সামাজিক এবং আদর্শগত মূল্য অবশ্যই থাকা সম্ভব, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার, রাজনীতিক বা নীতিবাদীর ভূমিকা তাঁর নয়। তাঁর ভূমিকা এদের চেয়ে অনেক বেশী অনির্দেশ্য, অনেক বেশী রহস্যময়। কাঠামো উৎপাদন নয়, সৃষ্টিতে প্রাণ-সঞ্চারই তাঁর লক্ষ্য। সেই তাঁর সাধনা। সেই লক্ষ্য সেই সাধনা অনেক দেশে একালে বিড়ম্বিত নানা আদর্শের সংঘাতে। এসব আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক যেমন আবশ্যিকভাবে বিরোধমূলক নয়, তেমনি অনিবার্য এবং অপরিহার্যও নয়। তবু নানারূপ আদর্শের চিহ্নে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান আসছে। অন্যথায় তাঁদের সার্থকতাই সংশয়িত।

১৯৫৫

বেগম রোকেয়া

সাহিত্যপাঠের আনন্দের জন্য বেগম রোকেয়ার রচনাবলী এখন আর পঠিত হয় না; তাঁর রচনাবলী যে অধুনা সাধারণ্যে প্রায় অপ্রচলিত এটা তারই প্রমাণ। কিন্তু তাঁর রচনাবলী পাঠে আরেকটি আনন্দ পাওয়া যায়—একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ। প্রত্যেক লেখকই নিজের রচনায় নিজেকে প্রকাশ করেন, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে, কিন্তু বেগম রোকেয়া করেছেন বিশেষভাবে। তাঁর রচনাবলীতে নৈর্ব্যক্তিকতা স্বল্প। এর প্রধান কারণ হয়তো এই যে, সাহিত্যকর্মে নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর আত্মগত হতে পারেনি; সাহিত্যের রূপকর্ম সাধনার সুযোগ পারিবারিক ও সামাজিক কারণে, এবং বিশেষ করে মুসলিম সমাজের তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে তাঁর ছিল স্বল্প। তবে আরেকটি বড়ো কারণ হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্যধর্মিতা, এবং এই উদ্দেশ্যধর্মিতা তিনি অবলম্বন করেছিলেন নারীসমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র তিনি শুধু মুসলিম নারীর মানব-অস্তিত্বের রূপ বিশ্লেষণই করেননি, শুধু তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করে-ননি, নিজের ব্যক্তিত্বকেও প্রতিফলিত করেছেন।

মানব-সমাজে বোধ হয় সেইসব লেখকেরই সংখ্যাধিক্য যাঁরা মূলতঃ লেখক, নিজেদের চিন্তা ও অনুভবের অভিব্যক্তি যাঁদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। বেগম রোকেয়া তেমন লেখিকা ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতিনী এবং নারীমুক্তি-আন্দোলনের নেত্রী, সেই সঙ্গে লেখিকা: তাঁর ত্রিমুখী ব্যক্তিত্বের একটি দিক লেখিকা-ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনাবলী এই ত্রিমুখী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ: বরং একথা বলাই সঙ্গত যে, শিক্ষাব্রতিনী এবং নারীমুক্তি-আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে তিনি সাহিত্যকে তাঁর মতামত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে একথা 'বলা সঙ্গত হবে না যে স্বভাব-লেখিকার গুণাবলী ও প্রেরণা তাঁর মধ্যে ছিল না। ছিল, তাঁর রচনাবলীতে তার অনেক লক্ষণ বিদ্যমান। শিক্ষাব্রতিনী অথবা নারীমুক্তি-আন্দোলনের নেত্রী সব

সমাজেই আবির্ভূতা হন; কিন্তু স্বভাব-লেখিকার অন্তত: কিছু প্রেরণা না থাকলে তাঁরা লেখনী ধারণ করেন না। কিন্তু বেগম রোকেয়া শুধু লেখনী ধারণ করেননি, তাঁর কালে তিনি গণনীয়া লেখিকারূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। অধুনা তাঁর রচনাবলী সাধারণ্যে প্রচলিত নয়; তবে সমাজ-সমস্যামূলক রচনার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা সাধারণত: ঘটে থাকে, সমাজের সমস্যাগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলে। কিন্তু তারপরেও আরেকটি জিনিস থাকে, তা হচ্ছে ইতিহাস। বাঙালী মুসলিম সমাজের প্রগতি ও চিন্তাধারার ইতিহাস লিখতে বসলে তাঁর রচনাবলীর আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য।

কিন্তু শুধু ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেই নয়, বেগম রোকেয়ার রচনাবলী আকর্ষণীয় তাঁর ত্রিমুখী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হিসেবেও: তাঁর রচনাবলী পাঠে আনন্দ পাওয়া যায়—এক অনন্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ। সে-ব্যক্তিত্ব অবশ্য শুধু তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে প্রসারিত নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যাপকতার পরিচয় পেতে হলে তাঁর চিঠিপত্র, অধুনা-বিলুপ্ত পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত বিবিধ প্রবন্ধ, এবং খুব সুলিখিত না হলেও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের 'রোকেয়া-জীবনী'ও অবশ্যপাঠ্য। এইসব গ্রন্থ এবং রচনা পাঠ করে মনে হয় একটা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেলাম, তাঁর সংস্পর্শে উন্নত হলাম। সে-ব্যক্তিত্ব শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্যের এক অন্ধকার দিগন্তে উদার আলোকবিন্দু বহন করে ফিরেছিল। সে আলোক তিনি শুধু জ্বালেননি, তাঁকেও উদ্ভাসিত করেছিল। জ্যোতির্ময়ীর মতো তিনি সে দিগন্তে দীপ্তা ছিলেন।

সদা-সচেতন সংবেদনশীল ক্লান-অতৃপ্ত ছিল তাঁর মানস-প্রকৃতি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে একটা খুব উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব একান্তভাবে বাঙালী নারী-ব্যক্তিত্ব। তিনি এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী মুসলিম নারী-সমাজের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি: এ সমাজের সচেতন প্রয়াসে নয়, অবচেতন বাসনায়, এবং তাঁর নিজস্ব সাধনায়, সেই সঙ্গে সমকালীন সমাজ-মানসেরও প্রতিক্রিয়ায়। বৃহত্তর সমাজের প্রস্তর-কঠিন নানাবিধ প্রথার সঙ্গে নারী-সুলভ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশ-বাসনার সংঘর্ষ-উৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তিনি দীপ্তিময়ী। এ স্ফুলিঙ্গে জ্বালা অবশ্যই কিছু আছে, কিন্তু তার চাইতে বেশী আছে দীপাবলীর কমনীয় কান্তি এবং সর্বব্যাপ্ত প্রীতি।

বেগম রোকেয়ার জীবনকথা এই স্ফুলিঙ্গ-উৎক্ষেপেরই কাহিনী। একটা ক্ষয়িষ্ণু সামন্তধর্মী পরিবারে তাঁর জন্ম, কিন্তু সেই পরিবারেই একদিন

অন্তর্বিরোধ ঘনীভূত হয়েছিল, তাঁর অগ্রজা ও অগ্রজদের ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় দীক্ষালাভে। তাঁরা এক নতুন জ্ঞানজগতের আস্বাদ পেয়েছিলেন, বলতে গেলে এক নতুন জগতের; সে আস্বাদের অংশ তাঁরা দিয়েছিলেন রোকেয়াকে। দিয়েছিলেন অনেক বিনিদ্র নিশীথে, 'জ্ঞানবৃদ্ধ' অভিভাবক-মণ্ডলীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে। তাঁদের সে এক মাদকতাময় অভিজ্ঞতা, যার কাহিনী রোকেয়ার জীবন-কথার সঙ্গে কিংবদন্তীর মতো সমাজে সম্প্রচারিত। কালক্রমে তাঁদের মধ্যে খ্যাতনাম্নী হয়েছেন কেবল রোকেয়া, অন্যেরা উল্লেখিত হন তাঁর জীবন-নাটকের পার্শ্বচরিত্র হিসাবে।

মুসলিম লেখিকাদের প্রসঙ্গে একটি কুসংস্কারের উল্লেখ কোথাও দেখি না, কিন্তু বর্ষীয়সী মহিলাদের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে এখনো শোনা যায় যে, এক-কালে আমাদের অভিজাত সমাজের একাংশ কুলবধূদের রচনা প্রকাশকে বেপর্দা ব্যাপার বলে মনে করত। অনেক লেখিকাই তাঁদের কাব্য-সাহিত্য-প্রয়াসের সূচনায় এরূপ বাধাপ্রাপ্তির অভিযোগ করেন। একমাত্র বাংলা ভাষার প্রতি উন্নাসিক তাচ্ছিল্য ছাড়া, ঠিক উল্লিখিত ধরনের বাধা বেগম রোকেয়া সম্ভবত: পাননি। এদিক দিয়ে তাঁর স্বামী উদার ছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু লেখিকা রোকেয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তার জীবনের সবচাইতে সংকটময় কাল ছিল তাঁর অবিবাহিত জীবন। তাঁর অভিভাবকরা ছিলেন বাংলা ভাষার বিরোধী, এবং ফারসী-উর্দুমন্য; তাঁরা যে সানন্দে রোকেয়াকে সমর্পণ করবেন উর্দুভাষীর হাতে, যদিও সে-পাত্র ছিল দোজবর এবং বয়স্ক, তা একান্তই স্বাভাবিক। এই পর্যায়ে বেগম রোকেয়া বাংলা ভাষা ভুলে যেতে পারতেন; কিন্তু তিনি ভোলেননি। বাংলা ভাষার চর্চা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন এবং এমনকি স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেনকে বাংলা শেখাবার ব্রত নিয়েছিলেন। তখন, এবং তারও পরে বাংলা ভাষার চর্চা অব্যাহত রাখাব জন্য তাঁকে যে কী নিদারুণ সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তার করুণ কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন 'মতিচুর'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ-পত্রে। জ্যেষ্ঠা করিমুন্নেসার নামে দ্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন:

অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাংলা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে আমি বাংলা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া, বাংলা ভাষায় কথাবার্তা কহিবার

একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদ। অত:পর কলিকাতায় আসিয়া ১১ বৎসর যাবৎ এই স্কুল পরিচালনা করিতেছি, এখানেও সকলেই---পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দুভাষিণী। প্রাত:কাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উর্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়।... ...এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই তাহা বোধহয় কেবল তোমারই আশীর্বাদের কল্যাণে।

সুদীর্ঘ, সকরুণ, আপোষহীন সংগ্রামের কাহিনী। এ ছিল বাংলা ভাষাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখার সংগ্রাম, উর্দুর প্রবল অবিশ্রাম প্রতিকূল স্রোতে বাংলা ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার সংগ্রাম। বাংলা ভাষা ছিল তাঁর সহজাত প্রকৃতিতে, তাঁর রক্তের ছন্দে ও ঝংকারে, কিন্তু পরিবেশও ছিল অতিশয় প্রবল প্রতিপক্ষ। এরপর বেগম রোকেয়া উন্নত সাহিত্য রচনা করেছিলেন কিনা সে বিচারে সমালোচক সংকুচিত হন, যদিও শেষ পর্যন্ত সে কর্তব্য তাঁর অপরিহার্য। কিন্তু এখানে মৌলিক কথাটা এই নয় যে তিনি অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করতে পেরেছিলেন কিনা; এখানে মৌলিক কথাটা হচ্ছে, এমন প্রতিকূল পরিবেশেও বাংলা সাহিত্য-চর্চার মতো মন তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। অধিকন্তু এ মন বিশুদ্ধ-ভাবে ব্যক্তি-মন ছিল না; এ ছিল তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমানের অবচেতন সমাজ-মানসেরও অন্তর্গত। এবং একথাও স্বীকার্য যে তিনি যাই লিখে থাকুন, রীতিগত ও প্রাকরণিক ত্রুটি তাঁর যাই থাক, বাংলা ভাষার ওপর তাঁর সহজ স্বাভাবিক সাবলীল অধিকার ছিল। বাংলা ভাষা ছিল তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদিক দিয়ে তিনি একান্তভাবে বঙ্গনন্দিনী। এবং তিনিই এ-শতাব্দীতে, বলা যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, প্রথম উল্লেখ-যোগ্য মুসলিম লেখিকা। এ প্রসঙ্গে নওয়াব ফয়জুন্নেসার নাম মনে আসে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চা মোটের উপর কৌতূহলের সামগ্রী এবং গবেষণার উপকরণ মাত্র।

রোকেয়া-জীবনের একটি কথার ওপর কেউ আলোকপাত করেন নি, সেটি একান্ত ব্যক্তিগত: বঙ্গভাষাপ্রীতি অন্তরে পুষে রেখে, অবাঙ্গালী উর্দুভাষী দোজবর বয়স্ক স্বামীকে তিনি কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে স্বামীর সংসারে তিনি কতোটা সুখী হতে পেরেছিলেন। অবাঙ্গালী স্বামীর সংসারে তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলা ভাষা যে তিনি ভুলে যেতে

পারেন, এবং এই ভুলে যাওয়া যে অবাঞ্ছনীয়, একথা অন্তত তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভেবেছিলেন। বেগম রোকেয়াও যে উর্দুভাষী সমাজে পীড়িত বোধ করতেন তা উল্লিখিত উৎসর্গপত্রে সুস্পষ্ট। সে সমাজ তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল না। তাই তাঁর সচেতন অনমনীয় বাঙ্গালী সত্তা উর্দুভাষী সমাজে এবং স্বামীর সত্তায় মিশ্রিত বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে উত্তীর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

দাম্পত্য-জীবনেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর ইংরেজী রূপকগল্প Sultana's Dream। বেগম রোকেয়া কখনো স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করেননি, কিন্তু ইংরেজীর ওপর তাঁর উত্তম দখল ছিল, এ গল্পই তার প্রমাণ। নারীর ওপর পুরুষের অনেক অসঙ্গত প্রভুত্বমূলক অবিচারের, এবং বিশেষ করে অবরোধ-প্রথার, প্রতিশোধ-স্পৃহা এ গল্পে রূপায়িত: এর পাণ্ডুলিপি পড়ে তাঁর স্বামী যে মন্তব্য করেছিলেন "a terrible revenge" তা ঠিকই। সমাজের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার সংঘর্ষের প্রথম স্ফুলিঙ্গ এই গল্প। প্রত্যেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই তাঁর পরিবেশকে নিজের মনোমত করে পুনর্গঠিত করতে চান। বেগম রোকেয়ার অতৃপ্ত অশান্ত আলোকিত মন তাই করতে চেয়েছিল, প্রথমত স্বামীকে বাংলা শিখিয়ে, এবং তারপর শিক্ষার প্রসার ও নারী-আন্দোলন-প্রয়াসে। কিন্তু তাঁর পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তাঁকে পথ করে নিতে হয়েছিল। মৃত্যু অবধি তাঁর জীবনকাহিনী সমাজের সঙ্গে এই সংঘর্ষেরই কাহিনী। নারীশিক্ষা, নারী-আন্দোলন এবং চিন্তাচর্চা, এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর সংঘর্ষ ব্যাপ্ত ছিল।

বেগম রোকেয়ার সমাজ-চিন্তার কেন্দ্রে ছিল নারী-জীবন, তৎকালীন ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর এ চিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল নারীর মানবীয় সত্তার প্রতিষ্ঠা: শুধু বিবিধ ভূমিকায় নারীসত্তার নয়, তার মানবীয় সত্তারও। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎদর্শিনী: তাঁর যুগের চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর। তাঁর চিন্তার মূল সূত্রগুলি সুপরিচিত: তিনি নারী-সমাজের শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, এবং অবরোধপ্রথার অবসান চেয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেই ক্ষান্ত হননি। নির্ভুল ভাষায় তিনি নারীর মানবীয় সত্তার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠাও কামনা করেছিলেন। "মতিচুর"-এর প্রথম খণ্ডে 'অর্ধাঙ্গী' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, শারীরিক শক্তিতে নারী অপেক্ষাকৃত দুর্বল, শুধু এই কারণেই স্বামী স্ত্রীর "প্রভু" হতে পারে না, কেননা নারী ও পুরুষ উভয়কেই উভয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়,

সে হিসেবে উভয়ের মূল্য সমান। "মতিচুর"-এর দ্বিতীয় খণ্ডের 'জ্ঞানফল' নামক রূপক-গল্পের বক্তব্য হচ্ছে যে, যে-জ্ঞান পুরুষের একচেটিয়া তা মৃত জ্ঞান। ঐ খণ্ডেরই 'মুক্তিফল' শীর্ষক রূপক-গল্পের বক্তব্য, কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব। তাঁর "পদ্মরাগ" উপন্যাসের নায়িকা জয়নাব তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে এই বলে: 'আমি সমাজকে দেখাইতে চাই একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারমর্ম নহে।'

বেগম রোকেয়ার এই চিন্তাধারা যে সর্বাংশে মৌলিক তা নয়। এ চিন্তাধারার সূত্র কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথে, এমনকি রঙ্গলালেও প্রাপ্তব্য; তাঁর সামনে ছিল প্রতিবেশী সমাজের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দৃষ্টান্ত, এবং ইংরেজীর মাধ্যমে আধুনিক ভাবধারার সঙ্গেও ছিল তাঁর মনের সংযোগ; কিন্তু এসব ভাবধারাকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। এ তাঁর অগ্রসর চেতনারই পরিচয়—সেকালের মুসলিম সমাজের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর।

বেগম রোকেয়া এ-ও উপলব্ধি করেছিলেন যে নারীর স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতির জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন। "মতিচুর"-এর প্রথম খণ্ডে 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন:

> পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী জজ---সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এদেশের নারীকে 'রানী" করিয়া ফেলিব। আমরা উপার্জন করিব না কেন?----যে পরিশ্রম আমরা "স্বামীর" গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?

"নারী" শব্দটির বানান উল্টে কিভাবে তিনি "রানী" করেছেন তা লক্ষণীয়। এখানে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টি নিজের যুগ অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সুদূর অবধি প্রসারিত। যে পরিবারের কিশোরী কন্যা একদিন ভিন্ন পরিবারের অপরিচিতা নারীর সামনে বার হবার অবাধ অনুমতি পেত না, সে পরিবারের মেয়ের পক্ষে এ বিপ্লবাত্মক উক্তি। অথচ বেগম রোকেয়া এখানে যা বলেছেন তা একদিন মুসলিম সমাজে অচিন্তনীয় মনে হলেও আজ একান্ত বাস্তব। এবং সমাজের অগ্রগতির ফলে মুসলিম নারী যে আজ বহু ক্ষেত্রে মুক্ত আলো-হাওয়ায় বিচরণ করতে সক্ষম এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

পদে অধিষ্ঠিত, এটা যুগধর্মে একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল যুগধর্মে নয়। বাদুড় ইত্যাদি কয়েকটি স্বল্প-সংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত ইতর ও উন্নত সকল প্রাণী-প্রজাতিরই সুস্থ-সবল দেহ বিকাশের জন্য মুক্ত আলো-হাওয়ার স্বাভাবিক প্রয়োজন, কিন্তু মুসলিম সমাজে তার ব্যতিক্রম করা হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, রোকেয়া যে সমাজরীতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা অমানবিক ও অস্বাভাবিক। এই সমাজপরিস্থিতি থেকে মানবিক ও স্বাভাবিক সমাজ-পরিস্থিতিতে বর্তমানে মুসলিম নারী-সমাজের যে উত্তরণ, রোকেয়ার জন্মকাল ও বর্তমানকাল—এই দুই কাল-বিন্দুর বিচারে তা বিপ্লবাত্মক। বিপ্লব প্রায়শ:ই আদর্শগতভাবে অস্বাভাবি-কের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকের বিদ্রোহ; অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানবিকতার: যদিও নানা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে বিপ্লবের আদর্শ আংশিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়া সম্ভব।

রোকেয়ার কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তাধারা মূলতঃ নন-কনফর-মিস্ট। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা সমাজ-বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ অনেকাংশে পুরাতন বলে প্রতীয়মান; তবু দু'একটি মৌলিক প্রশ্নে তিনি আজও নন-কনফরমিস্ট। উদাহরণ বাংলা ১৩১১ সালে "নবনূর" পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কিত তাঁর মতামত। এ প্রবন্ধে তিনি অভিযোগ করেন যে, নারীর অধিকারগুলি দমন করার জন্য শাস্ত্র-বচনকে ব্যবহার করা হয়, এবং 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশ-পত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' শুধু ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে নয়, 'ঈশ্বর-প্রেরিত দূতের' সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করে তিনি বলেন:

> পূবাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনেব মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর-প্রেবিত দূত বলিযা প্রকাশ করিয়াছেন।

ধর্মগ্রন্থগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলি "পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।.........ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কিনা তাহা কেহই নিশ্চয় (করিয়া) বলিতে পারে না।" কিন্তু বেগম রোকেয়ার দু:সাহসিক চিন্তা এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। তিনি আরও বলেছেন:

> ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বর-দত্ত জলবায়ু ত সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নতমস্তকে অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ় সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।

লক্ষণীয় যে এ প্রবন্ধ রচনার সময় রোকেয়ার বয়স ছিল প্রায় চব্বিশ এবং তাঁর স্বামী ছিলেন জীবিত।[১] পিতৃপরিবারের দুই বিরুদ্ধ-প্রভাব ছাড়াও, স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর মনে এসব মতামতে সঞ্চারণে কতখানি সহায়তা করেছিলেন তা কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। কিন্তু এখানে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে একজন বাঙ্গালী মুসলিম তরুণী খৃস্টীয় ১৯০৪ সালে এরূপ দু:সাহসিক চিন্তা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

দু'একজন গোঁড়া ধর্মবাদী লেখক, বলা বাহুল্য, বেগম রোকেয়ার এসব মতামতের সমালোচনা করেছিলেন, সম্ভবত: এই কারণে তিনি প্রবন্ধটির এই অংশ বাদ দিয়ে, বাকীটুকু 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শিরোনামে "মতিচুর"-এর প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ ও অন্যবিধ রচনা মতামতমূলক এবং উদ্দেশ্য-ধর্মী এবং মতামতের প্রকাশভঙ্গীতে ও রচনারীতিতে তিনি সর্বত্র সুগৃহিণীর পরিচয় দিতে পারেননি, কিন্তু তাঁর এসব রচনার মূল্য যতটা সুকুমার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়, তার চাইতে বেশী চিন্তার সাহসিকতার জন্য।

বেগম রোকেয়ার বিষয়বস্তু ছিল সাধারণত: গুরুভার সমাজ-সমস্যা। রচনার নিটোল রূপকর্ম তাঁর আয়ত্তে ছিল না তা বলেছি; কিন্তু তাঁর রচনাবলী প্রায়শ: ঘরোয়া শব্দ ও প্রবচন-ব্যবহারে সাবলীল এবং মৃদু হাস্যকৌতুকে উদ্ভাসিত। কৌতুক-রচনা হিসেবে তাঁর 'নিরীহ বাঙ্গালী' এখনো উপভোগ্য ("মতিচুর" প্রথম খণ্ড)। কর্ম-বিমুখ কোমল-প্রকৃতি বাঙ্গালীকে পরিহাস করে এ-প্রবন্ধ লিখিত।

> আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী শব্দে কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা এই অমিয়াসিক্ত বাঙ্গালী কেন বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যুথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা---এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে ··· ··· ।

পরিহাস-চটুল সুরে তিনি বাঙ্গালীদের আরও অনেক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি দুর্বলতা হচ্ছে, অল্প-বিস্তর

১, বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে, মৃত্যু ১৯৩২ সালে। বিবাহের বৎসর ১৮৯৯, স্বামীর মৃত্যু ১৯০৯ সালে।

অর্থব্যয়ে দেশে কোনো মহৎ কাজ করে খ্যাতি লাভ করার চাইতে খান বাহাদুর বা রায় বাহাদুর উপাধির আশায় অর্থব্যয়ের ব্যস্ততা, এবং আরেকটি দুর্বলতা হচেছ দরিদ্র প্রতিবেশীদের শোক-দু:খে ব্যথিত হওয়ার চাইতে পরলোকগত বিদেশী বড়লোকদের জন্য শোক-সভার আয়োজন করা। "ভারতের পুরুষ-সমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা" বলেও তিনি উপহাস করেছেন। বাংলা ১৩১৪ সালে প্রকাশিত "মতিচুর" প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে এই প্রবন্ধের শেষে প্রদত্ত এক ফুটনোটে তিনি শেষোক্ত মন্তব্য সংশোধন করেছিলেন। বাংলাদেশের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন হয়তো তার কারণ। তিনি লিখেছিলেন :

> গত ১৩১০ সালে 'নিরীহ বাঙ্গালী' লিখিত হইয়াছে। সুখের বিষয় বর্তমান সালে আর বাঙ্গালী 'পুরুষিকা' নহেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন শুভ পরিবর্তন হইবে, ইহা কে জানিত? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমরা সাহসী বাঙ্গালী।

শেষের শব্দ দু'টি বড় টাইপে ছাপা হয়েছিল।

বেগম রোকেয়া অত্যন্ত সমাজ-সচেতন লেখিকা ছিলেন। এরূপ লেখকদের জন্য বিপদ এই যে সমাজের সমস্যা বিলুপ্ত হয়ে গেলে তাঁদের রচনার মূল্যও হ্রাস পায়। কিন্তু তাঁদের অন্তত: কিছু রচনা সাহিত্য-ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয় চিন্তাও রচনার উৎকর্ষের জন্য। বেগম রোকেয়াও তেমন রচনা রেখে গিয়েছেন। দুই খণ্ডে প্রকাশিত "মতিচুর"-এর কতকগুলি রচনা এখনও পাঠযোগ্য এবং স্মরণীয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথম খণ্ডের 'স্ত্রীজাতির অবনতি' (১৩১১ সালের "নবনূর" পত্রিকায় সাবেক 'আমাদের অবনতি' শিরোনামে প্রকাশিত এবং পরে-বর্জিত-অংশ-সহ) 'নিরীহ বাঙ্গালী' এবং 'অর্ধাঙ্গী'; দ্বিতীয় খণ্ডের 'সুলতানার স্বপ্ন, 'জ্ঞানফল' এবং 'মুক্তিফল'। শেষোক্ত রচনা তিনটি রূপক-গল্প। বেগম রোকেয়ার রূপক-প্রিয়তার সাক্ষ্য এই দু'খণ্ডের আরও কয়েকটি রচনা বহন করছে। এ ছাড়াও এ বইগুলির কোনো কোনো রচনা এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও অভিভাষণ সামগ্রিকভাবে না হোক আংশিকভাবে এখনও পাঠযোগ্য।

এমন অনেক লেখক থাকেন যাঁরা সব সময় সমগ্রভাবে উৎকৃষ্ট রচনা উপহার দেন না; কিন্তু তাঁদের অনেক রচনার অনেকগুলি অংশ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। বেগম রোকেয়া তেমনি একজন লেখিকা ছিলেন। তাঁর সমগ্রভাবে উৎকৃষ্ট রচনার সংখ্যা কম; কিন্তু তাঁর বহু রচনা আংশিকভাবে

উৎকৃষ্ট ও স্মরণীয়: রচনারীতির উৎকর্ষের জন্য সর্বদা নয়, তবে চিন্তার দু:সাহস ও উৎকর্ষের জন্য. বাঙ্গালী সমাজের প্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। রূপকর্মের অভাব যতোই থাক, বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে আধুনিক জাগরণশীল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে তিনি প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখিকা, অধিকন্তু আধুনিক বাঙ্গালী মুসলিম জাগরণের তিনি প্রতীক। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' আগে মুসলিম সমাজের জাগরণে যাঁদের ভূমিকা স্মরণীয়, তিনি তাঁদের অন্যতম। এবং বস্তুত: এও অত্যুক্তি হবে না যে মানস-প্রকৃতিতে ও চিন্তায় আধুনিকতা বলতে যা বোঝায়, বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে মাতৃভাষায় তিনিই তার প্রথম উল্লেখ্য প্রবক্তা। তাঁর পরেও মুসলিম সমাজের একাংশ গোঁড়ামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়ে গেছে; কিন্তু অপরাংশ তাঁর চিন্তা ও ধ্যানের পথেই অগ্রসর হয়েছে। বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা তাই শুধু লেখিকা হিসেবে নয়, জাগরণের অন্যতমা অগ্রদূতী হিসেবে; এবং একটি স্মরণীয় প্রবল ব্যক্তিত্ব হিসেবেও, যিনি সর্বদা প্রতিকূল স্রোত ঠেলে উজানের দিকে এগিয়েছেন, কখনো ভেসে যেতে চাননি।

১৯৬৫

কাজী ইমদাদুল হক

"আবদুল্লাহ্" উপন্যাসকে কেন্দ্র করে অধুনা কাজী ইমদাদুল হকের খ্যাতি মূলত: ঔপন্যাসিক হিসেবে; কিন্তু তিনি বিচিত্রমুখী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন, কিশোর-সাহিত্য লিখেছেন, এবং তরুণ বয়সে তিনি বেশ কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে কাজী সাহেবের ক্ষমতা স্বীকৃত; কিন্তু এইসব বিভাগেও তিনি কিছু কিছু ক্ষমতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

তরুণ বয়সে লিখিত কিছু কবিতা নিয়ে কাজী সাহেব একটি কাব্য-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন, সবিনয়ে তার নাম দিয়েছিলেন "লতিকা"। এর কয়েকটি কবিতা বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও, "লতিকা" কখনো দিনের আলো দেখেনি। এই কাব্যগ্রন্থ কাজী ইমদাদুল হকের সাহিত্য-জীবনের উপর সম্পূর্ণ নতুন আলোকপাত করে। নতুন বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, এই কাব্যগ্রন্থে একটি প্রকৃত কবিমনের সাক্ষাৎ মেলে, যার পরিচয় তাঁর গদ্য-রচনাগুলিতে লক্ষণীয় নয়। এমন অনেক কবি থাকেন যাঁরা গদ্য-রচনার মধ্যেও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁদের কবি-মনের পরিচয় রেখে যান; এবং এমন অনেক গদ্যলেখক থাকেন যাঁরা কবিতা না লিখলেও গদ্যরচনায় তাঁদের প্রকৃতির কাব্যধর্মিতা প্রকাশ করেন। কাজী ইমদাদুল হক সেরূপ কবি অথবা গদ্যলেখক ছিলেন না, অথচ তিনি কবি ছিলেন; তাঁর অনুরাগী পাঠকদের কাছে তাঁর কবিতা তাই কৌতূহলের সামগ্রী বলে গণ্য হবে। বাঙ্গালী লেখক-সমাজের প্রায় সার্বজনীন নিয়ম অনুসারে কাজী সাহেব কাব্যরচনা দিয়েই সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন। "লতিকার" পাণ্ডুলিপিতে লেখকের স্বহস্তে তারিখ দেওয়া আছে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ। কাজী সাহেবের বয়স তখন ২১ বছর; ৬৭ পৃষ্ঠার এই পাণ্ডুলিপিতে ভালো কবিতা কিছু আছে, অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কাব্যচর্চা তাঁর খেয়াল মাত্র ছিল না, পরবর্তী কালের রচনাগুলিতে কাব্যলক্ষণ একান্ত দুর্লভ হলেও অন্তত

জীবনের সেই প্রথম প্রহরে তিনি কবি-মানসের অধিকারী ছিলেন। তাঁর "খেদ" নামক চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণ:

আনন্দের রাশি হতে তুলিয়াছে গড়ি'
বিধাতা উহারে বুঝি।--মোর হৃদয়ের
সমস্ত উচ্ছ্বাস দিয়ে উহার দেহের
সৌন্দর্য গঠিত যেন!

একজন প্রকৃত কবির রচনা। তাঁর "হাসি" নামক আরেকটি চতুর্দশপদী কবিতা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

তত ভাল নাহি লাগে চন্দ্রিকার খেলা
চঞ্চল বাহিনী-বুকে--লহরে লহরে
জোছনার ছুটোছুটি। স্থির সরোবরে
ফুল্ল-কুমুদিনী-হাসি কৌমুদির মালা
হৃদে ধরি, ---তাও নহে তত প্রাণময়।
নির্জন বনময় কুসুমের হাসি
মলয়-চুম্বনে মৃদু, বড় ভালবাসি,
সে হাসিরাশিতে কিন্তু হয় না হৃদয়
কখনো আপনহারা। নিকুঞ্জ-কাননে
উষাদেবী হাসে যবে, বড় মনোহর
হয় নাকি, ছোটে নাকি সুধার লহর---
সে হাসি মলিন অতি আমার নয়নে।
কেননা হেরেছি হাসি তার সে মুখের---
উচ্ছ্বাসের প্রতিমূর্তি আমার বুকের।

এটি একটি নিটোল প্রেমের কবিতা। অবশ্য এর প্রথম ও চতুর্থ চরণের মিল ত্রুটিপূর্ণ; এবং অষ্টক ও ষটকের গঠন ও শেষ দুই চরণের মিলের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বলা যায় যে, পেত্রার্কান টাইপের সনেট সম্বন্ধে কবির ধারণা পরিষ্কার ছিল না, কেননা এ গ্রন্থে এই টাইপের আরো একটি সনেটে অনুরূপ অনবধানতার পরিচয় আছে। কিন্তু সনেটের আঙ্গিক আক্ষরিকভাবে খুব কম কবিই অনুসরণ করেছেন, এদেশে এবং বিদেশে সর্বত্র, এবং সনেটের যে ত্রুটিই থাক, কবিতা হয়ে উঠলে তার সব ত্রুটিই অবান্তর হয়ে যায় এবং কবিতা হিসেবে তা কাব্য-ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়। 'খেদ', হাসি', এবং 'কথা' নামে আরেকটি সনেট, "লতিকা"র অন্ততঃ

এই তিনটি চতুর্দশপদী কবিতা আমাদের এই শ্রেণীর কাব্য-ঐতিহ্যের অন্তর্গত হওয়ার উপযুক্ত। শেষোক্ত সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

শুনেছি মধুর ধ্বনি বীণার ঝঙ্কার
উচ্ছ্বাসে বিভোর-প্রাণ সুদক্ষ করের;
শুনেছি বাঁশীর গান---ললিত উষার
ললিত রাগিনী, আর হতাশ প্রাণের
উদাস সোহাগ-তান গভীর নিশীথে।
শুনেছি বসন্তাগমে পিক্-পাপিয়ার
কাকলি-পঞ্চম-স্বর একা বনপথে
ভ্রমিতে আপন মনে। স্বচ্ছ-সলিলার
শুনিয়াছি কলগান সাঁঝ-সকালের
নিরিবিলি কূলে বসি'। আরো শুনিয়াছি
প্রিয়ার মরম-কথা গুপ্ত হৃদয়ের
মুক্ত কক্ষপথবাহী---শুনি বুঝিয়াছি,
বীণাধ্বনি বাঁশীরব কুহু কল-তান
কিছু কভু নহে সেই কথার সমান।

অন্ত-মিলের ত্রুটি এই কবিতায়ও আছে, এবং এর দ্বিতীয় চরণটি শিথিল-গঠন, কিন্তু আঙ্গিক-বিচারে এটিকে সেক্সপীরিয়ান টাইপের সনেট বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই সনেটগুলি, এবং এ গ্রন্থের আরও সনেট কাজী ইমদাদুল হকের সনেট-প্রিয়তার পরিচয় বহন করে। তরুণ বয়সেই তিনি সনেটের নিয়ম-শৃঙ্খলার দাবীগুলি অনেকটা মেনে নিতে পেরেছিলেন, এবং কিছু ত্রুটিযুক্ত হলেও, তাঁর সনেটগুলি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল-গতি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কথা বোধহয় এই যে, তিনি এদেশের আদি সনেট-লেখকদের অন্যতম।

"লতিকায়" অবশ্য গীতি-কবিতার সংখ্যাই বেশী। ঠিক কতটি কবিতা এতে ছিল তা বলা সম্ভব নয়, কেমনা, দু:খের বিষয়, পাণ্ডুলিপির মাঝখান থেকে কিছু পৃষ্ঠা অন্তর্হিত, কোনো কারণে হয়তো চিরতরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে, এবং কবি পাণ্ডুলিপির গোড়ায় কোনো সূচীপত্রও দেননি। তবে যতটুকু পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, ভাববস্তুর দিক দিয়ে তিনি শুধু প্রেমাবেগের কবি ছিলেন না, জীবনজিজ্ঞাসারও কবি ছিলেন, এবং তৎকালীন কাব্য-প্রকরণ সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। তৎকালীন

কাব্য-প্রকরণের অর্থ অবশ্য প্রধানতঃ রবীন্দ্রকাব্য-প্রকরণ। "লতিকা"র পাণ্ডুলিপি তৈরীর আগেই রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা" পর্যন্ত বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল "কড়ি ও কোমল", "মানসী", "সোনার তরী" এবং "চিত্রা"। অতএব সেকালের তরুণ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব পড়বে এটা স্বাভাবিক। "লতিকা"র চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে "কড়ি ও কোমল"- এর প্রেমোষ্ণতার অনুরণন অনুভব করা যায়। দু'একটি কবিতায় রবীন্দ্রপূর্ব কাব্য-রীতির প্রভাব লক্ষণীয় হলেও, কাজী ইমদাদুল হক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে যুক্তাক্ষরকে দু'মাত্রা হিসেবে গণনা করেছেন, এবং "লতিকা"র যতটুকু পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, এ-ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যের পেছনে দৃষ্টিপাত করে-ননি। যেমন "স্মৃতি" নামক এক দীর্ঘ কবিতায়:

কত দিন-অবসানে রক্ত বরণে
রঞ্জিত সাঝ-গগনে
যত কৃষি-বালকের উদাস-মধুর
দূরাগত বাশী-বাদনে
প্রীতি- ভরপুর প্রাণে অধরে অধরে
আবেশ-অবশ মিলনে
কত রহিতাম ডুবি স্বপনে স্বপনে
উল্লাসে মোরা দু'জনে।

এ কবিতায়ও কাজী ইমদাদুল হকের অন্ত-মিলের দুর্বলতা লক্ষণীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যুক্তাক্ষর ও অনুপ্রাস ব্যবহারের উল্লাস এবং কবিতার সহজ ও সাবলীল গতি।

"লতিকা"র পর তিনি আর কবিতা বিশেষ লেখেননি। সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশিত না হওয়ার নিরুৎসাহ হয়ে তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। যেন তারই পূর্বাভাস পাওয়া যায় পাণ্ডুলিপির একেবারে প্রথমে ভূমিকা-স্বরূপ লিখিত চারটি চরণে:

ক্ষুদ্রতম তুচ্ছ লতিকাটি
আসিতেছে কাছে ভয়ে ভয়ে,---
হেলাভরে ঠেলিও না, পাছে
ব্যথা পেয়ে যায় গো শুকায়ে।

লতিকাটি অবহেলিত হয়েছিল এবং তাঁর কাব্যরস সত্যি শুকিয়ে গিয়েছিল। কবিতা লেখা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, এবং এমনকি তাঁর পরবর্তী গদ্য-রচনাগুলিতেও কাব্যধর্মিতা প্রায় বর্জন করেই গিয়েছেন।

তাঁর সম্পর্কিত আলোচনায় "আঁখিজল" নামে আরেকটি কাব্য-গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আমি কোথাও দেখিনি।

প্রথম কাব্য-প্রয়াসের কিছু পরেই কাজী ইমদাদুল হক গদ্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর একটি প্রিয় বিষয় ছিল ইসলামের ইতিহাস। এই বিষয়ে তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। তাঁর কিছু প্রবন্ধ "প্রবন্ধমালা" নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

তিনি একাধিক খণ্ডে "প্রবন্ধমালা" প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ গ্রন্থের অন্তত: একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এটি স্কুল-পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল এবং স্কুল-পাঠ্যপুস্তকের বেশী কিছু এটা হয়েও ওঠেনি। তবে তাঁর গদ্যরীতির ব্যাপকতর পরিচয় লাভের জন্যে বইটি পাঠযোগ্য। ইসলামের ইতিহাস-বিষয়ক এই প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি মৌলিক গবেষণা ও মনীষার দাবী করেননি। গদ্যরীতি সাধারণত: সহজ ও সাবলীল, এবং কোনো বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়। যেমন "আবদুর রহমানের কীর্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের এই অংশ।

> শার্লমেনের এই নিষ্ফল অভিযানের ফলে আবদুর রহমানেরই বিশেষ লাভ হইল। তাঁহার আধিপত্য স্পেনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে পর, তিনি লোক পাঠাইয়া তাহার ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে লুকাইয়া ছিলেন, সকলকে স্বরাজ্যে আনাইলেন, এবং দীর্ঘ দু:খের অবসানে শান্তির সংসার পাতিলেন। তাহার বাল্যকালের স্বপ্ন ও যৌবনের আকাঙ্ক্ষা, তাহার একাগ্রতা, আত্মনির্ভরতা ও দৃঢ়তার ফলে এতদিনে সফলতা লাভ করিল। ইতিহাসে এরূপ জীবন-চরিত ক্বচিৎ দেখা যায়।

কিন্তু সহজ সাবলীল রীতির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও আছে। এই গ্রন্থেরই "আল্‌হামরা" নামক প্রবন্ধের তৎসম শব্দবহুল রীতি বিশেষ লক্ষ্য-যোগ্য। গ্রানাডার আল্‌হামরা প্রাসাদের প্রাঙ্গণস্থিত একটি জলাশয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাজী ইমদাদুল হক লিখছেন:

> ইহার মধ্যস্থলে সুবর্ণ মৎস্য-পরিপূর্ণ একটি জলাশয় আছে এবং যখন বালসূর্যরশ্মি-জাল সেই সকল ক্রীড়ারত মৎস্যগাত্র হইতে প্রতিফলিত হইতে থাকে, তখন এক অতি অনির্বচনীয় দৃশ্য প্রকটিত হয়। নানা কারুকার্যখচিত এবং বিচিত্র চিত্রে শোভিত স্তম্ভসমূহে প্রাঙ্গণটি বেষ্টিত; ইহার উত্তরে চতুষ্কোণ কোমারিস দুর্গ ঊর্ধ্বমুখে গগনমণ্ডল চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদের ঈষৎ সারল্য বাদ দিলে, সমগ্র প্রবন্ধটিই এই রকম তৎসম শব্দের সমারোহে বন্ধুর। এখানে তৎসম শব্দের প্রস্তর-স্তর উদঘাটন ক'রে রস আহরণ করতে হয়। এ রীতি বিদ্যাসাগরীয় রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁর এই শব্দচয়ন সুঠাম ও সুনিশ্চিত। "প্রবন্ধমালা" গ্রন্থের মধ্যে 'আল্‌হামরা' প্রবন্ধটি কাজী ইমদাদুল হকের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়, তবে এক বিশিষ্ট গদ্যরীতির নমুনা। এ গ্রন্থের এই একটি প্রবন্ধ পাঠ ক'রে এখনও অনেকে কৌতূহলান্বিত হবেন।

ছোটদের জন্য তিনি কিছু গল্প এবং "নবিকাহিনী" লিখেন। "নবি-কাহিনী"তে কাজী সাহেবের আরেক রকম রচনারীতির সাক্ষাৎ পাই। এতে হজরত আদম থেকে শুরু ক'রে হজরত ঈসা পর্যন্ত প্রধান প্রধান নবীদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে শাদ্দাদ, নমরূদ এবং রানী বিলকিসের উপাখ্যান। "নবিকাহিনী" তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এটি রূপকথার ঢঙে কিশোর-পাঠকদের উপযোগী ক'রে লেখা। কাজী সাহেবের মৃত্যু ১৯২৬ সালে, "নবিকাহিনী" তার অনেক আগের রচনা, সে হিসাবে কিশোর সাহিত্যের আদি মুসলিম লেখকদের মধ্যে তিনি একজন। পাঠযোগ্য ও উপভোগ্য কিশোর-সাহিত্য হিসেবে আজও "নবিকাহিনী"র মূল্য আছে বলে মনে করি। এখানে তাঁর রচনারীতির কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি। মশার ঝাঁক নমরূদের সৈন্য-বাহিনীকে পর্যুদস্ত ক'রে দেওয়ার পর, নমরূদের অন্তিম সময়টার বর্ণনা এইরূপ :

> আর নমরূদ? একটা মশা তাঁহার নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়া মাথায় গিয়া উঠিয়াছিল। সেটা অনবরত তাঁহার মগজে কামড় বসাইতে আরম্ভ করিল। নমরূদ তাহাতে অস্থির হইয়া পাগলের মত যেখানে-সেখানে মাথা ঠুকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মাথা যতক্ষণ ঠোকেন মশাটি ততক্ষণ শান্ত থাকে। ঠোকা বন্ধ করিবামাত্র সে আবার কামড়াইতে আরম্ভ করে। অবশেষে নমরূদ এক চাকর রাখিলেন, সে দুই হাতে দুইটা কাঠের হাতুড়ি লইয়া তাঁহার মাথায় দিবারাত্র ঠাকঠক ঠুকিতে লাগিল।
>
> কিন্তু সে বেচারা আর কাঁহাতক ঠুকিবে? ঠুকিতে ঠুকিতে বিরক্ত হইয়া সে একদিন ঠাঁ করিয়া দিয়াছে এক ঘা, আর অমনি নমরূদের মাথাটা ফাটিয়া চৌচির।

ছত্রিশ বছর বয়সের পূর্বে কাজী সাহেব উপন্যাস রচনার কোনো চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু তারপর ১৯১৮ সালে এক

রোগ উপলক্ষে দীর্ঘ হাসপাতাল-বাসের সময় তিনি উপন্যাস রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন, এবং প্রথম প্রয়াসেই বিরল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

"আবদুল্লাহ্" তাঁর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি এবং বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যেরও একটি উল্লেখযোগ্য বই। তবে একে শ্রেষ্ঠতম বাংলা উপন্যাসগুলির সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হবে না, কেননা এটি কাজী সাহেবের প্রথম প্রয়াস, তাও তিনি সমাপ্ত ক'রে যেতে পারেননি,—অকালমৃত্যু তাঁর জীবনে ছেদ টেনে দিয়েছিল এবং অন্য একজন লেখক (আনোয়ার-উল্ কাদির) শেষের পরিচ্ছেদগুলি লিখে উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন।

"আবদুল্লাহ" যখন লিখিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছে, এবং শরৎচন্দ্র তাঁর পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-মানবীদের হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব তখন বাংলা উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু। "আবদুল্লাহ্" সে ধরনের উপন্যাস নয়। প্রতীকী প্রকরণ ব্যবহৃত না হলেও এর চরিত্রগুলি যেন এক বিশেষ কালের মুসলিম সমাজের এক-একটি ভাবধারার প্রতীক। প্রবীণ চরিত্রগুলি সাধারণতঃ রক্ষণশীল এবং নবীন চরিত্রগুলি প্রগতিশীল। এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের সংঘাত "আবদুল্লাহ"-র উপজীব্য। তাদের সংঘাত হৃদয়াবেগের নয়, এমনকি সমাজ ও ব্যক্তিরও নয়, সামাজিক ভাবধারার সংঘাত। এই সংঘাতে কাজী সাহেবের সহানুভূতি তরুণদের প্রতি। কিন্তু তাঁর সহানুভূতি পুরোপুরি শিল্পী হিসেবে নয়, সমাজসংস্কারক হিসেবেই। এবং এই কারণে এ উপন্যাসের ঘটনাগুলি সব সময় নিজেদের নিয়মে ঘটে না, একটি ঘটনা থেকে আর একটি ঘটনা অনিবার্যভাবে উদ্ভূত হয় না, অনেক সময়েই লেখক ঘটান। সব ঔপন্যাসিকই অবশ্য তাই করেন, এমনকি নাট্যকারও, কিন্তু পরিস্থিতির গতিস্রোত থেকে লেখক যতটা অনুপস্থিত থাকতে পারেন, যতটা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন, উপন্যাস এবং নাটকের ততটাই উৎকর্ষ। কিন্তু "আবদুল্লাহ্"-র ঘটনা-সংস্থানে, চিত্রের পর চিত্র উন্মোচনে, সমাজের স্খলন উদ্‌ঘাটনে এবং বিভিন্ন চরিত্রের ব্যবহারে ও সংলাপে লেখকের হস্তক্ষেপ খুব বেশী প্রচ্ছন্ন নয়। এই উপন্যাসে তাই চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব ছাড়াও, লেখকের একটা সর্বব্যাপী ব্যক্তিত্বের প্রভাবও অনুভবযোগ্য।

১৩২৭ সালে "মোসলেম ভারত" পত্রিকায় প্রকাশের সময় আবদুল্লাহ্‌কে 'সমাজচিত্র' বলে আখ্যায়িত করা হতো। বস্তুতঃ "আবদুল্লাহ্" উদ্দেশ্যমূলক

উপন্যাস। কিন্তু সবটা নয়, সমাজ-সংস্কারের প্রেরণায় তাঁর মানস আবিষ্ট থাকলেও তিনি এক বিলীয়মান অবক্ষয়ী সমাজের অনবদ্য চিত্র এঁকেছেন এবং সেই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি ছোটবড় উজ্জ্বল চরিত্র রূপময় করেছেন। এই সব চিত্রের ও চরিত্রের যদি সজীবতা না থাকতো, এবং কাজী সাহেবের শিল্পনৈপুণ্য যদি না থাকতো তবে আরও বহু উপন্যাসের মতো "আবদুল্লাহ্" বিস্মৃত হয়ে যেত।

মুসলিম সংস্কৃতির দিগন্তে এই উপন্যাসের একটা বড়ো তাৎপর্য এই যে, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার যুগেও কাজী সাহেব উদার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে পেরেছিলেন, সামাজিক অবক্ষয়ে অবগাহন ছিল তাঁর মানস-প্রকৃতির বিরুদ্ধে। তাঁর জীবন-দৃষ্টির এই বলিষ্ঠতা ও আলোকময়তাকে স্বীকার করতেই হবে। এদিক দিয়ে সাহিত্যের যদি কোনো পালনীয় সামাজিক ভূমিকা থাকে,' তবে আবদুল্লাহ্' তা পালন করেছে।

সাহিত্যে অবশ্য শিল্পের প্রশ্নই সবচেয়ে বড়। যেমন "আবদুল্লাহ্" প্রকৃতই উপন্যাস হয়ে উঠেছে কিনা, অথবা এটি মুখ্যতঃ উদ্দেশ্যমূলক সমাজচিত্র এবং গৌণতঃ উপন্যাস ? যে বিশেষ সমাজ ও বিশেষ কালের এই চিত্র, সেই সমাজ ও কালের বাইরে এর আবেদন, এর সার্বজনীন আবেদন, কতটুকু ? কম হোক অথবা বেশী হোক, সব গল্প-উপন্যাস-নাটককেই এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়: উদাহরণতঃ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে হতে হচ্ছে; "আবদুল্লাহ"-র ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। সমাজ ও কাল-নিরপেক্ষ আবেদন যে-উপন্যাসের যত বেশী, সে-উপন্যাস তত শিল্পগুণে মণ্ডিত। এদিক দিয়ে "আবদুল্লাহ্"-র মূল্য যে উপেক্ষণীয় নয়, তার প্রমাণ, উপন্যাসটি আমাদের অন্যতম ক্লাসিকে পরিণত।

সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে বিচার করলে, "আবদুল্লাহ্" উপন্যাসে মুসলিম কথা-সাহিত্য-ধারার অগ্রগতির কয়েকটি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। কাজী সাহেব তাঁর অগ্রজ ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমানের পশ্চাদগতিকে অতিক্রম করে মুসলিম কথা-সাহিত্য-ধারাকে অনেকটা সমকালীন কথা-সাহিত্যের সমান্তরালবর্তী করেন। তিনি নজিবর রহমানের নীতিধর্মিতা ও উনিশ শতকীয় গদ্যরীতিকে আধুনিক সাবলীলতায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে মণ্ডিত

করে যতটা সম্ভব দৈনন্দিন ভাষার কাছাকাছি আনেন, এবং সংলাপে কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষার সদ্ব্যবহার করেন।

শেষোক্ত ব্যাপারে অবশ্য মীর মোশাররফ হোসেনই পথিকৃৎ, বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে, "বিষাদ-সিন্ধু"তে না হলেও অন্যান্য উপন্যাসধর্মী রচনায়; কিন্তু মোহাম্মদ নজিবর রহমান পশ্চাদগতি করেছিলেন। অবশ্য সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা তিনিও ব্যবহার করেছেন, "আনোয়ারা" উপন্যাসে দু'এক জায়গায় এর ব্যবহার লক্ষণীয়; কিন্তু তাঁর সংলাপ মূলতঃ "সাধু" রীতির। এই তিন জনের মধ্যে কাজী ইমদাদুল হকই উপন্যাসে আবহ সৃষ্টি ও চরিত্র রূপায়ণে কথ্যরীতি ও আঞ্চলিক ভাষার সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ সৈয়দ সাহেবের পারিবারিক মক্তবে শিক্ষণরত মৌলবী সাহেবের সঙ্গে আবদুল্লাহ্‌র কথোপকথনের উল্লেখ করা যেতে পারে।—আবদুল্লাহ্‌ মক্তবে গিয়েছিল মৌলবী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে। সেখানে ছাত্রদের প্রশ্ন করে সে বুঝতে পারল, সৈয়দ পরিবারের ছেলেদের যেমন যত্ন নেওয়া হয়, বাইরের গরীব পরিবারের ছেলেদের তেমন যত্ন নেওয়া হয় না। তার ফলে তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তখন আবদুল্লাহ্‌ জিজ্ঞাসা করল:

"ওদের বুঝি রীতিমত সবক দেন না, মৌলবী সাহেব?" মৌলবী সাহেব চট্‌ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দিমু না কিয়েল্লাই? ইয়াদ খরতাম ফারে না তো!"

আবদুল্লাহ্‌ প্রতিবাদ করিল, "কেন পারবে না মৌলবী সাহেব, আমি তো যে কয়টাকে দেখলাম, তারা তো কয়েকটা 'সুরা' বেশ শিখেছে।"

বৃদ্ধ একটু চঞ্চল হইয়া কহিল, "হঃ, যে ইয়াদ খরতাম ফারে, হে ফারে। আর হগগোল ফারে চীখার পারবার। আয় তো দেহি কলিমুদ্দী তর সবক লইয়া..."

বালকটি কিন্তু গড়গড় করে অনেকগুলি সুরা মুখস্থ বলে গেল। পান্দেনামা থেকেও সে ভালো আবৃত্তি করল। বোঝা গেল ছেলেটি মেধাবী, অবহেলা করেও মৌলবী সাহেব তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। তখন আবদুল্লাহ্‌ জিজ্ঞাসা করল, ছাত্রেরা যা পড়ে আর মুখস্থ করে তার অর্থ তারা কিছু বোঝে কিনা। তখন—

মৌলবী সাহেব দারুণ তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, "হঃ, মানি বুজ্‌বো। হেজ্জে মতনই খরতে মুণ্ডু গুইর‍্যা যায় তা আবার মানি বুজ্‌বো? খি বা খন, দুল্‌হা মিয়া। ইয়ার মইদ্দে আরো খতা আছে দুল্‌হা মিয়া, বোজলেন। খতা আছে।" বলিয়া মৌলবী সাহেব গূঢ়ার্থসূচক ভঙ্গী সহকারে মস্তক আন্দোলন করিলেন।

কথাটা কি তা জানার জন্যে আবদুল্লাহ্‌র কৌতূহল হ'ল। তখন মৌলবী সাহেব ছাত্রটিকে স্বস্থানে গিয়ে বসার নির্দেশ দিলেন, তারপর আবদুল্লাহ্‌র আরো কাছে ঘেঁষে ফিস ফিস করে বললেন:

"খতাডা খি বোজলেননি, দুলহা মিয়া? অরা অইলো গিয়া আতরাফগোর ফোলাফান, অরা এইসব মিয়াগোরের হমান হমান চলতাম ফারে? অরগো জিয়াদা সবক দেওয়া মানা আছে, বোজলেননি?"

"কার মানা?"

"খোদ সা'বের। তিনি দহলিজে বইস্যা হুনেন খারে খি সবক দি না দি।"

এরপর এই পরিচ্ছেদে এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদে মৌলবী সাহেব আর মাত্র কয়েকটি কথা বলে বিদায় নিয়েছেন, এবং এই তাঁর চির-বিদায়, কেননা আর কোথাও তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটেনি; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র হলেও তিনি উজ্জ্বল, তিনি আমাদের মনে সুস্পষ্ট রেখাপাত করে যান। এই স্বল্পক্ষণের আবির্ভাবে কয়েকটি কথার মধ্যে তিনি আশরাফ-আতরাফ সমস্যার শুধু একটা গ্লানিকর দিকই উদ্‌ঘাটন করেননি, নিজের চরিত্রও উদ্‌ঘাটন করে গেছেন। আশরাফ-আতরাফ সমস্যা প্রায় বিলুপ্ত, কিন্তু সে-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসে তিনি একটা জীবন্ত চরিত্র, এবং এটা সম্ভব হয়েছে আঞ্চলিক ভাষার নিপুণ ব্যবহারের জন্যে।

"আবদুল্লাহ্" উপন্যাসে এমনি অনেক চরিত্র ও সমাজ-চিত্রের নিপুণ রূপায়ণ আছে, যা কাজী ইমদাদুল হকের গভীর ও ব্যাপক পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। তিনি একটিমাত্র উপন্যাসে সমাজের শত শত ত্রুটি, সংস্কার ও কুসংস্কারের সমালোচনা করতে চেয়েছেন, এই কারণে "আবদুল্লাহ্" একটি রসহীন বর্ণনা-সর্বস্ব সমাজ-আখ্যানে পরিণত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি, বরং একটা সরস সমাজ-চিত্রমূলক স্মরণীয় উপন্যাস হতে পেরেছে, তার কারণ তাঁর সমাজ-সংস্কারমুখী মানস-প্রকৃতি

তাঁর শিল্পী-মানসকে সর্বত্র অভিভূত করতে পারেনি। এই দুই মানস-প্রকৃতির সমন্বয়ের ফসল "আবদুল্লাহ্।"

কাজী সাহেব সমাজের কোনো সমস্যা নিয়েই বাক্-বাহুল্য প্রকাশ করেননি। ফেনায়িত ভাবোচ্ছ্বাস ও ভাব-প্রবণতাকেও কখনো প্রশ্রয় দেননি। তিনি ছিলেন সংযত, মার্জিত, সুরুচিপ্রিয়, ভব্য মনের অধিকারী ; সমাজদেহে গ্লানির পর গ্লানি তিনি নিরীক্ষণ করে গেছেন এবং প্রত্যেকটি গ্লানি সম্বন্ধেই তাঁর মনোভঙ্গীটি অভ্রান্তভাবে প্রকাশ করেছেন—কিন্তু উপভোগ্য চিত্ররূপের আকারে এবং আভাসে-ইঙ্গিতে। আর এই কারণেই তাঁর গদ্যরীতি গাঢ়-সংবদ্ধ ও ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু জটিল নয়। দৃশ্যত সাধুরীতির হলেও এই উপন্যাসে তাঁর গদ্যরীতি তৎসম শব্দ-বহুল নয়—বরং দৈনন্দিন ভাষার নিকটবর্তী।

১৯৬৪

ইমদাদুল হক-রচনাবলী

কবি আবদুল কাদির-সম্পাদিত "কাজী ইমদাদুল হক-রচনাবলী" প্রথম খণ্ড মূল্যবান রচনা-সংগ্রহ। "নবীকাহিনী" এবং আরও কিছু কিশোর-পাঠ্য রচনা ব্যতীত কাজী সাহেবের প্রায় সমস্ত প্রধান রচনাই এতে সংকলিত হয়েছে। এই রচনাবলী মূল্যবান শুধু এই কারণে নয় যে "আবদুল্লাহ্" ক্লাসিক গ্রন্থে পরিণত, এবং যাঁর একখানি গ্রন্থও ক্লাসিকে পরিণত তাঁকে সমগ্রভাবে জানার জন্য তাঁর অন্যান্য রচনাও ঐতিহাসিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ। রচনা-সংগ্রহটি মূল্যবান এই কারণেও যে এতে এমন কিছু বিস্মৃত-প্রায় প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা ও কবিতা দীর্ঘকাল পরে পুনর্মুদ্রিত হল অথবা বিলুপ্ত সাময়িকপত্র থেকে এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল যার নিজস্ব মূল্য আছে। তাঁর অনেক প্রবন্ধ সাময়িকতার লক্ষণাক্রান্ত হলেও বৈদগ্ধ্যে ও রচনা-নৈপুণ্যে এখনও সুপাঠ্য, এবং তাঁর কিছু কবিতা প্রকৃতই উত্তম কবিতা।

কাজী ইমদাদুল হক প্রধানত "আবদুল্লাহ্" উপন্যাসের লেখক হিসাবেই সুপরিচিত। প্রবন্ধকার এবং শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর পরিচয় একালের পাঠকের কাছে অজ্ঞাত নয়, তবে তাঁর এই দু'শ্রেণীর রচনা দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠায় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা ছিল সুকঠিন। এই রচনাবলীর একটা বিশেষ গুরুত্ব এই যে এটি কাজী সাহেবকে কবি হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত করবে। বস্তুতঃ কাব্য-রচনা দিয়েই কাজী সাহেবের সাহিত্য-জীবন শুরু হয়েছিল, এবং তাঁর মানস-পরিণতির ধারা অনুসরণ ও তাঁর সমগ্র সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ন সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ (এবং প্রথম গ্রন্থ) "আঁখিজল" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে, প্রায় আঠারো বছর বয়সে। বহু-পুরাতন পত্রিকায় লেখক-প্রসঙ্গে কাব্যগ্রন্থটির উল্লেখ দেখা যায়, অন্যথায় এটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এর তিন বছর পরে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে কাজী সাহেব "লতিকা" নামে তাঁর দ্বিতীয়

কাব্য-সংকলনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, কিন্তু এটি কখনো প্রকাশিত হয়নি। তারপরেও তিনি কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু বেশী নয়। তাঁর এই-সমস্ত কবিতাকে "আঁখিজল", "সনেট" এবং "লতিকা" এই তিন শিরোনামায় রচনাবলীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। "লতিকার", মূল পাণ্ডুলিপির পাঁচটি সনেট "সনেট"-অংশে, এবং পাণ্ডুলিপির অবশিষ্ট কবিতা ও ১৯০৩ সালের পরে প্রকাশিত তিনটি কবিতা "লতিকা"-অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। আবদুল কাদির সাহেব কবিতাগুলির এই পুনর্বিন্যাস করায় কাজী সাহেবের কাব্য-কৃতির রূপরেখাটি স্পষ্টতর হয়েছে বলেই মনে হয়।

চার বছর আগে প্রকাশিত "কাজী ইমদাদুল হক" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি "লতিকা"র মূল পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তিতে যাব না। তাঁর সমস্ত কবিতা (যতটা জানা যায়) প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর কাব্যকৃতি সম্বন্ধে এখন একটা সামগ্রিক ধারণায় পৌঁছানোর সুবিধে হয়েছে। একান্ত তরুণ বয়সে প্রকাশিত ক্ষুদ্রায়তন "আঁখিজল" তারুণ্যের বিষাদ, প্রকৃতি-প্রেম ও বিরহের কবিতাগুচ্ছ; এটি এক তরুণ কবির প্রাথমিক আত্মপ্রকাশের প্রয়াস মাত্র, শিল্প-সফলতা অপেক্ষা অস্পষ্ট আবেগের প্রকাশ-ব্যাকুলতাই এর প্রধান লক্ষণ। সনেটগুলি সহ "লতিকার" ভাববস্তুও বহুলাংশে "আঁখিজল"-এর অনুরূপ, তবে প্রেম ও বিরহ যেখানে "আঁখিজল"-এ কিশোরসুলভ, সেখানে সনেটগুচ্ছ ও "লতিকায়" অনেকটা প্রাপ্ত-বয়স্কের অনুরূপ, এবং রক্তে-মাংসে ঈষদুষ্ণ। অধিকন্তু "লতিকায়" তিনি মহাজগৎ ও মহাজীবনের প্রেক্ষিতে জীবন-চিন্তায় ও ঈষৎ দার্শনিকতায় উপনীত ('অপূর্ব স্বপ্ন', 'মায়া-বালিকা') ভাববস্তু ও তার রূপনির্মাণে তিনি "লতিকা" ও সনেটগুচ্ছে পরিণতির সুস্পষ্ট আভাস রেখেছেন।

কাজী সাহেব সম্পর্কিত আমার পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি বলেছি যে তিনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে মুক্তাক্ষরকে দু'মাত্রা হিসাবে গণনা করছেন, এবং এ ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যের পেছনে দৃষ্টিপাত করেননি। তাঁর সমগ্র কবিতাবলী অবলোকনের পর এখন বলা চলে, মাত্রাবৃত্তের মতো প্রবহমান পয়ারেও তিনি সমান— এমনকি অধিকতর—কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ ছন্দে তাঁর পরিচ্ছন্ন শব্দচয়ন স্বচ্ছন্দ রূপ-নির্মাণ-কুশলতা প্রায় পরিণত কবির অনুরূপ ('তরুলতা', 'মায়া

বালিকা')। বিশেষত 'তরুলতা' শীর্ষক কাহিনী-কবিতায় এই কুশলতা এবং কাহিনীর অবয়বে খচিত কাব্যময়তা লক্ষণীয়।

তরু আর লতা
যেন দুটি পরস্পরে পূর্ণ নির্ভরতা,—
এ উহাবে জড়াইয়া হৃদযেব বলে
ধরিয়া রহিল শুধু।

*   *   *

প্রভাত সেথায়
এঁকেছে সুন্দর ছবি!—

*   *   *

যে প্রেমের ধাবা বহে ও কোমল প্রাণে,
সে অনন্ত সুধাস্রোত ও হৃদয হতে
নদীরূপে নেমে এসে মোবে ঝাঁপ দিতে
ডাকিতে কলস্বরে।

এই পংক্তিগুলি প্রকৃত কবির রচনা। কাজী সাহেব তাঁর কবিতার বহু স্থানে মিল-বিন্যাসে ব্যঞ্জন-ধ্বনিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং স্বর-ধ্বনির সঙ্গতিকে উপেক্ষা করেছেন, আধুনিক কাব্যরীতি অনুযায়ী এটা ত্রুটি বলেই গণ্য হবে, তথাপি পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-সাধনায় তাঁর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। আবদুল কাদির সাহেব বলেছেন, "বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনার গৌরব মুসলমানদের মধ্যে ইমদাদুল হকের প্রাপ্য"; এ ছাড়াও তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে যে তাঁর সনেট ও "লতিকার" কবিতাগুলি প্রকাশের সময় পর্যন্ত যে-সব মুসলমান কবি কবিতা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাব্যের স্বরূপ অনুধাবনে, ভাববস্তুতে অবয়ব নির্মাণে সম্ভবতঃ তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা আধুনিক। অবশ্য সেই সময়ের সমগ্র বাংলা-কাব্যে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সর্বাপেক্ষা আধুনিক।

আমরা কাজী সাহেবের যে কবিতা পাচ্ছি তা তাঁর প্রায় চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে লিখিত, এবং পরিমাণ ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে তা উল্লেখযোগ্য। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন তা ঐ স্বল্প সময়ের কবিতায় সুস্পষ্ট, তথাপি তাঁর কবিতার উৎস অকস্মাৎ নিরুদ্ধ হয়ে গেল কেন

তা নিরূপণ করা দু:সাধ্য। এমন হতে পারে যে কাব্য-সাধনায় তিনি প্রার্থিত উৎসাহ পাননি, আবার এমনও হতে পারে যে প্রবন্ধ রচনা এবং অন্যান্য প্রকার বিতর্কমূলক অকাব্যিক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি নিজের কবি-প্রকৃতিকে নিবিষ্ট করেছিলেন এবং কবিতার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। অনেক কবিই কবিতা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সাহিত্যের প্রতিও আকৃষ্ট হন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকে গদ্যেও তাঁদের কবি-প্রকৃতির স্বাক্ষর রাখেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-সমালোচনা পড়ার সময়েও অনুভব করা যায় এগুলি একজন কবির রচনা, কিন্তু কাজী সাহেবের প্রবন্ধ এবং অন্যান্য প্রকার রচনা থেকে অনুমান করা কঠিন যে তিনি এক সময় কবিতা লিখেছিলেন।

এই রচনাবলীতে কাজী সাহেবের যথেষ্ট সংখ্যক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ-সমালোচনা সংকলিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে দেখতে গেলে, মধ্য-এশিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত মধ্যযুগের মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল সব চাইতে বেশী। ইতিহাসে এবং বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাসে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁর প্রবন্ধগুলিতে তাব অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়েছে। বিস্তৃত জ্ঞান ও মনীষার জন্য তাঁর প্রবন্ধগুলি আজও সুপাঠ্য।

তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রতিবাদমূলক, কিন্তু সবচেয়ে প্রতিবাদমূলক তাঁর গ্রন্থ-সমালোচনা। সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন কোনো হিন্দু লেখক ইসলামের ইতিহাস অথবা মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও অপ্রীতিকর মন্তব্য করলে, অথবা গল্পে-উপন্যাসে নাটকে মুসলিম সমাজকে মসীবর্ণে চিত্রিত করলে তিনি মিশনারী উদ্যম নিয়ে তার সমালোচনা করতেন। তাঁর সমালোচনার লক্ষ্যভূত যাঁরা হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে এখন বিস্মৃত, তবে কেউ কেউ খ্যাতনামা—যেমন শিবনাথ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রবীন্দ্রনাথ। এরূপ সমালোচনায় যুক্তি আর তথ্যই ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন, ফলে প্রতিপক্ষের জবাব দেওয়ার বেশী কিছু থাকতো না। সমালোচনার পদ্ধতিটি ছিল সাধারণত: শান্ত, কিন্তু কোনো কোনো সময় শ্লেষ-তীক্ষ্ণ এবং ক্রুদ্ধ। ''আবদুল্লাহ্'' উপন্যাসে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা ও ছুঁৎমার্গ অবলোকনরত যে দ্বেষহীন ও কৌতুক-প্রবণ বয়স্ক শিল্পীকে দেখি, তাঁর থেকে এই উদ্যমী তরুণ সমালোচকের

প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে সাম্প্রদায়িক তিনি তখনও ছিলেন না, এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নয়, সম্প্রীতি। 'গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য' এবং 'হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষায় তা ব্যক্ত করেন। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন, বৃটিশ আমলে হিন্দু ও মুসলমান যখন সমভাবে পরাধীন এবং উভয়েই প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংস্থাপিত, "তখন আমাদের যাহাতে পরস্পরের প্রীতি বর্ধিত হয়, তজ্জন্য অতীত ইতিহাসের ভাল অংশের যথাসাধ্য আলোচনা করা এবং উভয়ের জাতীয় সামাজিক আদর্শ যাহাতে উভয়ের নিকট যথারীতি সম্মান লাভ করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা কি কতব্য নহে? তৎপরিবর্তে মুসলমানের হীনাদর্শ অবলম্বনে কুৎসিৎ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া ... শোণিত উত্তপ্ত করিবার প্রয়াস পাওয়া ও মুসলমানকে লইয়া ব্যঙ্গ ও পরিহাস করিয়া একটি ঘৃণার ভাব হৃদয়ে পোষণ করা কি এক্ষণে হিন্দু ভ্রাতৃগণের কর্তব্য?" এরূপ মন্তব্যে তাঁর সদিচ্ছা ও সুস্থ বুদ্ধিই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁব অন্যান্য প্রবন্ধে যে প্রতি-আক্রমণের আভাস ছিল তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেও তাই দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, রাম-প্রাণ গুপ্ত এবং আবও কয়েকজন লেখক "নবনূর"-এর পৃষ্ঠায় তাঁর অভিযোগ ও সদিচ্ছা উভয়কেই সমর্থন জানাতে পেরেছিলেন।

কাজী ইমদাদুল হক হিন্দু-লিখিত যে-সব প্রবন্ধ নাটক ও অন্যান্য রচনার সমালোচনা করেছেন তার অনেকগুলি এখন প্রায় বিস্মৃত, এবং সেই পরিমাণে তাঁর কোনো কোনো সমালোচনার সাহিত্যমূল্যও হ্রাস-প্রাপ্ত, তথাপি তাঁর অনেক সমালোচনা এখনও পাঠযোগ্য যুক্তিনিষ্ঠা, তথ্যের ঐশ্বর্য, উত্তম গদ্যরীতি এবং কখনো কখনো শ্লেষতীক্ষ্ণ পরিহাস ও কৌতুকের জন্য। এইসবের মধ্যে একজন শ্যেনদৃষ্টি স্বসমাজপ্রেমী ব্যক্তির পরিচয় উদ্ভাসিত, এবং সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের একটি গ্লানিকর দিকও বিশ্লেষিত। যুগের প্রয়োজনে এই বিশ্লেষণ কাজী সাহেবকে করতে হয়েছিল। তাঁর এই ধরনের রচনা একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করেছে, তবে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা এগুলি হয়ে ওঠেনি। তিনি যদি আরেকটু নৈর্ব্যক্তিক হয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলিকে সাধারণীকরণ করতেন, এবং তত্ত্বমূলক বিস্তার ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ

করতেন তাহলে তাঁর কাছে আমরা অনেক সৃষ্টিধর্মী রচনা পেতাম। এদিক দিয়ে মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস, মুসলিম জগতের জ্ঞানচর্চা, এবং সমকালীন সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ অধিকতর মূল্যবান। তথ্যের ঐশ্বর্য, যুক্তিনিষ্ঠা, অন্তর্দৃষ্টি এবং সুঠাম গদ্যরীতি বিশেষভাবে এইসব প্রবন্ধেই লক্ষণীয়। তাঁর গদ্যরীতির একটা বৈশিষ্ট্য তৎসম শব্দপ্রিয়তা। ১৯৩৩ সালে "সওগাত"-এ প্রকাশিত সৈয়দ এমদাদ আলীর এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, কাজী সাহেব ছাত্রজীবনে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন। এটাই তাঁর তৎসম শব্দ ব্যবহারে দক্ষতার হেতু। তবে এরূপ শব্দের ব্যবহার তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে ক্রমেই কমে এসেছিল।

এই রচনাবলীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর পরিশিষ্টে সংযোজিত "আবদুল্লাহ্" উপন্যাসের দুটি অপ্রকাশিত পরিচ্ছেদ। কাজী সাহেব উপন্যাসের ৩০শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে পরলোক গমন করেন, অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি লিখে আনোয়ারুল কাদির উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন এই আমরা এতদিন জেনে এসেছি। প্রকৃতপক্ষে কাজী ইমদাদুল হক ৩১শ এবং ৩২শ পরিচ্ছেদও লিখে গিয়েছিলেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনবধানতা বশতঃ তা উপন্যাসটিতে সংযোজিত হয়নি। এতকাল পরে তাঁর পরিত্যক্ত কাগজপত্রের মধ্যে আবিষ্কৃত এবং তাঁর রচনাবলীর পরিশিষ্টে মুদ্রিত এই দুটি পরিচ্ছেদ এবং আনোয়ারুল কাদির কর্তৃক লিখিত দুটি পরিচ্ছেদ তুলনা করলে অনুমান করা যায় কাজী সাহেব বেঁচে থাকলে "আবদুল্লাহ্" কিরূপ উৎকৃষ্টতর উপন্যাস হতে পারতো, এবং তাঁর অকাল মৃত্যুতে উপন্যাসটি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আবদুল কাদির সাহেব রচনাবলীর ভূমিকায় এবং লেখক-পরিচিতিতে যেসব তথ্য দিয়েছেন এবং কয়েকটি ছাড়া আর-সমস্ত রচনার শেষে এগুলির প্রথম প্রকাশের যে তারিখ দেওয়া হয়েছে তা থেকে একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য উদঘাটিত হয়। এইসব তথ্য ও তারিখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কাজী সাহেবের অধিকাংশ রচনাই ১৩০৬ থেকে ১৩১৩ সাল এবং ১৩২৫ থেকে ১৩২৮ সালের মধ্যে লিখিত ও প্রকাশিত। এর মধ্যে আছে তাঁর সমস্ত কবিতা, অধিকাংশ প্রবন্ধ এবং "আবদুল্লাহ্"। ১৩১৪ থেকে ১৩২৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত কিছু

খুচরা প্রবন্ধ, "নবিকাহিনী" ও শিশুপাঠ্য কিছু রচনা ছাড়া সাহিত্য-পদবাচ্য রচনার আর বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। এর ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ এই যে এ সময়ে তিনি প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তক রচনাতেই আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন এবং ১৩২৪ সালের দিকে তিনি গুরুতরভাবে পীড়িত ছিলেন। কিন্তু ১৩১০ থেকে ১৩১৩ সালের "নবনূর"-এর পৃষ্ঠায় তাঁর যে সৃষ্টিশীলতা, উদ্যম ও ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করা যায় তা ১৩১৩ সালের পর, অর্থাৎ ২৪ বছর বয়সের পর থেকে ১৩২৪ সালে গুরুতরভাবে পীড়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ৩৫ বছর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত, পাঠ্যপুস্তক রচনার দ্বারা প্রায় প্রদমিত হয়ে ছিল একথা ভাবা একটু কঠিন, কেননা সাধারণ নিয়মে লেখকদের জীবনে এটাই সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়। গবেষকরা হয়তো কখনো এই ব্যাপারটির যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা দেবেন।

১৯৬৮

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের রচনাবলী প্রধানতঃ উপদেশধর্মী, এবং উপদেশ কখনো তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেননি; বরং পরিষ্কার ভাষায় অজস্র উপদেশ দিয়েছেন; কিন্তু উপদেশধর্মিতাই তাঁর সম্বন্ধে একমাত্র কথা নয়। তাঁর সব উপদেশের অন্তরালে অনুভবযোগ্য একটা তীব্র প্রগাঢ় জীবনানুভূতি: সে জীবনানুভূতি যেন এক ধ্যানস্থ মনের; সুন্দর, উন্নত মানবীয় জীবনের জন্য সে-মন ধ্যানস্থ।

অজস্র উপদেশধর্মিতার অন্তরালে যে ব্যক্তিটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তিনি জ্ঞানবাদী, সৌন্দর্য-সচেতন এবং মানবতাধর্মী। তারও পরে বলা চলে তিনি ধর্মবাদী, কিন্তু এক বিশেষ অর্থে, অথবা তাঁর নিজস্ব অর্থে; এবং সর্বোপরি তিনি ব্যক্তিবাদী। তাঁর চিন্তার রাজ্যে এসব বিশেষণের অর্থ কিন্তু পরস্পরের সম্পূরক; তাঁর কাছে জ্ঞান, সৌন্দর্য, মনুষ্যত্ব, ধর্ম, কোনোটাই এককভাবে সম্পূর্ণ নয়।

লুৎফর রহমানের কাম্য ছিল পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন: তাঁর পাশের মানুষদের সব রকম স্খলন, দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতার প্রতি ছিল তাঁর খর দৃষ্টি, এবং সব রকম মানবীয় সদ্‌গুণ-চিন্তায় তিনি আবিষ্ট ছিলেন। মানব-জীবনের এমন দিক কমই আছে যা নিয়ে তিনি চিন্তা করেননি: বহু-বিচিত্র মানবীয় সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবন, দৈনন্দিন ব্যবহার, ব্যবসা, অর্থোপার্জন, জ্ঞানচর্চা, আর্তসেবা, প্রায় সব বিষয়েই তাঁর বক্তব্য ছিল। তাঁর সব চিন্তার সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল পূর্ণ অখণ্ড মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। এবং এ ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিবাদী। তাঁর লক্ষ্য সর্বদাই ব্যক্তি, কিন্তু সে ব্যক্তি কখনো এককভাবে সম্পূর্ণ নয়, সমাজের আর-সব মানুষের সঙ্গে মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন করেই তার পূর্ণতা। তিনি তার মূল্য নির্ণয় করেন এই মানবীয় সম্পর্কের কষ্টি-পাথরে।

বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের পটভূমিতে তাঁর সদ্‌গুণ-চিন্তার কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষ করে ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা প্রসঙ্গে তাঁর মতামতগুলিকে কোনোক্রমেই মামুলি বলা চলে না। "উচচ জীবন" গ্রন্থের 'জ্ঞানের ব্যবহার' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর একটি বক্তব্য হচ্ছে, মানবতাবোধ-বিবর্জিত ধর্মনিষ্ঠা যেমন অর্থহীন, তেমনি নিরর্থক জ্ঞানহীন ধর্মনিষ্ঠা। "সবাই মসজিদ তুলতে ব্যস্ত। তারা বোঝে না জগতে যদি বিদ্যালোচনা না থাকে তাহলে আপনা-আপনি মসজিদগুলি ভেঙে পড়বে। পতিত জাতি কখনও তার ধর্মমন্দির খাড়া করে রাখতে পারবে না।...ধর্মমন্দিরের কথা ভাববার আগে আমাদের জ্ঞানপ্রচারের কথা ভাবতে হবে।" এই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উক্তি লুৎফর রহমান করেছিলেন বাংলা ১৩২৮ সালে, "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায়" তখন (১৯২১-২২) তাঁর "উচচ জীবন" গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু আজও তাঁর এ উক্তি অবান্তর হয়ে যায়নি।

"মহৎ জীবন" গ্রন্থেও লুৎফর রহমান জ্ঞানচর্চাকে অত্যন্ত উচচ স্থান দিয়েছেন। "কাজের চাপে বই ধরবার অবসর হয় না, এ মানুষের কথা নয়। জ্ঞানকে বাদ দিয়ে উপাসনাকে যে বেশী আঁকড়ে ধরে, সে অপদার্থ। তার ধর্ম-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই।" লুৎফর রহমান নিজে সুপাঠক ও জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন, তার পরিচয় তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এবং সে পরিচয় শুধু অসংখ্য পুস্তক ও গ্রন্থকারের উল্লেখেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর আলোকিত মানসের প্রতিফলনেও। এরূপ ব্যক্তির কাছে ধর্মীয় গোঁড়ামি অবান্তর। ধর্মীয় গোঁড়ামির আতিশয্য এবং মূল্যবোধহীন ব্যক্তি-জীবনের বিকৃত রূপ হয়তো তাঁকে কিছু পরিমাণে সন্দেহবাদী করে তুলেছিল। একই গ্রন্থে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন: "মানুষকে কোন বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করবার জন্যে আহ্বান করে বিশেষ কোন লাভ আছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারি না। মানুষকে সুন্দর মহৎ ও প্রেমিক হতে বলাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম-প্রচারকের কাজ।"

লুৎফর রহমানের সাহিত্য-সাধনার মূল কথাটি এই দু'টি বাক্যে বিধৃত। তাঁর সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষকে সুন্দর মহৎ ও প্রেমিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু এখানে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণারও একটুখানি আভাস পাওয়া যায়। এরূপ আভাস তিনি অন্যত্রও দিয়েছেন। "উন্নত জীবন" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

"আত্মার শুভ্রতা রক্ষা করা—চিত্তকে মিথ্যার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে রাখাই ধর্ম—তুমিই যথার্থ ধার্মিক।" একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেছেন: "আধ্যাত্মিকতায় এশিয়া ইউরোপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইউরোপ এশিয়ার কাছে আধ্যাত্মিকতা শিখুক,—এ কথার অর্থ আমি এখনও বুঝি না। জ্ঞান, চরিত্র, মনুষ্যত্ব ও কর্ম ছাড়া যদি আধ্যাত্মিকতা স্বতন্ত্র জিনিস হয়, তবে সে আধ্যাত্মিকতায় কোন কাজ নাই।" এ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত শব্দগুলির পেছনে যে ধারণা আছে, তা নানাভাবে স্পষ্ট করে, এবং কিছুটা বিস্তারিতভাবে লুৎফর রহমান তাঁর রচনাবলীর নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্ত হলেও তাঁর কাছে এসব গুণ ও কর্ম পরস্পরের সম্পূরক এদের একটির পূর্ণতা ও সার্থকতা অন্যগুলির উপর নির্ভরশীল।

এইসবই উচ্চ স্তরের ধারণা; কিন্তু নিতান্ত বৈষয়িক বিষয়কেও তিনি কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে মহৎ ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন। "উন্নত জীবন" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে অর্থোপার্জন এবং মিত-ব্যয়িতার বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে মামুলি কথা বলতে গিয়েও তিনি অবলীলাক্রমেই বলেছেন: "তুমি সাধু ও জ্ঞানী—তুমি দরিদ্র হয়ে থাকবে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করো না। তোমাকে ধনী হতে হবে, কেননা, তুমি জান অর্থ কি ভাবে ব্যয় করতে হয়।...সৎ উদ্দেশ্যে পয়সা উপায় করা উপাসনারই তুল্য। সত্য কথা বলতে কি, ইহা শ্রেষ্ঠ উপাসনা।" যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন লুৎফর রহমানের কাম্য ছিল, তা জ্ঞানে ও কর্মে, ভোগে ও ত্যাগে সুসম্পূর্ণ। মাটির মানুষের কোনো কর্তব্যে এবং কোনো কামনাকেই তিনি অবাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেননি।

লুৎফর রহমানের আরেকটি লক্ষ্য ছিল আত্মশক্তির উদ্বোধন। কোনো মানুষকেই তিনি হীন বিবেচনা করতেন না, তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অসীম সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। "উন্নত জীবন" গ্রন্থের এক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন: "তুমি হীন নও। তোমার ভিতরে যে শক্তি আছে, সেই শক্তির চর্চা কর, তুমি মহামানুষ হতে পারবে।" এ ধরনের উক্তির পেছনে, মনে হয়, প্রধান কথাটি হচ্ছে উপদেশপ্রবণতা, এবং বলা যেতে পারে এইটে লুৎফর রহমানের ত্রুটি। কিন্তু তাঁর এ ধরনের প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে ধারণা হয়,

ব্যক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে তিনি একটা দার্শনিক দৃষ্টিকোণে উপনীত হতে পেরেছিলেন, যদিও একই বিষয়ে ইকবালের অনুরূপ গভীরতা ও প্রজ্ঞা তাঁর অনায়ত্ত ছিল। "তুমি মানুষ, তুমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ —তোমার পতন নাই, তোমার বিনাশ নাই, তোমার ধ্বংস নাই।"— এ ধরনের আবেগময় উক্তি উপদেশ-প্রবণতাকে ছাপিয়ে একটা দৃঢ় বিশ্বাসের রূপ এবং একটা উজ্জ্বল দীপ্তি লাভ করে।

ব্যক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে এই দৃঢ় আশাবাদ লুৎফর রহমানের বহু রচনায় ছড়িয়ে আছে। "জাতির উত্থান" নামক প্রবন্ধে জাতির সম্বন্ধে বলতে গিয়েও তিনি ব্যক্তির উপরেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। 'কোন জাতিকে যদি বাহির হতে বলি—বড় হও, তাতে ভাল কাজ হবে না। মানুষকে এক-একটা করেই ভাবতে হবে।' ব্যক্তিকেই তিনি জাতির প্রতিনিধি মনে করতেন। তাঁর সকল মঙ্গলচিন্তার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির মধ্যে জাতি, জাতির মধ্যে ব্যক্তি নয়।

লুৎফর রহমান সুপাঠক হলেও, সাহিত্যকে ঠিক সাহিত্য হিসাবে নিতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। কোনো বিষয়ের প্রতি যতই পক্ষপাত থাকুক, একই সঙ্গে উত্তম সাহিত্যিকের মধ্যে সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে এমন কিছু পরিমাণে বিষয়-নিরাসক্তি থাকে, এবং থাকে চিন্তার, অনুভবের ও আনন্দের ব্যাপ্তি যা তাঁর রচনাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে। এবং সেই সঙ্গে থাকে প্রকরণ-কৌশল। লুৎফর রহমান এ সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন না। অথবা ব্যক্তির মঙ্গল চিন্তায় অত্যধিক আবিষ্ট থাকায় সে-সাধনার প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ আছে তাঁর "উন্নত জীবন" গ্রন্থে, কিন্তু তিনি তার নাম দিয়েছেন "জাতির উত্থান"। এখানে তাঁর কাছে সাহিত্যের মূল্য তার কোনো নিজস্ব আনন্দের জন্য নয়, সাহিত্য জাতিকে জাগ্রত করে, এবং জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে বলে। এবং সাহিত্য হচ্ছে সভ্যতার নিদর্শন।

> যে সমাজে সাহিত্যের কোন আদর নাই, তারা সাধারণতঃ বর্বর সমাজ......
>
> কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করবার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তাহলে তাদের সব বইগুলি ধ্বংস কর, এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না।

এই ভালো কথাগুলি লুৎফর রহমান বলেছেন প্রবন্ধটিতে, ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এবং তাঁর রচনাবলীতে সাহিত্য-প্রসঙ্গের অবতারণা বা উল্লেখ স্বল্প, বিশেষ করে নান্দনিক উপলব্ধি থেকে।

তাঁর রচনারীতি সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, মুসলিম লেখকদের মধ্যে কথ্য-রীতিতে সাবলীল গদ্য রচনায় যাঁরা সর্বপ্রথম দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম, এবং উপদেশধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনাবলীর মৌলিক ভঙ্গীটা যুক্তিবাদীর। কোনো রকম অন্ধ বিশ্বাসের গোঁড়ামি তাঁর চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করে রাখেনি। তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র তাই নতুন মূল্যবোধের প্রয়াস লক্ষণীয়। এবং অধ:পতিত সমাজের একটা বড় লক্ষণ যে নিয়তিবাদ, তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। বস্তুত: তাঁর রচনাবলী সমগ্রভাবে নিয়তিবাদের প্রতিবাদ, যদিও সরাসরিভাবে যুক্তি-বাণ-হস্তে তিনি এই মতবাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। তাঁর রীতিটা আদৌ তার্কিকের ছিল না। তাঁর মনটা ছিল মার্জিতরুচি, ভদ্র, সংস্কৃতিবান ও মানবপ্রেমী। তাঁর রচনাবলী যেন মানুষের মঙ্গল-চিন্তায় উৎসর্গিত-প্রাণ এক সাধকের ধ্যানলব্ধ বাণীপুঞ্জ: এভাবে দেখলেই তাঁর সাহিত্য-প্রয়াসের প্রকৃতি ও মূল্য উপলব্ধ হয়।

১৯৬৫

নজরুল ইসলাম ও ফারসী সাহিত্য

ঊর্ধ্বশ্বাস বিচিত্র জীবনের মাঝখানেও নজরুল ইসলামের সংবেদনশীল মন সাহিত্যের সকল ক্ষেত্র থেকেই রস আহরণ করত । তাঁর মন ছিল আশ্চর্য রকমে গ্রহণক্ষম। তাঁর গদ্য রচনাবলী ও কবিতার সর্বত্র বিচিত্র ও অসংখ্য উল্লেখের মধ্যে রয়েছে তার পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যের রস তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন, কিন্তু কয়েকটি বিদেশী সাহিত্যের রসও তিনি আস্বাদন করেছিলেন, তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে তাঁর গদ্য ও কাব্য-রচনাবলীর মধ্যে। সব সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অবশ্য সমান ছিল না। তাঁর কয়েকটি কবিতায় মার্কিন কবি হুইটম্যানের প্রভাব প্রত্যক্ষ, কিন্তু পত্রোপন্যাস "বাঁধন-হারা"র আঙ্গিকের উপর অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ঔপন্যাসিক রিচার্ড-সনের "পামেলা"র প্রভাব সম্ভবত: পরোক্ষ, হয়তো জনশ্রুতি থেকেই তিনি পত্রে উপন্যাস লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। এ অনুমানের কারণ উল্লিখিত প্রভাবের কথা বাদ দিলে, নজরুল ইসলামের সাহিত্য কর্মে ইংরেজী ও মার্কিন সাহিত্যের চেতনা উল্লেখযোগ্য নয়। এই দু'টি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, মোটের উপর, যথেষ্ট ব্যাপক ছিল না। কবিতায় ক্বচিৎ আরবী ছন্দের রূপায়ণ এবং "কাব্যে আমপারা" তাঁর আরবী সাহিত্যচর্চার পরিচয় বহন করছে, তবে এ চর্চাও যে খুব ব্যাপক ছিল তা মনে হয় না। এ ছাড়া অন্য যে একটি বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অত্যন্ত নিবিড় ছিল তা হচেছ ফারসী সাহিত্য। এ সাহিত্যচর্চার সূচনা তাঁর স্কুল-জীবনেই, তারপর তিনি এর উত্তম সুযোগ পেয়েছিলেন সৈনিক জীবনে করাচীতে, এক পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে। অনুবাদ-কাব্য "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ"-এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।' বিচিত্র নয় যে নজরুলের তৃতীয়

প্রকাশিত কবিতা ছিল হাফিজের একটি কবিতার অনুবাদ: 'আশায়' শিরোনাম নিয়ে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি বেরিয়েছিল ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা "প্রবাসী"তে। কবিতাটি হচ্ছে এই:

নাই বা পেল নাগাল, সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেন যুঁই কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে,---তেমনি বিভোর থাক রে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস পশবে তোরও নাসায়।
বরষশেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।

নজরুলের ফারসী সাহিত্য-পাঠের প্রধান সুফল তাঁর অনুবাদ-কাব্য "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" এবং "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম"। তিনি বাংলায় গজল গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন—এই আঙ্গিকের প্রেরণাও এসেছে ফারসী সাহিত্য থেকে। অবশ্য উর্দু গজল থেকেও এই প্রেরণা এসে থাকতে পারে। তাঁর গজল গান বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট অবদান বলে স্বীকৃত, কিন্তু ফারসী কাব্যের অনুবাদ পাঠক-চিত্তকে খুব আকৃষ্ট করতে পেরেছে এমন কথা বলা যায় না। নজরুলের প্রায় কোনো উল্লেখযোগ্য কবিকর্মই দীর্ঘদিন গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত থাকেনি, কিন্তু তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম। এর একটা কারণ ছিল হয়তো এই যে, কান্তি ঘোষ এবং নরেন্দ্র দেবের অনুবাদের পর (আরও একজন খৈয়ামের অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু তা জনপ্রিয় হয়নি) নজরুলের অনুবাদ কোনো উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারেনি।

আধুনিক যুগের বাংলা-অনুবাদকগণ হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়েছেন। মনে হতে পারে যে, অন্যান্যের দৃষ্টান্তে নজরুলও আকৃষ্ট হয়েছেন ইরানের এই দুই প্রখ্যাত কবির প্রতি। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী ও বোহেমিয়ান প্রকৃতির কথা বিবেচনা করলে মনে হয়, আর কেউ অনুবাদ না করলেও তিনি সম্ভবত: এই দু'জন কবির কাব্য অনুবাদ করতেন। তবু এই দুজন কবি, বিশেষ করে হাফিজ তাঁর কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। নজরুলের কবি-জীবনের প্রথম পর্যায়ে অনূদিত 'আশায়' একটা প্রাথমিক প্রয়াস

মাত্র, এবং হাফিজের ভাবানুসরণে রচিত 'বোধন' হয়ে উঠেছে একটা বিশেষ সময়ের লক্ষণাক্রান্ত ভারতীয় কবিতা :

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত
ভয় নাই ভাই। রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত।
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, অমার আঁধারে পরিত্যক্ত
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত
দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

নজরুল ইসলাম যখন এ কবিতা রচনা করেছিলেন তখন তিনি তাঁর দীপ্তির মধ্যাহ্নে, তবু অন্য কথা বাদ দিলেও প্রথম চরণের 'সে' এবং শেষ চরণের 'ধীরে' নিছক মাত্রা পূরণের জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে।

"রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" অবশ্য এদের চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই অনুবাদ-কাব্যেও নজরুলের কবিকর্ম অংশত: আড়ষ্ট এবং অসাবধানী। তবে এই আড়ষ্টতার মধ্য থেকেও কবিতার দ্যুতি কোনো কোনো রুবাই-এ প্রকাশমান, যেমন :

তোমার আকুল অলক---হানে গভীর ছায়া রবির করে।
শুক্লা চতুর্দশীর শশী তোমাব মুকুট, আঁধার হবে।
ও-কস্তুরী-কালো কেশেব নিশান ওড়ায় সন্ধ্যারানী
হেবে' ও-মুখ---উদয় ঊষা---পাণ্ডুর চাঁদ ডুবে মরে।।

এই পংক্তিগুলির আড়ষ্টতা রস-গ্রহণের অন্তরায় হলেও এদের চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য অনুপভোগ্য নয়। এ রকম আড়ষ্টতা নজরুলের জন্যে স্বাভাবিক নয়, কিন্তু এজন্যে দায়ী সম্ভবত: তাঁর একটি গুরুতর পারিবারিক দুর্যোগ : মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয়পুত্র বুলবুলের রোগশয্যার পাশে বসে নজরুল ইসলাম রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের অনুবাদ করেছিলেন : কোনো সফল অনুবাদ বা কবিকর্মের উপযোগী মুহূর্ত সেটা ছিল না, এবং নিছক হাফিজ-প্রীতির জন্যেই নজরুল এই অনুবাদ করেননি।

"রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" এর চেয়ে উচচ পর্যায়ের কবিকর্ম। ওমর খৈয়ামের যাঁরা সবচেয়ে কৃতী অনুবাদক—ইংরেজী কাব্যে ফিট-জেরাল্ড এবং বাংলা কাব্যে কান্তিচন্দ্র ঘোষ—তাঁরা খৈয়ামের বিশ্বস্ত অনুবাদক বলে নয়, অনুবাদ-কবিতাকে নতুন কবিতার মানে উন্নীত

করতে পেরেছেন বলেই খ্যাত হয়েছেন বেশী। এই কৃতিত্বের জন্যেই মূলের সাথে তাঁদের বিশ্বস্ততার প্রশ্ন নিয়ে সমালোচকরা বিশেষ মাথা ঘামান না। সে প্রশ্ন নজরুলের ক্ষেত্রেও উঠিয়ে লাভ নেই। (তিনি অবশ্য সমস্ত বাংলা-অনুবাদকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত।) শেষ পর্যন্ত আমরা কবির কাছে নগদ যা পাই হাত পেতে তাই-ই নিয়ে থাকি এবং যা পাই না তা পাই না।

কান্তি ঘোষের মতো উৎকর্ষ নজরুলের অনুবাদে অবিচ্ছিন্নভাবে লক্ষণীয় নয় একথাই মনে হয় তাঁর "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" পড়ে। কিন্তু অনেকগুলি রুবাই-এ তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, যেমন স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স সংস্করণের ২, ২১,৩৩, এবং ৭০ সংখ্যক রুবাই-এঃ

আঁধার অন্তরীক্ষে বুনে যখন রূপার পাড়-প্রভাত,
পাখীর বিলাপ-ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ ?
তারা যেন দেখতে বলে উজল প্রাতের আরশিতে--
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত। (২)

* * *

কবর এতই শিরাজী পান পাত্র এবং পরান-ভোর
তীব্র-মিঠে খোশবো তাহার উঠবে আমার ছাপিয়ে গোর।
থমকে যাবে চলতে পথিক আমার গোরের পাশ দিয়ে
ঝিমিয়ে শেষে পড়বে নেশায় মাতাল-করা গন্ধে ওর। (২১)

* * *

কাল কি হবে কেউ জানে না দেখছ ত হায় বন্ধু মোর।
নগদ মধু লুঠ করে নাও, মোছ মোছ অশ্রুলোর।
চাঁদনি-তরল শরাব পিও, হায়, সুন্দর এই সে চাঁদ
দীপ জ্বালিয়ে খুঁজবে বৃথাই কাল এ শূন্য ধরার ক্রোড়। (৩৩)

* * *

নৃত্য-পাগল ঝর্ণাতীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর
উন্মুখ কার চুমো যেন দেব-কুমারের ঠোঁটের পর---
হেলায় পায়ে দলো না কেউ---এই যে সবুজ তৃণের
হয়ত কোনো গুল-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর। (৭০)

এমনি অনেক রুবাইয়ের জন্যে বাংলা কাব্যের পাঠকরা নজরুলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। তাঁর স্বচ্ছন্দ কবিত্ব এসব রুবাইকে সুপাঠ্য করেছে। তবে একথাও না বলে উপায় নেই যে এই স্বাচ্ছন্দ্য সর্বত্র সমান নয়। তাঁর শক্তিতে, তাঁর কাব্য-প্রতিভার দ্যুতিতে, তাঁর স্বচ্ছন্দ সাবলীল ছন্দোগতিতে যেমন আমরা প্রীত হই তেমনি আমাদের কাব্যপাঠের আনন্দ আহত হয় একটা অত্যন্ত প্রাথমিক ব্যাপারে: সেটি হচ্ছে ছন্দের স্খলন। ছন্দ-বিচ্যুতির মাত্র কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল, তবে এমন উদাহরণ "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" থেকে আরও দেওয়া যায়:

> হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
> মসজিদ মন্দির গীর্জা, যথাই করুক অর্ঘ্য দান---
> প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম,
> স্বর্গের লোভ ও নরক-ভীতির উর্ধ্বে তারা মুক্ত প্রাণ। (৫৯)

এখানে নজরুল ইসলাম যে দ্বিতীয় পংক্তিতে "মসজিদ মন্দির ও গীর্জা" এবং চতুর্থ পংক্তিতে "স্বর্গ-লোভ ও নরক-ভীতির" করতে পারতেন না এটা মনে করা তাঁর প্রতি গুরুতর অবিচারই করা হবে। তা করা হলে রুবাইটি দাঁড়াতো এই:

> হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
> মসজিদ মন্দির ও গীর্জা, যথাই করুক অর্ঘ্য দান—
> প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম,
> স্বর্গ-লোভ ও নরক-ভীতির উর্ধ্বে তারা মুক্ত প্রাণ।

আরো কয়েকটি স্খলনের উদাহরণ:

> বিষাদের ওই সওদা নিয়ে বেড়িয়ো না ভাই <u>শিরোপরি</u>,
> আঙুর-কন্যা সুরার সাথে প্রেম করে যাও প্রাণ ভরি
> নিষিদ্ধা ঐ কন্যা, তবু হোক সে যতই <u>অ-সতী</u>,
> তাহার সতী মায়ের চেয়ে ঢের বেশী সে সুন্দরী। (৫২)

* * *

> খৈয়াম! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে <u>অযথা</u>? (১১০)

অবশ্য এসব ছন্দ-স্খলন যে নজরুলেরই, কোনো এক পর্যায়ে

মুদ্রণ-প্রমাদের জন্যে নয়, তা বলা কঠিন।*

নজরুলের একটি কৃতিত্বের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কান্তি ঘোষের অনুবাদ অত্যন্ত সুখপাঠ্য কিন্তু ফারসী রুবাইয়ের যে একটি বিশেষ গঠনরীতি—প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পংক্তির অন্ত-মিল —তা তাতে পাওয়া যায় না, আর নরেন্দ্র দেবের অনুবাদকে বলা যেতে পারে প্যারাফ্রেজ। ওমরের একেকটি রুবাইয়ের ভাব নিয়ে তিনি অনেক সময় আস্ত একেকটি স্বতন্ত্র কবিতা রচনা করেছেন এবং সে-সব কবিতা কখনো কখনো ভালো হয়েছেও, তবে একে অনুবাদ বলা চলে না; এবং রুবাইয়ের অন্ত-মিলের বিশেষ রূপটি—যা নিয়ে তার বৈশিষ্ট্য —তাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করা হয়েছে। রুবাইয়ের এই রূপটি নজরুলের অনুবাদেই পাওয়া যায়। দু'একটি বিদেশী স্তবকরীতি বাংলা কাব্যে স্থান পেয়েছে, যেমন দান্তের তার্জা রাইমা জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। জনপ্রিয় না হলেও এগুলি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়েছে, তেমনি অনুবাদের মধ্য দিয়ে হলেও রুবাই সে ঐতিহ্যে কিছু বৈচিত্র্য সংযোজন করেছে। নজরুলের এই অবদানের একটা মূল্য আছে।

১৯৬১

* বস্তুত: খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে মুদ্রণ-প্রমাদের সবচেয়ে বড় শিকার বোধ হয় নজরুল ইসলাম: এই তাঁর কাব্যানুরাগীদের ধারণা। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স-প্রকাশিত এই রুবাইয়াতেই দেখতে পাই ১৩০, ১৬৬ এবং ১৮৭ সংখ্যক রুবাইয়ে যা আসলে চতুর্থ পংক্তি তাই ছাপা হয়েছে প্রথম পংক্তি হিসাবে। ৪৬ সংখ্যক রুবাইয়ে তৃতীয় পংক্তি ছাপা হয়েছে প্রথম পংক্তি হিসাবে। এইসব ভুলের সংশোধন একদিন হবে, কিন্তু এখানে-ওখানে সামান্য একটু লেখনীর তুলি স্পর্শ করলে নজরুলের অনেক অনুবাদ-কবিতা এবং মৌলিক কবিতার শিল্পোৎকর্ষ অনেক বৃদ্ধি পেত, তা করার মতো চেতনা যে তিনি আর ফিরে পাবেন না এ দুঃখ তাঁর পাঠকের চিরদিন থেকে যাবে।

"পুতুলের সংসার"

হেনরিক ইবসেনের 'এ ডল্‌স্‌ হাউস'—"পুতুলের সংসার"—১৮৭৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ামাত্র নরওয়ের নাট্যজগতে, এবং রক্ষণশীল নীতিবাদী সমাজে, চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল: সে-চাঞ্চল্যের ঢেউ অনতি-বিলম্বে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ইউরোপে, এবং তারপর ইউরোপের ও বাইরে। "পুতুলের সংসার" ইবসেনকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে: অবশ্য সে-খ্যাতি অবিমিশ্র ছিল না। নীতিবাদী সমাজ এ নাটকে পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধনে ভাঙ্গন-সৃষ্টির প্ররোচনা রয়েছে কল্পনা ক'রে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, এবং সমাজপতিদের সরব সমালোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে ইবসেন এক সময় নাটকটির মিলনান্তক সংশোধনেও সম্মত হয়েছিলেন। সে-কথা এখন ইতিহাস মাত্র। নোরার স্বামী-ও-সংসার-ত্যাগ এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় কোনো নৈতিক বা ধর্মীয় প্রশ্নই নয়, এমনকি শিক্ষিত ও অগ্রসর প্রাচ্য-সমাজেও। প্রশ্নটা এখন শুধু এই: স্বামী এবং স্ত্রী মানুষ হিসাবে সমান, অথবা সমান নয়? "পুতুলের সংসার"-এর পাঠক মানবীয় সংস্কৃতির কোন্‌ স্তরে অবস্থিত তার ওপর এ প্রশ্নে তাঁর মানস-প্রতিক্রিয়া নির্ভরশীল।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের ইতিহাসে "পুতুলের সংসার" প্রাচীন অধ্যায়ের অবসান এবং আধুনিক অধ্যায়ের প্রারম্ভ সূচিত করে, এই কোনো কোনো সমালোচকের অভিমত। অন্যান্য নাটকে তিনি অন্যান্য সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পক্ষান্তরে ইবসেনের আধুনিক সমালোচকদের মতে, তিনি বিপ্লব এনেছিলেন সমাজচিন্তায় নয়, নাট্যকলায়। জটিল ও কৃত্রিম ঘটনা-বিন্যাসের সুনিপুণ যান্ত্রিকতায় দর্শক-মন বিমুগ্ধ করার যে প্রসিদ্ধ রীতি তাঁর অগ্রজ ও সমকালীন

নাট্যকারদের ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা তিনি বর্জন করেন; তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন মানবজীবনের সঙ্কটতম এবং সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যময় মুহূর্তের প্রতি, এবং সেই মুহূর্তটিকে তার সকল মানবীয় আবেগময় জটিলতাসহ উপস্থিত ক'রে, মানবজীবনের গভীরতম এবং প্রগাঢ়তম উপলব্ধি উদ্‌বোধিত ক'রে তিনি দর্শক-মনের সহানুভূতি আকর্ষণ করার, এবং কখনো বা তার মনে প্রশ্ন জাগ্রত করার প্রয়াস পান। সমাজচিন্তা তাঁর নাট্যকলার প্রধান লক্ষ্য ছিল না, ছিল উপাদান মাত্র, তাও সব নাটকে নয়। অন্যান্য নাট্যকারের মতো মানবজীবনকে তার বহুবিস্তৃত স্থানকালময় সমগ্র ব্যাপকতায় তিনি উপস্থিত করেননি, মুহূর্তের মুকুরে প্রতিফলিত করেছেন। চরিত্রবহুলতা ও দৃশ্যবহুলতা ক্রমে ক্রমে ছেঁটে ফেলে নাটককে তিনি পাঁচটি, চারটি, তিনটি দৃশ্যে (অঙ্কে) ঘনীভূত করেছেন, এবং এমনকি শেষ পর্যায়ে গ্রীক নাটকখ্যাত "থ্রী ইউনিটিজ" টেকনিকেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কুশীলবের সংখ্যাও কমে এসেছে। তাঁর নাটকের ঘটনা-প্রবাহ বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাত থেকে উদ্ভূত, কৃত্রিম কৌশলে উদ্‌ভাবিত নয়। এই ঘটনা-প্রবাহ প্রধানত: স্বাভাবিক ঘরোয়া সংলাপের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত এবং অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংগ্রথিত হয়ে সাবলীল অনিবার্য গতিতে চরম পরিণতির অভিমুখে প্রধাবিত। তাঁর নাটকের আপাত-অনায়াস গতির পেছনে কিন্তু প্রভূত শিল্পপ্রয়াস প্রচ্ছন্ন। সাফল্যের এই চূড়ায় তিনি উপনীত হয়েছিলেন একান্ন বছর বয়সে, বারোটি নাটক লেখার পর।

ইবসেনের নাটকের আরও যে দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে বাস্তববাদিতা এবং কাব্যময়তা। আধুনিক কালে প্রথম ইবসেনের নাটকেই বাস্তববাদের জয় সুনিশ্চিতভাবে ঘোষিত; এবং কাব্যময়তা তাঁর নাটকের প্রধান আকর্ষণ। কাব্যময়তা অবশ্য "পুতুলের সংসার"-এর উল্লেখযোগ্য গুণ নয়, বরং পরবর্তী (অধিকাংশ) নাটকের, এবং পূর্ববর্তী কোনো কোনো নাটকের; এবং বাস্তববাদিতা ও সমাজচিন্তাও ইবসেনের নাটকে এই নূতন নয়। দশ বছর আগে প্রকাশিত "যুব-সংঘ" নাটকে, এবং দু'বছর আগে প্রকাশিত "সমাজের স্তম্ভ" নাটকে বাস্তব-বাদিতা ও সমাজচিন্তা রূপায়ণে তিনি স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করে-ছিলেন। সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে "পুতুলের সংসার"-এ তিনি নূতন যা করেছেন তা হচ্ছে নারীব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং নূতন দাম্পত্য-সম্পর্ক--

বোধের রূপায়ণ। এ নাটকে বস্তুত: দাম্পত্য-বন্ধন সম্পর্কিত সামন্তবাদী চিন্তার চূড়ান্ত অবসান ঘোষিত। এ চিন্তা ছিল যেহেতু ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অতএব সমাজপতিগণ স্বভাবতই বিচলিত হয়েছিলেন। প্রথম অভিনয়ের পর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় "পুতুলের সংসার"-এর অভিনয়। এমনকি আলোচনাও, কয়েক বছর নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সমাজপতিগণের সংস্কারের সেই অচলায়তন বিচূর্ণিত করে "পুতুলের সংসার" শেষ পর্যন্ত শিল্পমূল্য লাভ করেছে এইটি ইবসেনের স্মরণীয় কৃতিত্ব, এবং এ নাটকের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য।

ইবসেনের অধিকতর স্মরণীয় কৃতিত্ব নাট্যকলার রূপান্তর সাধনে। মানবজীবনকে তার স্থানকালময় ব্যাপকতায় ও বিভিন্নতায় উপস্থাপিত না করে, জীবনের সঙ্কটতম এবং সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যময় মুহূর্তের মুকুরে প্রতিফলিত করার যে বিশেষ নাট্যকলা, তার প্রথম ও যুগান্তকারী সাফল্যের উদাহরণ "পুতুলের সংসার"। অত:পর ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিতে জীবনের তাৎপর্যময় ঘটনাবলী ও সংশ্লিষ্ট আবেগ স্থান ও কালের বিভিন্নতায় বিক্ষিপ্ত নয়, এইসবেরই ঐক্যে সংহত ও ঘনীভূত। এই নাটকে (এবং পরবর্তী অনেক নাটকেও) উত্তেজনাকর সংঘটন, সেই সংঘটনে জটিলতাসৃষ্টি এবং তারপর তার পরিণতি আছে; পরবর্তী নাটক "প্রেতাত্মায়" তিনি সংঘটন-নির্ভরতাও প্রায় বর্জন করেন।

"পুতুলের সংসার"-এ ইবসেন নাটকীয়তার স্বরূপে আরও একটি নূতন চরিত্র-লক্ষণ সংলগ্ন করেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নাট্য-ঐতিহ্যেরই জের টানতেন যদি তৃতীয় অঙ্কে ক্রগস্ট্যাড জাল দলিল ফেরত দেওয়ার পর, সকল ঘূর্ণিঝড়ের অবসানে হেলমার-দম্পতি সুখে-শান্তিতে বাস করতো; কিন্তু "পুতুলের সংসার"-এর প্রকৃত নাটকীয়তার শুরু সেইখানে যেখানে, গভীর রাত্রে ঐ ঘোর ঘূর্ণি দৃশ্যত: অবসিত হওয়ার পর নোরা বললো, "এখনো খুব রাত হয়নি। বসো, টরভ্যাল্ড... তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।" তারপর আলোচনা ও আত্মবিচার, যার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা, আবেগ ও নাটকীয়তা একাত্ম। এরূপ আলোচনাও নাট্যকলায় ইবসেনেরই প্রবর্তনা।

উনিশ শতকের শেষাংশের এবং বিশ শতকের প্রথমাংশের নূতন নাট্যকলার শিল্পগুরুরূপে ইবসেনের যে স্বীকৃতি, তা "পুতুলের সংসার" থেকে আরম্ভ। অবশ্য এটি যে তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি একথা তাঁর সমালোচকেরা বলেন না, যদিও তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রধানত: এই নাটকের—এবং "প্রেতাত্মার"—জন্য ; তবে এটি তাঁর সেই নূতন নাট্যকলার প্রথম সফল নাটক এবং তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিগুলির অন্যতম এ বিষয়ে দ্বিমত নেই।

১৯৬৬

"প্রেতাত্মা"

ইবসনের "পুতুলের সংসার"-এর পর "প্রেতাত্মা"ই বোধ হয় ইউরোপের নীতিবাদী-সমাজে সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠিয়েছিল সবচাইতে বেশী। বার্ণার্ড শ' তাঁর "কুইণ্টেসেন্স অব ইবসেনিজ্‌ম্" গ্রন্থে তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। এই সমালোচনা অহেতুক ছিল না। "পুতুলের সংসারের" যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের নীতি-বোধকে উপহাস করার জন্যেই যেন "প্রেতাত্মা" (গোস্টস্‌) রচনা।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, সেইটেই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের প্রচলিত নীতিবোধ সম্বন্ধে তাঁর কিছু বক্তব্য ছিল, এবং এই নাটকে ক্লাসিক্যাল নাট্যকলার তিনি এক নূতন পরীক্ষাও করেছিলেন। "পুতুলের সংসার"-এর দু'বছর পরে ১৮৮১ সালে প্রকাশিত "প্রেতাত্মা" ইউরোপের তৎকালীন দাম্পত্য-নীতিবোধের রূপায়ণ—এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজ-সমালোচনা এর লক্ষ্য। ইবসেনের আরও কয়েকটি নাটকের মতো এ নাটকেও নারীই এ সমালোচনার মুখপাত্রী। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র মিসেস এ্যালভিং সমাজের নৈতিক মানদণ্ডে আদর্শ নারী। "পুতুলের সংসার"-এর নোরা সংসার-ত্যাগ করেছিল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে মানুষ হিসাবে সমান অধিকার পায়নি বলে, এক প্রকার খেলার প্রিয় পুতুল হিসাবে তাকে ব্যবহার করা হতো বলে, কিন্তু স্বামী চরিত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও মিসেস এ্যালভিং সংসার ত্যাগ করেননি, সংসার ত্যাগ করিতে পারেননি। সমাজের নৈতিক নির্দেশ মেনে নিয়ে তিনি উত্তম পত্নীর মতো সংসারের শোভনতা রক্ষা করেছেন, উত্তম গৃহিণীর মতো দৃঢ় হস্তে স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি সুপরিচালন করেছেন, এবং বিপুল অর্থ ব্যয়ে দাতব্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে মৃত স্বামী-সম্পর্কিত যাবতীয় গুজব স্তব্ধ করার নিপুণ আয়োজন করেছেন। কিন্তু পরিবারের অভিশাপকে তিনি রোধ করতে পারেননি।

এই অভিশাপ "প্রেতাত্মা" নাটকের বিষয়বস্তু। সমাজ যা-কিছু ভালো বলে তাই তিনি করেছেন এবং এ জন্য তাঁকে দু:সহ জীবন যাপন করতে হয়েছে, কিন্তু এত ত্যাগ স্বীকার করে যে সন্তানকে তিনি জন্ম দিয়েছেন সে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার যৌনব্যাধির অভিশাপে অভিশপ্ত। এবং এই অভিশাপের নিষ্ঠুরতম লক্ষণগুলি অতর্কিতে প্রকাশ পেল ঠিক সেই সময়, যখন মিসেস এ্যালভিং তাঁর গ্লানিময় অতীতকে সমাধিস্থ করে এক নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁর বঞ্চনাতুর জীবনে সান্ত্বনার একমাত্র সম্পদ অসওয়াল্ড, কিন্তু অনিবার্য উন্মাদ-রোগের আতঙ্কে মৃত্যুকামী সেই একমাত্র পুত্রের মুখে এই আর্ত অভিযোগ তাঁকে শুনতে হলো, "আমি তোমাকে কোনোদিনই বলিনি যে আমাকে জন্ম দাও। আর এ কী রকম জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ? এ জীবন আমি চাইনে। এ জীবন তোমাকে ফিরিয়ে নিতেই হবে।"

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রবহমাণ অভিশাপের ইঙ্গিত ইবসেন নিয়েছেন গ্রীক নাটক থেকে, কিন্তু গ্রীক নাটক ও তাঁর নাটকের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। গ্রীক নাটকে অভিশাপের পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার কোনো রহস্যময় অলৌকিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; বস্তুত: নিয়তিই সেখানে সার্বভৌম শক্তি। ইবসেনের নাটকে অভিশাপের কারণ-পরম্পরা একান্ত স্পষ্ট ; এবং এ অভিশাপের প্রবহমাণতার মূলে রয়েছে প্রেতাত্মা : মিসেস এ্যালভিং-এর ভাষায় "পুরনো বাতিল চিন্তাধারা আর বিশ্বাস।" মিসেস এ্যালভিং বলেছেন, "মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা সবাই এক একটি প্রেতাত্মা...বাপ-মায়ের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তাই যে শুধু আমাদের মধ্যে থেকে গেছে তা নয়, সব রকমের পুরনো বাতিল চিন্তাধারা আর বিশ্বাসও থেকে গেছে। এগুলো আমাদের মধ্যে এখন আর সক্রিয় অবস্থায় নেই, কিন্তু গুপ্ত হয়ে আছে।—আলোককে আমরা সকলেই ভীষণ ভয় পাই।"

ইউরোপের রক্ষণশীল সমাজ "প্রেতাত্মা" পড়ে এবং তার অভিনয় দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিল কেন তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তারপর দাম্পত্য-নীতিবোধে বিপুল পরিবর্তন এসেছে, পাশ্চাত্যে-প্রাচ্যে সর্বত্র। ঐ নীতিবোধের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবে এমন নারী, এবং এজন্য তার

প্রতি প্রশংসমান হবে এমন সমাজ পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে কল্পনা করা এখন কঠিন। "প্রেতাত্মা"র আবেদন তাই এখন ঠিক আগের মতো থাকা সম্ভব নয়। তবে এই নাটকে যে প্রেতাত্মার কথা বলা হয়েছে তা মানব-জীবনের ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে না হলেও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে এবং অন্য অর্থে, এখনও অবাস্তব নয়। উষ্ণ ও স্পন্দিত জীবনকে বরণের ইচ্ছা এমনকি চেতনা, এখনও সাধারণ নিয়ম নয়; মিথ্যা ও কুৎসিতের সঙ্গে আপোষ এবং প্রেতাত্মায় আত্মার আচ্ছন্নতা এখনও মানব-জীবনের করুণ সত্য। কিন্তু এ নাটকের এখনও যে প্রধান আকর্ষণ—এবং স্থায়ী আকর্ষণ—তা এর গঠন-নৈপুণ্যের জন্য। কতকগুলি ব্যাপারে অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও "প্রেতাত্মা" অত্যন্ত সুগঠিত নাটক: গ্রীক নাটকের 'থ্রী ইউনিটিজ' আঙ্গিকে আধুনিক জীবনের বাস্তব ঘটনার নাট্যরূপায়ণ। নাটকের সমগ্র ঘটনা ঘটেছে মিসেস এ্যালভিং-এর বাড়ীর একটিমাত্র ঘরে, অবিচ্ছিন্নভাবে একদিন দুপুর থেকে পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত। পার্থক্য এই যে, এতে কোরাস নেই, অলৌকিকতা নেই, আছে তিন অঙ্কের মাঝখানে দু'বার বিরতিমাত্র। স্থান ও কালের এই ঘন-সংবদ্ধ পরিসরে "প্রেতাত্মা" প্রধানত স্মৃতি-চয়ন, ইতিহাস-উদ্‌ঘাটন; সে স্মৃতি, সে ইতিহাস জীবনের গভীর রহস্য, গভীর করুণায়, প্রগাঢ় নাটকীয়তায় রসঘন। এ নাটকে যা ঘটেছে তার চেয়ে, যা ঘটেছিল তার স্মরণ অনেক বড়। কিন্তু এই যে স্মৃতি-উদগীরণ, এটাও ঘটনা—এ নাটকের এ্যাকশন, এবং একে এ্যাকশন হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন ইবসেন এই তাঁর কৃতিত্ব। একটি মাত্র স্বল্প সময়ের মুকুরে কয়েকটি মানুষের জীবন এবং তাদের সমাজ প্রগাঢ় নাটকীয়তা এবং কাব্যময়তার সঙ্গে প্রতিফলিত। ক্লাসিক্যাল আঙ্গিকের স্বল্প পরিসর তাদের জীবনের ব্যাপকতাকে নিপিষ্ট করেনি, ঘনীভূত করেছে। "প্রেতাত্মা"র আরেকটি ঐশ্বর্য এর নিপুণ চরিত্র-রূপায়ণ। বিশেষত মিসেস এ্যালভিং ইবসেন-সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্র-সমূহের অন্যতমা মধ্যমণি। "প্রেতাত্মায়" কয়েকটি ব্যাপারে কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। অসওয়াল্ডের সহযোগী শিল্পীরা দারিদ্র্য বশত বিবাহে অনিচ্ছুক, অথচ অবৈধ সঙ্গিনী ও সন্তানদের ব্যয়-নির্বাহে পরাঙ্মুখ নয়; পিতার পাপের ফলস্বরূপ অসওয়াল্ড উন্মাদরোগে ঠিক স্বাভাবিকভাবে নয়, সুপ-রিকল্পিত ভাবে অকস্মাৎ অথর্বে পরিণত, অথচ একই পিতার ঔরসজাত রেজিনা সুস্থ সবল; এইসব এবং আরও কিছু অসামঞ্জস্য এ নাটকের

রসোপভোগের মাঝখানে খচখচ করে, তবে নিখুঁত শিল্পকর্ম অনেক সময়েই মরীচিকা। উদ্দীষ্ট শিল্পলক্ষ্যে শিল্পীর উত্তরণ কতটা সফল সেইটাই চূড়ান্ত বিচারের মাপকাঠি। কিছু অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও "প্রেতাত্মা" যে ইবসেনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসাবে স্বীকৃত এইটেই তাঁর সাফল্য।

এই নাটকে ইবসেনের নাট্যকার-সুলভ নিরপেক্ষতার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। অভিশপ্ত অসওয়াল্ডের কাছে অসহায় উন্মাদজীবন অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকতর কাম্য, মাকে তাই সে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করলো—উন্মাদরোগ প্রকৃতই দেখা দিলে মিসেস এ্যালভিং বিষ-প্রয়োগে তার সকল যন্ত্রণার অবসান করবেন। নাটক যখন শেষ হলো তখন অসওয়াল্ড পূর্ণ উন্মাদ। এই দৃশ্য সইতে না পেরে মিসেস এ্যালভিং বিষের বড়ি হাতে নিলেন, কিন্তু প্রাণপ্রতিম পুত্রকে তিনি সত্যি বিষ খাওয়া-বেন কি না? ইবসেন এ প্রশ্নের উত্তর দেননি, দর্শকের (এবং পাঠকের) কল্পনার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ইবসেনের ইংরেজী-অনুবাদক উইলিয়াম আর্চার একবার তাঁকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইবসেন খানিক ভেবে ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, "আমি জানি না। প্রত্যেককেই নিজের বিবেচনা মতো সমাধান বার করে নিতে হবে। এ রকম একটা নাজুক প্রশ্নের মীমাংসা করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?"

১৯৬৭

"রসমার্সহোম"

এদেশের পাঠকসমাজে ইবসেনের কয়েকটি নাটক বিশেষ পরিচিত: "পুতুলের সংসার". "প্রেতাত্মা" "গণশত্রু" এবং "বুনো হাঁস".; এবং "হেডডা গাবলার" কিছু পরিমাণে। এগুলি ইবসেনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির তালিকা এখানেই শেষ নয়। পশ্চিমী সমালোচক-মহলে "রসমার্সহোম" তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত; গঠন-নৈপুণ্যের জন্য কেউ কেউ একে এমনকি তাঁর শীর্ষস্থানীয় নাটক মনে করেন; কিন্তু "রসমার্সহোম" এদেশের পাঠক-সমাজে তেমন সুপরিচিত বলে মনে হয় না।

"রসমার্সহোম" ইবসেনের মানস-ধারার এমন একটা পর্যায়ে লিখিত যখন সমাজ-চিন্তার এবং রাজনীতি-চিন্তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ হ্রাস পাচ্ছে, এবং মানব-চরিত্র ও মানস-রহস্য সম্বন্ধে তিনি অধিকতর কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। বস্তুত এ-নাটকেই তাঁর রাজনীতি-চিন্তার (এবং সমাজ-চিন্তার) পরিসমাপ্তি এবং মনস্তত্ত্ব-চিন্তার সূচনা। তাঁর পরবর্তী নাটক "সমুদ্রনারী" একান্তভাবে মনস্তত্ত্বমূলক। সে হিসাবে "রসমার্স-হোম" ইবসেনের নাট্যজীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণের রচনা। এর প্রথম অঙ্কে রাজনীতির উল্লেখ আছে; কোনো কোনো সমালোচক দেখিয়েছেন এর পশ্চাদভূমিতে অবস্থিত ইবসেনের সমকালীন নরওয়ের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি; কিন্তু "রসমার্সহোম" উপভোগের জন্য সে-পরিস্থিতি জানা অত্যাবশ্যক নয়। ইবসেন এই বিশেষ পরিস্থিতির নির্বিশেষ চরিত্রকে বেছে নিয়ে একটা সার্বজনীনতার আবরণে সূত্রবদ্ধ করেছেন। ফলে ক্রল ও রসমারের রাজনৈতিক মন-কষাকষিকে যে-কোনো প্রকার রাজনীতির রক্ষণশীল আদর্শ এবং উদারনৈতিক আদর্শের সংঘাত বলে ধরে নিয়ে নাটক উপভোগ করা যায়। মর্টেন্সগোরকে ধরা যায় সুবিধাবাদী রাজনৈতিকদের বিশেষ এক টাইপ বলে।

কিন্তু রাজনীতির প্রাধান্য শুধু প্রথমাংশে। তারপর রাজনীতি ক্রমশঃ অপ্রধান হতে হতে প্রস্থান করেছে; এবং ব্যক্তি মঞ্চে সার্বভৌম হয়ে উঠেছে তার স্বকীয় নাটকীয়তা নিয়ে। ইবসেনের সুদীর্ঘ সমাজ ও রাজনীতি-পরিক্রমার পর "রসমার্সহোম"-এ এই প্রথম ব্যক্তি সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে; সে এখন আর সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে না, নাট্যকারের বক্তব্য প্রচার করছে না, স্ব-রূপে আত্ম-প্রকাশ করছে। ইবসেন নিজে এই নাটক সম্বন্ধে বলেছেন, "কর্মের প্রতি আহ্বান অবশ্যই সমগ্র 'রসমার্সহোম'-এ লক্ষণীয়। কিন্তু এটাও এ-নাটকের বক্তব্য যে, প্রতিটি একনিষ্ঠ ব্যক্তিকে তার প্রত্যয় এবং জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু প্রথম এবং সবচেয়ে বড় কথা অবশ্য এই যে, এটি একটি সৃষ্টিধর্মী নাটক, মানব এবং মানব-নিয়তিই এর বিষয়বস্তু।"

ইবসেনের কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য একথাও বলেছেন যে "প্রেতাত্মা" প্রকাশিত হওয়ার পর ইবসেনের উপর যে হিংস্র আক্রমণ চলেছিল তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি যে তিনটি নাটক লিখেছিলেন "রসমার্সহোম" তাদের অন্যতম (অপর দু'টি নাটক হচ্ছে "গণশত্রু" এবং "বুনো হাঁস") এবং এ-নাটকের নায়ক রসমারের মধ্যে ইবসেন কিয়দংশে নিজেকেই চিত্রিত করেছেন, কেননা "প্রেতাত্মা" প্রকাশিত হওয়ার পর ইবসেনের উপর আক্রমণ এবং প্রগতিশীল মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর রসমারের উপর আক্রমণের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এসব অভিমতের যৌক্তিকতা যতই থাক এ নাটকেই ইবসেন রাজনীতি-চিন্তা ও সমাজ-চিন্তা থেকে অবসর নিয়ে ক্রমে মানব-প্রকৃতি এবং মানস-রহস্য-চিন্তার প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়েছেন, এবং "এটি একটি সৃষ্টিধর্মী নাটক, মানব এবং মানব-নিয়তিই এর বিষয়বস্তু" ইবসেনের এই অভিমতই যথার্থ।

এই নাটকের মৌল লক্ষ্য, সংক্ষেপে বলা চলে, আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্ম-আবিষ্কার। এর নায়ক রসমার এবং নায়িকা রেবেকাকে আত্ম-জিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত হতে হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার চক্রান্তে; নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রকৃতির অন্ধি-সন্ধিতে আলোকপাত ঘটেছে, এবং নাটক যখন শেষ হয়েছে শুধু তখনই তাদের প্রকৃত পরিচয় বিপল ব্যাপ্তি এবং পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু সে ব্যাপ্তির সে পূর্ণতার

শর্ত কঠিনতম শর্ত: যে-লালসাময়ী কূট-কৌশলী রেবেকা রসমার-গৃহে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের জন্য রসমার-পত্নী বিয়াটাকে মৃত্যুর পাতালে ঝাঁপ দিতে প্ররোচিত করেছে, সে-যে এখন মহৎ প্রেমের কথা বলছে তা কি বিশ্বাস্য? সে কি বারংবার মিথ্যা-ভাষণের আশ্রয় নেয়নি? তার গুপ্ত উদ্দাম লালসা যে প্রকৃতই মহৎ প্রেমে স্থিতি লাভ করেছে তা কি সে প্রমাণ করতে পারে, এবং মৃত্যু-বরণের সাহস যে তার আছে তাও কি সে প্রমাণ করতে পারে বিয়াটার মতোই স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পাতালে ঝাঁপ দিয়ে? যদি পারে তবেই শুধু তাকে বিশ্বাস করা রসমারের পক্ষে সম্ভব। প্রমাণ দিতে রেবেকা তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছে। জীবনের যাবতীয় হিসাব-নিকাশের পর পার্থিব কোনো বস্তুই যখন কারো কাছে কারো চাইবার রইল না শুধু তখনই তাদের আত্মার প্রকৃত মিলন হল। অবশ্যই তাদের 'প্রকৃত মিলন' মৃত্যু-সম্মিলন, কিন্তু ঠিক ঐ চূড়ান্ত ঘটনাটি না ঘটা পর্যন্ত, যবনিকাপাতের পূর্বমুহূর্ত অবধি তাদের পরিচয় অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। একমাত্র যবনিকা–পাতের পরেই তাদের পূর্ণ পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দর্শক এবং পাঠক উপলব্ধি করেন যে নাটকের প্রথমে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নাটকের শেষে তারা অন্য মানুষ হয়ে উঠলো, অর্থাৎ একটা ঘটনাই শুধু ঘটলো না, মানুষ হিসাবেও তারা রূপান্তরিত হয়ে গেল; কিন্তু সেই একমাত্র এবং চূড়ান্ত শর্তে। তারা বিশেষত রেবেকা যে সত্যি আত্ম-আবিষ্কার করেছে এই প্রতীতি যখন জন্মে তখন তারা মানব-জীবনের পরপারে। ইবসেন সর্বদাই নিপুণ শিল্পী; তথাপি এই পরিণতির নাটকীয় সত্যের আয়োজনে এতটা নিশ্চিত কুশলী তিনি কম নাটকেই।

এই রূপান্তরের কৌশলটি "রসমার্সহোম"-এর প্রধান আকর্ষণ। এ নাটকে উল্লিখিত চূড়ান্ত ঘটনাটি ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই ঘটেনি: দু'তিনজন লোক এবং একটি নারী পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, অতীতের কতকগুলি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছে, এবং কতকগুলি তথ্য উদঘাটন করেছে মাত্র (এটা বস্তুত ইবসেনের পরিণত বয়সের বহু নাটকেরই সাধারণ লক্ষণ)। তথাপি ইবসেন এ নাটককে রসঘন করে তুলতে পেরেছেন। তিনি একে রসঘন করে তুলেছেন প্রায় সম্পূর্ণত: এর চরিত্রদের মানস-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নাটকীয়তায়। "রসমার্সহোম"-এ যা কিছু ঘটেছে তা এর চরিত্রদের মনে, বাইরে

নয়। এবং এটা ঘটেছে অতীতের উদ্‌ঘাটন এবং বর্তমানের সংঘাত এই উভয়ের যুগ্ম প্রভাবে, কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে বর্তমানের সংঘাত ও অতীত-চারণা এই উভয়ই উভয়ের প্রভাবে উদ্ভূত। অন্যভাবে বলা চলে, "রসমার্সহোম" অতীত এবং বর্তমানের সংঘাতের নাটক, এর অতীত-চারণা এবং বর্তমান-অগ্রগতি পরস্পরের যুগ্ম প্রতিক্রিয়ার আবর্তে ঘূর্ণ্যমান। মৃত অতীত ও রসমার্সহোমের অভিশাপের প্রতীক-স্বরূপ 'শাদা ঘোড়ার' বারংবার উল্লেখ এবং অতীত-চারণা ইবসেনের "প্রেতাত্মা" নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; কিন্তু ঐ নাটকের অতীত-চারণায় যেখানে আমরা সমাজ ও তার নীতিবাদ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, "রসমার্সহোম"-এ সেখানে ব্যক্তিস্বরূপ সম্পর্কে। অধিকন্তু "প্রেতাত্মায়" যেখানে বর্তমান অতীতের ঐতিহ্য-ভারে অভিভূত, রসমার্সহোম-এ সেখানে বর্তমানও সক্রিয় এবং অতীতের উপর ক্রিয়াশীল।

এ-নাটকে একটি কথার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে প্রাচীন অভিজাত রসমার্সহোমের জীবনধারার ঐতিহ্য, যার প্রভাব থেকে কেউ, এমনকি বহিরাগত দুষ্টচরিত্র কূটকৌশলী রেবেকাও মুক্ত থাকতে পারেনি। এ-ঐতিহ্যের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অবিচল গাম্ভীর্য এবং নিশ্ছিদ্র বিষণ্নতা। রসমার্সহোমে কোনো শিশু কখনো কাঁদে না, কোনো বয়স্ক ব্যক্তি কখনো হাসে না। কেমন একটা অবচেতন মৃত্যু-চিন্তা সূক্ষ্মভাবে এর আবহে শিরার অদৃশ্য রক্তধারার মতো প্রবহমান। এই আবহে বৎসরাধিককাল পূর্বে মৃত জমিদার-পত্নী বিয়াটা বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আনন্দ-প্রত্যাশী রসমার বলছেন 'আমার পিঠে লাশের বোঝা নিয়ে জীবনের পথে আমি চলতে পারবো না—চলবো না'। কিন্তু বাস্তবে তাই নিয়েই তাঁকে চলতে হয়েছে। বিষণ্নতা এবং মৃত্যু-মনস্কতা "হেডডা গাবলার"-এর পর ইবসেনের শেষ কয়েকটি নাটকেও লক্ষণীয়। এই মৃত্যু-চিন্তা এক হিসাবে ইবসেন-মানসেরও দ্যোতক, এবং হয়তো তাঁর নিজের জীবনের শোচনীয় পরিণতিরই পূর্বাভাস।

১৯৬৭

"হেডডা গাবলার"

"হেডডা গাবলার" ইবসেনের শ্রেষ্ঠতম নাটকগুলির মধ্যে একটি এ সম্বন্ধে সমালোচকগণ একমত। ব্যক্তি, সমাজ অথবা জীবনের অন্তর্ভেদী নিরীক্ষা, এবং উদ্ভাবন ও গঠন-নৈপুণ্যের বিচারে তাঁর শ্রেষ্ঠতম নাট্য-কর্মের মধ্য থেকে "পুতুলের সংসার"-এর আগের সবগুলি নাটক বরং বাদ দেওয়া যায়, এবং তার পরেরও কয়েকটি নাটক—কিন্তু "হেডডা গাবলার" নয়। মহৎ শিল্পীর কোনো কিছুই উপেক্ষণীয় নয়, তবে এই নাটক ব্যতীত ইবসেন-প্রতিভার পরিচয় একান্তই অসম্পূর্ণ।

"হেডডা গাবলার"-এ ইবসেনের লক্ষ্য ব্যক্তি—শুধু ব্যক্তি হিসেবে। সামাজিক রাজনৈতিক বক্তব্য রূপায়ণের দায় থেকে তিনি অবসর নিয়েছিলেন "রসমার্সহোম" নাটকেই। ঐ নাটক থেকে তিনি ব্যক্তি-স্বরূপ ও ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের রূপকার। কিন্তু তাঁর শেষ পর্যায়ের নাটক-গুলি থেকে (এবং পূর্ববর্তী অনেক নাটকের থেকেও) "হেডডা গাবলার"-এর পার্থক্য এইখানে যে এ-নাটকে অতীতের স্মৃতি-চারণের পরিমাণ ও তাৎপর্য নগণ্য, এবং সেরূপ কোনো স্মৃতি-চারণ থেকে এর নাটকীয়তার উদ্ভব নয়; এখানে তিনি প্রতীকের আশ্রয় নেননি, এর নাটকীয়তার উৎস প্রত্যক্ষ কঠিন-কঠোর বাস্তবের সংঘাত; এবং এর চরিত্রগুলি ব্যক্তি-বহির্ভূত পরিপার্শ্বের দাস নয়, আপন-আপন স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত এবং নিজেদের চক্রসৃষ্ট আবর্তে ঘূর্ণ্যমাণ—অথবা নিমজ্জিত।

বিশেষভাবে এ নাটকের নাম-চরিত্র সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে ইবসেনের একটি মন্তব্য হেডডা গাবলার চরিত্রের উপর আলোক-

পাত করে। তিনি বলেছেন, এ নাটকের "হেডডা গাবলার" নামকরণে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই ইঙ্গিত দেওয়া যে, হেডডা যতটা তার স্বামীর স্ত্রী হিসেবে নয় তার চেয়ে বেশী তার পিতার কন্যা হিসেবেই বিবেচ্য। হেডডার পিতা জেনারেল গাবলার ছিলেন সেনাধ্যক্ষ; সেই সূত্রে সমাজের শুধু উপরতলার সঙ্গে এবং জীবনের উপরিভাগের সঙ্গে ছিল হেডডার পরিচয়, জীবনের গভীর উপলব্ধির সঙ্গে নয়। মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকাশের এবং সুরুচিচর্চার সুযোগ তার জীবনে আসেনি। অধিকন্তু উপরতলার সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল সীমাবদ্ধ, এবং নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত। কিশোর বয়সেই ড্রইং রুমে পিতার পিছন দিকে বসে সে তরুণ লভবর্গের সঙ্গে নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো সচিত্র পত্রিকা দেখার ভান করে—কিন্তু তার বেশী সে এগোয়নি, এবং লভবর্গকেও এগোতে দেয়নি, টোটাভরা পিস্তল উদ্যত রেখে। বিবাহিত জীবনেও স্বামীগৃহে বসেই একাধিক আলাপী লোকের সঙ্গে সেই নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে তার দুর্মর আসক্তি। স্বামী-প্রেমিকা সে নয়, বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব-বোধ অথবা আসন্ন মাতৃত্ব কিছুই তার জীবনে স্নিগ্ধতা আনেনি। বিবাহের পূর্বে যেমন, বিবাহের পরেও তেমনি তার ফ্লার্টিং অব্যাহত। অথচ স্থূল ইন্দ্রিয়সুখেও তার বিতৃষ্ণা। তার স্বভাবের এই অদম্য স্ব-বিরোধিতা—এবং তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ভীরুতা—তার জীবনের শোচনীয় পরিণতির অন্যতম হেতু।

হেডডার এমন কোনো উন্নত রুচি ও কোমল বৃত্তির সম্পদ ছিল না যা নিষিদ্ধ সংলাপ ও অবৈধ আবেগের আসক্তি থেকে তাকে অন্য দিকে আকর্ষণ করতে এবং ঐসবের গ্লানিময় পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারত। তার স্বভাবে একই সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং অদম্য আবেগ-প্রবণতার অবস্থিতি। তার মতো তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি নারী ইবসেনের নাটকেও দুর্লভ, কিন্তু সে মুহূর্ত-সিদ্ধান্ত-চালিতা, বিবেকবর্জিতা, এবং অদূরদর্শিনী ও প্রজ্ঞাহীনা। এইসব কারণেই রুচিতে স্বভাবে ও প্রবণতায় কোনো মিল না থাকা সত্ত্বেও টেসম্যানের মতো মেধাহীন দুর্বলচিত্ত নীরস গবেষককে পতিত্বে বরণ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, লভবর্গের বর্জিত পানাসক্তি পুনরুত্তেজিত করে "সুন্দরভাবে আত্মহত্যার জন্য" তার হাতে সে মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে পিস্তল গুঁজে দিয়েছে,

এবং শুধু অন্য এক নারীর প্রতি স্থূল ঈর্ষা-বশে লভবর্গের প্রাণপ্রতিম অমূল্য পাণ্ডুলিপি অগ্নিতে আহুতি দিতেও সে এক বিন্দু দ্বিধা করেনি। বস্তুতঃ হেডডার প্রতিভা সৃষ্টির নয়, ধ্বংসের। এবং সে এক অহংসর্বস্ব নারী; তার মধ্যে শুধু স্বামীপ্রেম নয়, কোনো প্রেমই নেই, এই নাটকেরই অপর এক নারীর যেমন আছে। স্বামীগৃহে একই দিনে পরপর একাধিক পর-পুরুষের সঙ্গে অবৈধ আলাপের প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ, আবার আত্মমর্যাদা বন্ধক রাখতে এবং কামদাসিত্ব স্বীকারেও তার একান্ত বিতৃষ্ণা। কিন্তু দাবার ঘুঁটি চালতে হেডডা যতোই পারদর্শিনী হোক, অন্য এক নিপুণ খেলোয়াড়ও যে ঘুঁটি চালনা করছে একথা সে ভাবতেও পারেনি। ভিন্নতর উপমা ব্যবহার করে বলা যায়, সেনাধ্যক্ষের রূপসী তীক্ষ্ণবুদ্ধি কন্যার তীব্র কশাঘাতে জটিল ঘটনার অশ্ব উল্কাগতিতে ধাবমান, কিন্তু সে-অশ্বের লাগাম সেই নিপুণা আরোহিনীর হাতে নেই, অধিকন্তু সে অশ্ব অন্ধ, অতএব হেডডার অনিবার্য বেগেই গভীর খাদে উল্লম্ফন।

কিন্তু এই উল্লম্ফনের মধ্যেও নাটকীয়তা আছে, আর এই নাটকীয়-তার—অন্তত আংশিকভাবে—স্বেচ্ছাকর্ত্রীও স্বয়ং হেডডাই। যখন সে উপলব্ধি করলো যে সে অন্তঃসত্ত্বা, এবং কোনো পুরুষকেই পরিচালন করার ক্ষমতা সে আর রাখে না, অধিকন্তু সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ফ্লার্টিং-এর যে নিরাপদ আনন্দটুকুমাত্র সে চেয়েছিল তার সঙ্গে—অপর খেলোয়াড়ের নিপুণ চালে—বাধ্যতা-মূলক আত্মদানের সমূহ সম্ভাবনাও সমুপস্থিত, তখনই তার জীবনতৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটলো। তখন সুচিন্তিত উপায়ে নাটকীয়ভাবে জীবনের পরিসমাপ্তি টানার লোভ সে সংবরণ করতে পারেনি।

"হেডডা গাবলার" প্রধানত এক রুচিহীনা জটিল-প্রকৃতি আধুনিকা সোসাইটি-গার্লের নিরাসক্ত চরিত্র-চিত্রণ, ঠিক যেমনটি ইবসেনের অন্য নাটকে নেই। এই নাটকে ইবসেন কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেননি এবং কোনো মন্তব্য করেননি। অথবা এখানে তাঁর বক্তব্য যেন এই যে কোনো রকম সামাজিক রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়াও তিনি 'বিশুদ্ধ নাটক' লিখতে পারেন। হেডডার মতো তরুণীর শোচনীয় পরিণতি থেকে শুধু পরোক্ষভাবে ইবসেনের সামাজিক দৃষ্টিকোণ অনুমান করা

যায় : সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর অনুচ্চারিত বক্তব্য নিষ্কাশিত করা যায় এই যে বিবেকহীনতা ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম অশুভ।

ইবসেনের ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব এবং সমাজ-নিরীক্ষামূলক নাটক রচনা "হেডডা গাবলার"-এই সমাপ্ত। তাঁর পরবর্তী ও শেষ পর্যায়ের নাটক-গুলির লক্ষ্য অন্যরূপ—নাটকের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে ঈষৎ একাত্ম অনুভূতিতে আত্মজিজ্ঞাসা অথবা জীবনের হিসাব মেলানো।

১৯৬৭

"মহাস্থপতি"

"হেডডা গাবলার" নাটকে হেনরিক ইবসেনের নাট্য-সাধনার একটি পর্যায়ের সমাপ্তি, "মহাস্থপতি"-তে আরেকটি পর্যায়ের সূচনা। এটিই তাঁর শেষ পর্যায়। এখন তিনি আর ব্যক্তিগত, দাম্পত্য অথবা সামাজিক সমস্যার রূপকার নন; "হেডডা গাবলার"-এর পর তিনি সে-সব সমস্যা থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। এখন তিনি জীবনের হিসাব মেলাতে ব্যাপৃত। তাঁর এই শেষ পর্যায়ের সবগুলি নাটকেরই মূলকথা এই হিসাব মেলানো : সবগুলি নাটকের নায়কই আত্মচিন্তায় নিমগ্ন, যদিও বলা যায় "লিটল ইওলফ" এর অনেকটা ব্যতিক্রম (শেষ পর্যায়ের তিনটি নাটক ট্র্যাজেডি এবং "লিটল ইওলফ" কমেডি)। ইবসেনের এই পর্যায়ের প্রথম নাটক "মহাস্থপতি"।

প্রবীণ স্থপতি হ্যালভার্ড সলনেসের জীবনের বিষণ্ণ পরিণতি এ নাটকে রূপায়িত। তাঁর বিষণ্ণতার মূল হেতু তাঁর নিজস্ব কর্মকৃতি। তিনি খ্যাতনামা স্থপতি, কিন্তু তাঁর খ্যাতি অর্জিত বিবেকহীন পন্থায়। এজন্য তিনি একটা অপরাধবোধে আচ্ছন্ন; এবং সর্বদা সন্ত্রস্ত এই চিন্তায় যে একই পন্থায় হয়তো অন্যে তাঁর সব প্রতিপত্তি ছিনিয়ে নেবে।

এই অপরাধবোধের সঙ্গে সংযুক্ত আরেকটি মহাজিজ্ঞাসা : তাঁর আগের বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড, এবং তার ফলে উদ্ভূত ঘটনা-পরম্পরায় তাঁর যমজ সন্তান দু'টির মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেই দায়ী কিনা? এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত নন; কিন্তু তিনি সচেতন যে মহাস্থপতিরূপে তাঁর খ্যাতির সৌধ নির্মিত হয়েছে শুধু সেই বাড়ীর ভস্মস্তূপের উপর নয়, তাঁর দাম্পত্য জীবনের আনন্দেরও ভস্মস্তূপের উপর। তাঁর মতো মিসেস সলনেসও স্থপতি হতে পারতেন, একটা আনন্দময় সংসারের

স্থপতি, কিন্তু সেই অগ্নিকাণ্ডের ফলে সে-সম্ভাবনা চিরবিলুপ্ত। সলনেস অনেক সুন্দর বাড়ী ও গির্জা তৈরী করেছেন, কিন্তু সুখী সংসার গড়ে তুলতে পারেননি ; তাঁর স্থাপত্য তাঁর সংসারকে নিহত করেছে। মিসেস সলনেস আক্ষেপ করে বলেছেন, "তুমি যতই বাড়ী তৈরী কর, হ্যালভার্ড—আমার সত্যিকারের বাড়ী তুমি কখনই তৈরী করতে পারবে না।"

এই প্রৌঢ় স্থপতির জীবনে একদিন অকস্মাৎ আবির্ভূত হলো দুর্দান্ত-যৌবনা হিল্ডা, বন্য শিকারী পাখীর মতো, এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল তাঁর উদ্দাম যৌবন এবং বিগত গৌরব-দিনের কথা। কিশোরী-সুলভ "হাওয়াই প্রাসাদের" রোমাণ্টিক স্বপ্ন নিয়ে হিল্ডার উপস্থিতি। এ স্বপ্ন যুবক সলনেসকে মানাতো, কিন্তু প্রৌঢ় সলনেসের পক্ষে তা মৃত্যুর হাতছানি। কিন্তু তা উপলব্ধি করার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। অতএব অনিবার্যভাবে নিয়তি-বরণ।

নাটকের কাহিনীর সঙ্গে লেখকের জীবনকে হুবহু মেলানো অসঙ্গত ; কিন্তু মনে হয় এ-নাটকে ইবসেন তাঁর গৌরবময় শিল্পী জীবনের মধ্যাহ্ন-লগ্নের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন ; এবং প্রশ্ন করেছেন, শিল্পের জন্য আত্মোৎসর্গ জীবনের অনেক কোমল দিককে নিষ্পিষ্ট করেছে কিনা। সমস্যার রূপায়ণের জন্য ইবসেন তাঁর শেষ জীবনে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে প্রতীকাশ্রয়ী হয়ে উঠেছিলেন ; "মহাস্থপতি' এই পর্যায়ের প্রতীকাশ্রিত নাটক।

এ নাটক রচনাকালেও ইবসেন নিপুণ শিল্পী, কিন্তু তাঁর কল্পনা-শক্তি অনেকটা অবসন্ন। এতে অনেকগুলি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত, যেমন অসদুপায়ে শৈল্পিক প্রতিপত্তি অর্জন, ঈশ্বরের জন্য গৃহ নির্মাণ, হিল্ডার মতো ক্ষণ-পরিচিতা হাল্কা-স্বভাবের মেয়ের জন্য "হাওয়াই প্রাসাদ" নির্মাণ, এবং সেজন্য সাধ্যাতীত সংকল্প গ্রহণ—সব-কিছুকে তিনি একটা সংহত শিল্প-সঙ্গতির মধ্যে মেলাতে পেরেছেন বলা কঠিন।

বস্তুতঃ ইবসেনের কোনো কোনো সমালোচক "মহাস্থপতি"কে তাঁর অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনা বলে বিবেচনা করেন—কিন্তু এ সম্বন্ধে সবাই একমত নন। এ্যালারডাইস নিকল তাঁর "ওয়ার্লড ড্রামা" পুস্তকে ইঙ্গিত করেছেন যে এ নাটকে ইবসেনের শিল্প-সাফল্য অপরিণত

তরুণ-মনস্কের অনুরূপ ; বিশেষত সলনেসের অনেক স্বপ্ন এবং বড় প্রাসাদের মিনার-শীর্ষে আরোহণ এ্যাবসার্ড। পক্ষান্তরে উইলিয়াম আর্চার ইবসেনের ইংরেজী-অনুবাদ-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় একে তাঁর সব চাইতে মৌলিক এবং তাঁর তিনটি বা চারটি শ্রেষ্ঠতম নাটকের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠক এ নাটককে দেখবেন তার ওপর নির্ভর করে তিনি একে কিভাবে নেবেন, কিন্তু মনে হয় এই দুই প্রকার মন্তব্যেই কিছু অতিশয়োক্তি আছে। উইলিয়াম আর্চারের অন্যান্য মন্তব্য, এবং বিশেষ করে উনা এলিস ফারমোরের নিজস্ব অনুবাদের ভূমিকায় সলনেস-চরিত্রের বিশ্লেষণ থেকে বরং সলনেস-চরিত্র এবং এ নাটক সম্বন্ধে একটা যুক্তিসঙ্গত মতামতে পৌঁছানো যায়। এ নাটকের চরম পরিণতি সম্বন্ধেই ধরা যাক : কোনো গির্জার অথবা গৃহের মিনার-শীর্ষে আরোহণই সলনেসের কর্ম নয়, বিশেষতঃ এ বয়সে, এ সম্বন্ধে সলনেস নিজেই অতিশয় সচেতন ; কিন্তু ক্ষণ-পরিচিতা হাল্কা-স্বভাবের এক তরুণীর প্ররোচনায় তাঁর স্বগৃহের মিনার-শীর্ষে আরোহণ ও মৃত্যুবরণ এ্যাবসার্ড কিনা এবং অতিরিক্ত নাটুকেপনা কিনা ? সলনেস-চরিত্রের বিশ্লেষণ দ্বারা একে একটা শিল্প-সঙ্গতির মধ্যে খাপ খাওয়ানো সম্ভব বলে মনে হয়।

হিল্ডার নিকট ব্যক্ত সলনেসের আত্মকাহিনী নিয়েই "মহাস্থপতি" নাটকের প্রধান অংশ। এই আত্মকাহিনী উপলক্ষে সলনেস তাঁর শিল্পী-জীবনের সাফল্যের মূল কারণ স্বরূপ তাঁর নিজস্ব প্রতিভা ছাড়া আরও দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন : একটি হচ্ছে তাঁর অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তি, এবং আরেকটি সেই ইচ্ছাশক্তির সহায়ক এক অলৌকিক রহস্যময় শক্তি। কিন্তু আমরা এও জানি, তিনি একই সঙ্গে প্রতিভাবান এবং নৈতিক আদর্শহীন। নিজের সাফল্যের জন্য তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত স্ত্রীর পৈতৃক সম্পত্তির ধ্বংস কামনা করেছেন, প্রাক্তন মনিবের সর্বনাশ করেছেন এবং নিজের আধিপত্য অটুট রাখার জন্য সেই মনিবের প্রতিভাবান পুত্র তরুণ শিল্পী-কর্মচারীকে প্রদমিত রেখেছেন। এসব কারণে তাঁর বিবেক পীড়িত। প্রকৃতপক্ষে এই পীড়িত বিবেককে প্রবোধ দেওয়ার জন্য, এবং তার দংশন থেকে আত্মরক্ষার জন্যই অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তি এবং সেই ইচ্ছাশক্তির সহায়ক অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির কাহিনীর উদ্ভাবন। এটা আত্মরক্ষা-কৌশল, ডিফেন্স মেকানিজম ;

অংশত সচেতন এবং অংশত অবচেতন মানস-ক্রিয়া। কালক্রমে তিনি নিজেই এই কাহিনী আংশিকভাবে বিশ্বাস করেছেন এবং হিল্ডাকে দিয়েও তা বিশ্বাস করাতে চান। হিল্ডা তা প্রকৃতই বিশ্বাস করেছে এবং এখানেই সংকটের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। হিল্ডা প্রবল ও সংক্রামক ইচ্ছাশক্তিসম্পন্না : সলনেস একদিন যদি মিনারশীর্ষে আরোহণ করে থাকতে পারেন তবে আজ পারবেন না কেন? সলনেস তার এই সংক্রামক ইচ্ছাশক্তির শিকার।

এভাবে সলনেসের প্ররোচিত হওয়ায় অন্য প্রকার মানসিক প্রস্তুতিও অনুপেক্ষণীয়। দাম্পত্য জীবনে সলনেস অসুখী : দোষ যে-পক্ষেরই হোক, কথাটা সত্য। দৃঢ়চিত্ত বিবেকহীন সলনেস এবং দুর্বলচিত্ত কর্তব্যপরায়ণা এ্যালাইন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বিসদৃশ চরিত্রের। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনেও এ্যালাইনের পুতুলপ্রিয়তাকে উইলিয়াম আর্চার নারীদের একটা স্বাভাবিক খেয়াল বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উনা এলিস-ফারমোরের অনুমানই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে এ্যালাইন, যে-কোনো কারণে হোক, তাঁর স্বামীকে ভালোবাসতে পারেননি। তাঁর পুতুলপ্রিয়তা অতৃপ্ত মাতৃস্নেহের দ্যোতক হওয়াও সম্ভব, তবে সলনেস-দম্পতি যে প্রেমের দৈন্যে পীড়িত তাও সুস্পষ্ট। নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও প্রৌঢ় বয়সে হিল্ডার দ্বারা সলনেসের অনুপ্রাণিত হওয়ার এটাও একটা কারণ। আরও একটা কারণ, র‍্যাগনারকে স্থপতির যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়ার পর বহু-আশঙ্কিত "তরুণের করাঘাত" প্রতিষ্ঠিত বাস্তব, এবং সলনেস এখন বস্তুত সিংহাসনশূন্য। জীবন তাঁর কাছে অতঃপর নিরর্থক : যদি নবতর গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে তিনি নিজের সার্থকতা প্রমাণ না করেন। তা তিনি প্রমাণ করতে পারবেন এরূপ ভ্রান্ত আত্ম-বিশ্বাসের প্রেরণা তিনি পেলেন হিল্ডার কাছে। এটা তাঁর আত্মবিচারের অক্ষমতারও প্রমাণ।

এ নাটকের একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সলনেস, এ্যালাইন, এবং হিল্ডা এই তিনজনেরই মানস-প্রকৃতির অস্বাভাবিকতা। এদের মধ্যে প্রথম দু'জন সুস্পষ্টভাবে মানসিক অসুস্থতাগ্রস্ত। হিল্ডা অসাধারণরূপে উদ্দাম প্রকৃতির, অতি কল্পনাপ্রবণ এবং খানিকটা

পাগলী টাইপের। সে অদম্য রোমাণ্টিক ইচ্ছাশক্তি-তাড়িতা ও বিবেচনা-শক্তিহীনা। তার জীবনের চরম লক্ষ্য সলনেসকে মিনার-শীর্ষে দর্শন। এর কমে সে খুশী নয়। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, সলনেসের মিনার-শীর্ষে আরোহণ তাই অস্বাভাবিক মনে হয় না। নৈতিক আদর্শহীন এবং আত্মবিচারের অক্ষম ব্যক্তি যতই আত্মপ্রতারণা করুক, তার প্রকৃতি তাকে চূড়ান্ত নিয়তির পানে আকর্ষণ করবেই, এই হচ্ছে "মহাস্থপতি"র মূলকথা।

সলনেসের মিনার-শীর্ষে আরোহণের লোমহর্ষক পরিণতি নিঃসন্দেহে "মহাস্থপতি"র সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও দৃশ্যগ্রাহ্য নাটকীয় ঘটনা। কিন্তু সূক্ষ্মতর নাটকীয়তাও এতে আছে। এর প্রধান অংশই হিল্ডার সঙ্গে সলনেসের সংলাপ; এই সংলাপের মধ্যে দৃশ্যগ্রাহ্য ঘটনা প্রায় কিছুই নেই; তথাপি নাট্যকার আমাদের আকৃষ্ট করে রাখতে এবং আমাদের উৎকণ্ঠা জাগ্রত রাখতে পারেন, সলনেস ও হিল্ডার পারস্পরিক মানস-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নাটকীয়তায়। প্রধানতঃ মানস-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নাটকীয়তা এবং কাব্যময় আবহ সৃষ্টিতে ইবসেন এখানে উল্লেখনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এটা এ নাটকে ইবসেনের উন্নততর কৃতিত্ব—মিনার-শীর্ষে সলনেসের আরোহণের লোমহর্ষক পরিণতির চাইতেও।

১৯৬৬

"জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান"

ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে "জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান" বোধ হয় এদেশে সবচেয়ে অপরিচিত; অন্তত এখানকার স্বল্প ইবসেন-আলোচনায় আমি কখনো এ নাটকের উল্লেখ দেখিনি। পশ্চিম-পাকিস্তানে "জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান" হয়তো অতটা অপরিচিত নয়, কেননা কয়েক বছর আগে ওখানে রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক উদযাপিত নাট্যউৎসবের তালিকায় এর উর্দু অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত দেখেছিলাম।

কয়েকটি কারণে ইবসেন-সাহিত্যে "জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান"-এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। সুস্থ অবস্থায় লিখিত এটাই ইবসেনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক; এই নাটকে তাঁর কুশলী প্রতিভা শেষ বারের মতো পূর্ণ দীপ্তিতে দীপ্যমান; এবং নায়কের সত্তায় নিজেকে সংলগ্ন করে তিনি জীবনকে নিরীক্ষণ এবং জীবনের মূল্যায়ন করেছেন। ইবসেন যখন "জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান" লেখেন তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি; এটা দীর্ঘ জীবনই বলা চলে; এ জীবনে অনেক কিছু তিনি দেখেছেন এবং ছোটোয়-বড়োয় মিলে বাইশটি নাটকে তাঁর নাট্য-কুশলতা শানিত হয়েছে। এই দীর্ঘ শিল্পী-জীবনের ঘনীভূত অভিজ্ঞতার ফসল এই নাটক। ইবসেনের অনেক নাটকের তুলনায় "জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান" চরিত্র-পরিকল্পনায়, কাহিনী-উন্মোচনে, সুঠাম ঘটনা-সংস্থাপনায় এবং অনুভূতির তীব্রতায় অনেক বেশী নাট্যগুণসম্পন্ন। এ নাটক প্রথম থেকেই জমজমাট।

"মহাস্থপতি"তে ইবসেনের নাট্য-সাধনার যে পর্যায়ের সূচনা, সেই পর্যায়ের অন্যান্য নাটকের মতো এ নাটকেরও মূল কথাটা হলো বিষণ্ন আত্ম-নিরীক্ষা এবং জীবনের হিসাব মেলানো। আত্ম-নিরীক্ষা অবশ্য সব নাটকে এক রকম নয়। "মহাস্থপতি"-র হ্যালভার্ড সলনেস একটা অপরাধ-বোধে আচ্ছন্ন এবং রুগ্ন বিবেকের দ্বারা পীড়িত, কিন্তু আত্ম-আবিষ্কারের প্রকৃত আত্মবিচারে তিনি শেষ পর্যন্ত অসমর্থ। পক্ষান্তরে জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান একান্তভাবে আত্মপ্রত্যয়ী। তিনি ভালোবেসেছিলেন এলা রেন্থেমকে, কিন্তু বিয়ে করেছিলেন এলার যমজভগ্নী গানহিল্ডকে—ব্যবসার খাতিরে; এলাকে বর্জনের শর্তে তিনি জাতীয় আদর্শের সাফল্য কামনা করেছিলেন নীতি-বিগর্হিত

পন্থায়, এবং এইভাবে তিনি নিজের এবং দুটি নারীর জীবনকে ব্যর্থ করেছেন। তাঁর অবিমৃষ্যকারিতায় ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে এবং তাঁকে চূড়ান্ত কেলেঙ্কারী ও শাস্তি বরণ করতে হয়েছে, অসংখ্য পরিবারের সর্বনাশ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তাঁর পরিবারকেও যাপন করতে হয়েছে চরম গ্লানিময় জীবন—কিন্তু তাঁর যে কোথাও ভুল হয়েছে তা তিনি স্বীকার করেননি জীবনের শেষ মুহূর্তের পূর্ব অবধি।

কিন্তু তিনি স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁর কর্মফলই এ নাটকে রূপায়িত। মহৎ মূল্যবোধকে পদদলিত করলে যে তা শেষ পর্যন্ত কল্যাণ বহন করে আনে না, ইবসেনীয় নাটকের এই একটা প্রধান বক্তব্য এ নাটকের পরিকল্পনায়ও অভিব্যক্ত। নাটকের আরম্ভ সেই সময়ে যখন বর্কম্যান এবং গানহিল্ডের নূতন করে চিন্তা করার আর কিছু নেই, যখন মানসিকভাবে এবং জীবনের সকল সম্ভাবনার দিক দিয়ে তাঁরা নিঃশেষিত, এবং বাস্তব জীবনের অলক্ষিত সংক্রমণে তাঁদের নিজ নিজ বাসনার স্বপ্নিল দুর্গের ভিত্তিমূলও ক্ষয়প্রাপ্ত।

নাটক আরম্ভের কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা এক মর্মান্তিক মরণপণ সংঘর্ষের মাঝখানে আপতিত হই। বর্কম্যান এবং গানহিল্ড একই বাড়িতে আট বছর ধরে বাস করছেন, কিন্তু অপরিসীম ঘৃণা বশতঃ এই আট বছরে কেউ কারো মুখ দেখেননি, কেউ কারো নাম পর্যন্ত মুখে আনেন না, ইশারায় একজন আরেক জনের নাম উল্লেখ করেন মাত্র; তবু তাঁদের এই অসহনীয় জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে, গুটিপোকা যেমন নিজের লালা-নিঃসৃত রেশমের কোষে আত্মগোপন করে থাকে তেমনি আপন-আপন স্বপ্নের কোষে আত্মরক্ষা করছিলেন বর্কম্যান এবং গানহিল্ড, কিন্তু একদিন অকস্মাৎ এলা রেন্থেম তাঁদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হলেন বাস্তব জীবন ও সত্যের স্পর্শ নিয়ে। তাঁদের রেশমী স্বপ্নের কোষ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সেই স্পর্শে। গানহিল্ড এবং এলা যৌবনকালে সংগ্রাম করেছিলেন বর্কম্যানকে নিয়ে, এখন—জীবনের শেষ প্রান্তে—তাঁদের সংগ্রাম বর্কম্যানের পুত্র আরহার্টের জন্য। আরহার্ট তৃতীয় কারো কবলিত হোক তবু কোনো বোনই চান না যে সে অপর বোনের কাছে থাকুক। এ সংগ্রামে এক পর্যায়ে স্বয়ং বর্কম্যানও যোগ

দিলেন, কিন্তু তাঁদের কারোই ধারণা ছিল না যে আরহার্ট ইতিমধ্যে নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে।

এই নিরাপোষ, মৃত্যুপণ, মর্মান্তিক সংগ্রামের কোমল দিক হচ্ছে আরহার্টের জন্য এলা রেণ্টেমের নিঃস্বার্থ স্নেহ। আরেকটি কোমল দিক বর্কম্যান ও এলা রেণ্টেমের ব্যর্থ প্রেমের করুণ স্মৃতি। জীবন-সায়াহ্নেও এই স্মৃতি অম্লান। বিশেষত বর্কম্যানের জন্য এলার প্রগাঢ় প্রেম এই বিষণ্ণ নাটকের আদিগন্ত একটা অপরূপ স্নিগ্ধতায় সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে।

"জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান"-এর নাটকীয়তার প্রধান উৎস বর্কম্যান, গানহিল্ড এবং এলা রেণ্টেমের ব্যক্তিস্বরূপ ও স্বার্থ-সংঘাত। কেন্দ্রস্থানীয় এই তিনটি চরিত্রই দৃঢ় ধাতুতে নির্মিত। তাঁদের দৃঢ়তার প্রধান হেতু, ত্রিমুখী লক্ষ্যে তাঁরা নিঃসন্দিগ্ধ ও অবিচল। অতীতে তাঁরা এইরূপ ছিলেন এবং এখনও তাঁরা তাই। বর্কম্যান-দম্পতির 'অবসেসন'-আচ্ছন্ন অসাধারণ ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মূলে স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র, এবং এলাসহ তাঁদের বর্তমান ত্রিকোণ সংঘাতের স্ফুলিঙ্গও তাঁদের চরিত্রের ধাতব সংঘর্ষেই উৎক্ষিপ্ত।

বর্কম্যান প্রতিভাবান এবং অসাধারণ ব্যক্তি। নিজেকে তিনি তুলনা করেছেন প্রথম যুদ্ধেই আহত নেপোলিয়নের সঙ্গে। এ তুলনা যথার্থ। গানহিল্ড এবং এলা রেণ্টেম এই দুই নারীর সমগ্র চেতনায় ও অস্তিত্বে, এবং বস্তুত সমগ্র নাটকে প্রগাঢ় ছায়াপাত করে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। নাটকের প্রথম অঙ্কে তিনি অনুপস্থিত, কিন্তু দুই নারীর সংলাপে ও সংঘাতে আমরা সর্বদা তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব অনুভব করি। এই অঙ্কে দুই নারীর দুই ভিন্ন এবং বিরুদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের ধারণা লাভ করি, তারপর আমরা দ্বিতীয় অঙ্কে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। অতঃপর তাঁর পরিচয় ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়েছে। তাঁর জীবনের প্রধান সমস্যা তাঁর নিজস্ব চরিত্র: তিনি উত্তুঙ্গ আত্মবিশ্বাসে অনমনীয়, ঐশ্বর্য-লিপ্সার দুরন্ত স্বপ্নে উদ্দীপিত, কিন্তু দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানহীনতায় অপরিণামদর্শী। তাঁর উচ্চাকাঙক্ষা ছিল কিন্তু প্রজ্ঞা ছিল না। এবং এই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী হিঙ্কেলের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। তাঁর চরিত্রই তাঁর ধ্বংসের মূলীভূত

হেতু, এবং সেই কারণে যথার্থ ট্র্যাজিক চরিত্র। তাঁর জীবনে একটা বড়ো অভাব ছিল এমন একজন আত্মসমর্পিত এবং কোমল অথচ দৃঢ়-হৃদয়া নারীর, যে তাঁর চরিত্রের উদ্দামতার রাশ টেনে ধরতে পারতো, অবিমৃষ্যকারিতার মাঝে প্রজ্ঞার বাণী শোনাতে পারতো, এবং দুঃখের ও গ্লানির প্রতপ্ত জীবনে প্রশান্তির স্পর্শ দিতে পারতো, সারা পৃথিবীর নিন্দাভাষণ এবং অবিশ্বাসের মুখে বিশ্বাসের বাণী শোনাতে পারতো। একমাত্র এলাই ছিলেন সেইসব গুণের অধিকারিণী; একমাত্র তিনিই বর্কম্যানকে রেশমী স্বপ্নকোয়ের মধ্য থেকে স্বাভাবিক মানবীয় জীবনের মাঝখানে টেনে আনতে পারতেন, কেননা তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বাস্তববাদিনী এবং হৃদয়বতী, কিন্তু সেই এলাকে ত্যাগ করে বর্কম্যান ব্যবসায়ী পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এলার প্রেমময় জীবনের সম্ভাবনাকে বর্কম্যান হত্যা করেছিলেন। এলা এই হত্যাকে বলেছেন বাইবেলোক্ত এক মহাপাপ। তথাপি বর্কম্যান তাঁর ক্ষমা লাভ করেন এবং পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন এই কারণে যে তাঁর ক্ষমতালিপ্সা ছিল একান্তভাবে গণকল্যাণমুখী (যদিও রোমাণ্টিক) এবং জাতীয় গৌরবাকাঙক্ষী, বিশুদ্ধ স্বার্থসর্বস্ব নয়, এবং এই গণকল্যাণের জন্য ব্যবসায়িক বিবাহ স্বীকার করলেও তাঁর নিভৃত মানসে এলার প্রেমের প্রদীপ ছিল অনির্বাণ।

"জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান"-এ বিশেষভাবে লক্ষণীয় এর গঠন-কৌশল। বর্তমানের প্রেক্ষিতে অতীত-রোমন্থনের দ্বারা নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টির কুশলী শিল্পী ইবসেন; এ নাটকেও তাঁর সেই নৈপুণ্য পূর্ণ-সাফল্যে রূপায়িত। গ্রীক নাটকের বিখ্যাত ঐক্যত্রয়ীর মধ্যে সংঘটন ও সময়ের ঐক্য নিখুঁত এমনকি অভিনয়ের কাল-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা নাটকের প্রকৃত কাল-দৈর্ঘ্য আরও কম, কেননা প্রথম অঙ্ক শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ। স্থানীয় ঐক্য প্রায় অক্ষুন্ন। প্রথম তিন অঙ্কের ঘটনাস্থল একটি বাড়ীর দুটি কক্ষ, চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাস্থল বাড়ীর প্রাঙ্গণ ও কিয়দ্দূরস্থ অন্য একটি স্থান। চতুর্থ অঙ্কের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার উপায় মঞ্চের পেছনে অপসৃয়মাণ চিত্রপটের ব্যবহার। এই তীব্র সংঘাতময় রসঘন নাটকের চারিটি অঙ্ককে সংহত করে রেখেছে অবিচ্ছিন্ন সংঘটনের নিশ্ছিদ্র ঐক্য।

নাটকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর কাব্যময়তা। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে বর্কম্যান ও এলার আত্মপরিক্রমা এবং বিশেষ করে বর্কম্যানের ব্যর্থ প্রেমের রোমন্থন কাব্যময়। জাতীয় গৌরবের রোমাণ্টিক আকাঙক্ষায় তিনি অন্ধকার খনি-গর্ভের ধাতব স্তূপকে কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। শেষ অঙ্কে বর্কম্যানের জীবন-স্বপ্নের শেষ সূত্রটিও যখন ছিন্ন হয়ে গেল এবং যখন তিনি বুঝলেন যে এই জীবন-স্বপ্নের বেদীমূলে এলার বিসর্জনই তাঁর জীবনের চরমতম ভ্রান্তি, তখনই তাঁর হৃদয়-স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁর জন্য দুই যমজ-ভগ্নীর আজীবন সংগ্রামেরও ইতি সেখানেই, এবং শুধু তখনই তাঁর লাশের উপর দুই বৃদ্ধা হাতে হাত রাখতে পারলেন, জীবনে সেই সর্বপ্রথম।

"জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান"-এর এই সমাপ্তি-দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী। বহু বছর পরে তীব্র শীতের সন্ধ্যায় কানন-ভ্রমণে বেরিয়ে অকস্মাৎ হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে বর্কম্যানের মৃত্যু হয়েছে। এলা তাঁর সঙ্গেই ছিলেন, গানহিল্ডও এসে পৌছেছেন। একটি বেঞ্চে বর্কম্যানের লাশ শায়িত। তারপর:

এলা রেণ্টেম। (বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে) তুমি ওর দিকে তাকাবে না, গানহিল্ড?

মিসেস বর্কম্যান। (বিতৃষ্ণার ভঙ্গীতে) না, না, না। (নীচু স্বরে) ও ছিল খনি-মজুরের ছেলে, ওই জন গাব্রিয়েল বর্কম্যান। খোলা হাওয়ায় ও বেঁচে থাকতে পারল না।

এলা রেণ্টেম। বরং ঠাণ্ডাই ওকে মেরে ফেলেছে।

মিসেস বর্কম্যান। (মাথা দুলিয়ে) ঠাণ্ডা, তুমি বলতে চাও? ঠাণ্ডা----ওকে মেরে ফেলেছে অনেক আগেই।

এলা রেণ্টেম। (সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে) হ্যাঁ, আর আমাদের দু'জনকে করে তুলেছে যেন দু'টি ছায়া।

মিসেস বর্কম্যান। ঠিক বলেছ।

এলা রেণ্টেম। (বেদনার্ত হাসি হেসে) একটা লাশ আর দুটি ছায়া---সেই শীতল স্পর্শ এই করেছে আমাদের।

মিসেস বর্কম্যান। হ্যাঁ, তাই করেছে শীতল হৃদয়।---এখন বোধ হয় আমরা হাতে হাত রাখতে পারি, এলা।

এলা রেণ্টেম। পারি বোধ হয়, এখন।

মিসেস বর্কম্যান। আমরা দুটি যমজ বোন---তার লাশের পাশে, যাকে আমরা দু'জনেই ভালোবেসেছিলাম।

এলা রেণ্টেম। আমরা দুটি ছায়া---মরা মানুষের উপর।

[বেঞ্চের পেছন থেকে মিসেস বর্কম্যান, এবং বেঞ্চের সামনে থেকে এলা রেণ্টেম, পরস্পরের হাত ধরলেন।]

সর্বপ্রকার সামাজিক বক্তব্যমুক্ত এ নাটকের মানবীয় আবেদন সার্বজনীনতায় মণ্ডিত। কাব্যগুণ, গঠননৈপুণ্য ও চরিত্র-পরিকল্পনার নাটকীয়তার জন্য এ নাটক ইবসেনের অনেক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির তুলনায় অধিকতর দীর্ঘজীবী হবে বলে কোনো কোনো সমালোচক যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা যথার্থ বলেই মনে হয়।

১৯৬৮

ইসলাম-প্রসঙ্গে সৈয়দ আমির আলী

সৈয়দ আমির আলীর ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন-প্রসঙ্গে বলা হয়, তিনি বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এম. এ., প্রথম ব্যারিস্টার এবং প্রথম হাইকোর্ট-জজ; তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দ্বিতীয় হাইকোর্ট-জজ এবং প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ কথা হচ্ছে উনিশ শতকের বাংলার মুসলিম-সমাজের পরিবেশে তাঁর মানস-সংগঠনে আধুনিক দৃষ্টিকোণ এবং মুক্ত চিন্তাধারার স্বাঙ্গীকরণ: এই অর্থে যে জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল এবং তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, মধ্যযুগ-সুলভ মানসিক স্থবিরতা এবং চিন্তাহীন সংস্কার অতিক্রম করে তাঁর সচল মন আধুনিক যুগের সপ্রশ্ন চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। বিশেষ কোনো ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের নিকট প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ তিনি করেননি, সকল বিশ্বাস, চিন্তা ও ইতিহাসকে যুক্তিবাদের আলোকে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগীয় মানসিকতা অতিক্রম করে সার্বজনীন যুক্তিবাদী চেতনায় উত্তরণ সম্ভবতঃ তাঁর মধ্যেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল---উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষিত মুসলিম-সমাজে।

ঐ শতকে বাঙ্গালী মুসলিম-সমাজে আধুনিক চিন্তাধারা সঞ্চারণের প্রথম প্রয়াসের কৃতিত্ব অবশ্য নওয়াব আবদুল লতিফের। তিনি মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি গঠন করে মুসলিম-সমাজে আধুনিক ভাবধারা সঞ্চারণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। ঐ শতকে পরিণতিপ্রাপ্ত (আমি একথা বলছি প্রধানত: বয়সের দিক দিয়ে) বাঙ্গালী মুসলিম লেখকদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেনের জন্ম সৈয়দ আমীর আলীর দু'বছর আগে, এবং শেখ আবদুর রহিম, রিয়াজ-অল-দিন

মাশহাদী এবং মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদের জন্য দশ থেকে বারো বছর পরে; বাঙ্গালী মুসলিম-সমাজকে মধ্যযুগীয় চেতনা থেকে আধুনিক চেতনায় আকর্ষণে এঁদেরও কিছু কৃতিত্ব ছিল, কিন্তু এঁরা কেউ সৈয়দ আমির আলীর মতো আলোকপ্রাপ্ত এবং মনীষাসম্পন্ন ছিলেন না, এবং মধ্যযুগসুলভ চেতনা থেকে এরা নিজেরাও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না (আমি এ-আলোচনা করছি শুধু তৎকালীন বাংলা-দেশেব পরিপ্রেক্ষিতে)। বাংলার মুসলিম সমাজে আমির আলী ছিলেন পশ্চিমী ভাবধারায় সর্বাধিক দীক্ষিত ব্যক্তি, মধ্যযুগীয় চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আধুনিক চিন্তাধাবার স্বাঙ্গীকরণ, এবং সাহিত্যে (অবশ্য ইংরেজীতে, এবং ব্যাপক অর্থে) তার প্রকাশ তাঁব মধ্যেই প্রথম সম্ভব হযেছিল।

আমির আলী অবশ্য জন্মগত সূত্রে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন না। তাঁর এক পূর্বপুরুষ আঠারো শতকে নাদির শা'র সঙ্গে ইরান থেকে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন উত্তর-ভারতে, (বলা হয়, তাঁর আরও উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন আরব) এবং ঐ পূর্ব-পুরুষের বংশধরেবা উক্ত অঞ্চলে বিভিন্ন নবাবের দরবারে উচচপদে কাজ করেছিলেন। আমির আলীর পিতা হেকিমী চিকিৎসা-ব্যবসা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের চুচুঁড়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন, এবং এখানেই ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে আমির আলীর জন্ম হয়। অতএব তিনি ছিলেন আরব-ইরানী। কিন্তু বাংলা-দেশেই আমির আলীর শিক্ষালাভ ও কর্মজীবন, জীবনেব অধিকাংশ সময় তিনি বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং এদেশেই তাঁর চেতনাবিকাশ, এই অর্থে তিনি বাঙ্গালী বলে গণ্য হন। বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাধারার ইতিহাসে তাঁর স্থান গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বাংলার আধুনিক মুসলিম শিক্ষিত-সমাজের একটা গণনীয় অংশে তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। বিশেষত: ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের চিন্তাধারার কয়েকটি সূত্র তাঁর বচনাবলীতেই প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল, যদিও তার উল্লেখ সাধারণত: দেখি না। রাজনীতি-চিন্তাও তিনি করেছিলেন, ভারতের সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারায়ও তাঁর কিছু অবদান ছিল, কিন্তু এখানে আমাদের তা আলোচ্য নয়।

সৈয়দ আমির আলীর প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ডজনখানেক, তার মধ্যে 'এ শর্ট হিস্টি অব দি সারাসিন্‌স্‌' এবং 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' ক্লাসিক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থেই অন্যান্য চিন্তার সঙ্গে তাঁর ধর্মীয় এবং দার্শনিক চিন্তাও ব্যক্ত হয়েছে। মৌলিক চিন্তামূলক গ্রন্থ বলতে যা বোঝায় 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' অবশ্য তা নয়, সঠিক তথ্য ও দৃষ্টিকোণের অভাবে সেকালে যে-সব পশ্চিমী লেখক ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি উল্লসিত উন্নাসিকতায় তাকাতে অভ্যস্ত ছিলেন, প্রধানত: তাঁদের দিকে চোখ রেখে এ-গ্রন্থ রচিত। এর আরও লক্ষ্য ছিল নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আত্ম-নিরীক্ষা। বিশ্ব-মুসলিম সমাজের ধর্মচিন্তা, দর্শনচিন্তা ও অন্যান্য চিন্তাকে তিনি যুক্তিবাদের প্রেক্ষিতে স্থাপন করেন এবং তাঁর কৃতিত্ব এই যে, মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসের কোনো গ্লানিকে এবং চিন্তার কোনো ভ্রান্তিকে তিনি গোপন করেন নি, ক্ষমা করেননি, যুক্তির শরজালে বিদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ-উপলক্ষে তাঁর চিন্তাধারাও কিছু ব্যক্ত হয়েছে। আমরা এখানে তাঁর এই চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

সৈয়দ আমির আলী হজরত মোহাম্মদকে দেখেছেন যুক্তিবাদী পয়গম্বর হিসাবে, এবং ইসলামকে যুক্তিভিত্তিক ধর্ম হিসাবে। জীবন্ত ধর্মবিশ্বাস ছিল তাঁর কাম্য। হৃদয়ের সঙ্গে সংযোগহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠানসর্বস্বতা এবং যান্ত্রিক আচার-নিষ্ঠার তিনি ছিলেন সমালোচক। "এ-যুগের মুসলমান ইসলামের মর্মবাণীকে উপেক্ষা করে তার আক্ষরিক ব্যাখ্যাকেই প্রিয় জ্ঞান করেছে, এবং সুবিধাবাদ ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দাসত্ব বরণ করেছে"—এই মন্তব্য তিনি করেছিলেন তাঁর সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে। মুসলিম-সমাজের ব্যবহারিক জীবনের সংস্কার ও চিন্তার প্রগতি সম্বন্ধে তিনি যে-সব অভিমত ব্যক্ত করে-ছিলেন তা আজও তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রবর্তিত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের নির্বিচার অন্ধ অনুসরণ তিনি সমর্থন করেননি। এ-সম্বন্ধে তাঁর মতামত ছিল এই রকম: এরূপ যান্ত্রিক অনুসরণ হজরত মোহাম্মদের কাম্য ছিল এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। হজরত মোহাম্মদ যুক্তিবৃত্তিকে সকলের উপর স্থান দিয়েছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, বিশ্বের সবকিছু নিয়ম ও শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত এবং প্রকৃতির নিয়মের তাৎপর্যই হচ্ছে প্রগতিমূলক বিকাশমানতা।

"একটা অর্ধসভ্য জাতির সাময়িক প্রয়োজনে যে-সব নির্দেশ জারী করা হয়েছিল সেগুলিও কেয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকুক এই ছিল হজরত মোহাম্মদের কাম্য, এটা মনে করা তাঁর প্রতি অবিচার।"

মুসলিম-সমাজে যে স্থবিরতা এসেছে তার মূলে রয়েছে প্রধানত: এই ধারণা যে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার (ইজতিহাদের) অধিকার একালের মুসলমানের নেই, সে অধিকার সমাপ্ত হয়ে গেছে ইসলামের প্রথম যুগের মুজতাহিদগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই। "আধুনিক যুগে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা পাপ; খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য হতে হলে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে কোনো না কোনো মজহাবের অন্তর্গত থাকা, এবং সেইসব ব্যক্তির ধর্মব্যাখ্যার কাছে সমস্ত বিচার-বুদ্ধি সমর্পণ করা যাঁরা ছিলেন নবম শতাব্দীর লোক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজন সম্বন্ধে যাঁদের কোনো ধারণা ছিল না।" সুন্নী-সমাজে বদ্ধমূল একটা সাধারণ বিশ্বাস এই যে চার ইমামের পরবর্তী জামানায় রসুলুল্লার বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারেন এরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আর আবির্ভাব হয় নি। মুসলমানেরা যে এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস করছে এটা ধর্তব্য বলেই গণ্য করা হয় না, মনে করা হয় যে, বিজ্ঞ মুজতাহিদগণ কয়েক শতাব্দী আগে যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা একালেও সমান প্রযোজ্য। শিয়া-সমাজও নূতন চিন্তার বিরোধী। "রসুলুল্লাহ্ যুক্তিকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সর্বোচ্চ এবং মহত্তম গুণ বলে বর্ণনা করেছেন, আমাদের মজহাব-নায়ক এবং তাদের অন্ধ অনুসারিগণের মতে এর প্রয়োগ পাপ এবং অপরাধ।" ফলত: আধুনিক যুগে বহু সংখ্যক মুসলমানের জীবন ও আচরণ যতোটা রসুলুল্লাহর উপদেশ ও শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়, তার চাইতে বেশী পরিচালিত হয় বিভিন্ন মুজতাহিদ এবং ইমামের মতবাদ ও অভিমতের দ্বারা।

মুসলিম-সমাজে অন্ধ আচার-নিষ্ঠার পরিবর্তে জীবন্ত ধর্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য আমির আলী সংস্কার-আন্দোলন বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেছেন। সংস্কার-আন্দোলনের প্রধান পদক্ষেপ হিসাবে তিনি মাতৃভাষায় নামাজ পড়া এবং এবাদৎ-বন্দেগীর আবশ্যকতার উল্লেখ করেছেন। "ইসলামের সংস্কার আরম্ভ হবে তখনই যখন একবার স্বীকার

করা হবে যে খোদার কালাম যে-কোনো ভাষায় অনুবাদ করা হোক না কেন তার খোদায়ী বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকবে, এবং যে-কোনো ভাষায়ই এবাদত করা হোক না কেন খোদা তা কবুল করেন। রসুলুল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর বিদেশী উম্মতগণকে তাদের নিজস্ব ভাষায় এবাদত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অন্যান্য উম্মতগণকে তিনি তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন আবৃত্তি করার সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে কোরআন সাতটি ভাষায় নাজেল হয়েছে।" নজীর হিসাবে আমির আলী সালমান ফারেসের কথা উল্লেখ করেছেন। রসুলুল্লাহ্ সালমানকে সর্বপ্রথমে তাঁর নিজস্ব ভাষায় (ফারসীতে) এবাদত করার অনুমতি দেন। ইমাম আবু হানিফা যে কোনো ভাষায় নামাজ পড়া বা খুতবা পড়া জায়েজ বলে মনে করতেন। "ইসলামের প্রথম যুগে সার্বজনীন অভিমত ছিল এই যে, না বুঝে এবাদত করার কোনো সার্থকতা নেই।"

এই নিয়ে আমির আলীর সমসময়ে এই উপমহাদেশের মুসলিম-সমাজে যে বিতর্ক এমনকি তিক্ততারও সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি তার উল্লেখ করেছেন। সেই সময়ে বিশেষ করে হানাফী সপ্রদায়ের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক চলছিল তার একটি হচ্ছে: "কোরআনের অনুবাদ কি আরবী কোরআনের সমান মর্যাদার অধিকারী?" প্রাচীনপন্থীদের এ প্রশ্নের জবাবে নব্যপন্থী মুসলমানেরা পাল্টা প্রশ্ন করতেন: "খোদা কি একমাত্র আরবী ভাষাই বোঝেন? তা যদি না হয় তবে রসুলুল্লাহ্ প্রবর্তিত নামাজের উদ্দেশ্য কি? যদি এর উদ্দেশ্য হয় উপাসককে খোদাতায়ালার নিকটতর করা এবং তার হৃদয়কে নির্মল ও উন্নত করা, তাহলে কেমন করে সে নামাজের মহৎ প্রেরণা অনুভব করবে সে যা বোঝে না তা শুধু আবৃত্তি করে?" নব্যপন্থীরা নিজেদের মতের সমর্থনে সালমান ফারেসের নজীর দেখাতেন। আমীর আলী এই নব্যপন্থীদের সমর্থন করেছেন। তিনি আশা করেছিলেন যে নব্যপন্থীদের নীতি একবার গৃহীত হলে খৃস্টীয় নবম এবং দশম শতাব্দীতে বিধিবদ্ধ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলিকে গত হাজার বছরের আলোকে বিচার করে দেখতে হবে। এর প্রয়োজন এইজন্য যে সে-সব ধর্মব্যাখ্যা হাজার বছর পূর্বে যাদের জন্য করা হয়েছিল তাদের থেকে আধুনিক যুগের মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভিন্ন প্রকারের।

মাতৃভাষায় এবাদত সৈয়দ আমির আলীর প্রিয় বিষয় ছিল বলে মনে হয়, কেননা এ নিয়ে তিনি "দি স্পিরিট অব ইসলাম" গ্রন্থের দু'টি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন, এবং এ গ্রন্থের নাম-পৃষ্ঠায় বিখ্যাত ইরানী কবি সানাই-এর এই বয়েতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন: "কি যায়-আসে প্রার্থনার সময় উচ্চারিত তোমার কথাগুলি হিব্রু অথবা সিরীয় ভাষায় হলে, অথবা যে কোনো স্থানে—জাবাল্কায় অথবা জাবল্-সায়—তুমি খোদাতায়ালাকে অনুসন্ধান করলে"।

ইসলামের দার্শনিকতত্ত্ব প্রসঙ্গে তিনি যুক্তিবাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। প্রামাণ্য হাদিস থেকে তিনি এই দার্শনিকতত্ত্ব নিষ্কাশন করেছেন যে মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন-ইচ্ছার অধিকারী, পূর্ব-নির্ধারিত কোনো বিধিলিপির দাস নয়। কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে অধ:পতিত অথবা স্বভাবত: পাপী নয়; প্রতিটি শিশু বিশুদ্ধ মানুষরূপেই জন্মলাভ করে, তারপরে সে যদি সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয় তবে সেটা তাকে প্রদত্ত শিক্ষার ফলমাত্র। সৈয়দ আমির আলী মধ্যযুগের মুসলিম-অধুষিত দেশগুলির বিভিন্ন দার্শনিক আন্দোলন এবং দর্শন-চিন্তা প্রসঙ্গে মোতাজিলাবাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। মোতাজিলাবাদীদের বৈশিষ্ট্য ছিল আল্লাহ্ স্বরূপ এবং জগৎ ও জীবনের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার প্রয়াস। তাঁদের দর্শনের মূল কথাটা ছিল বিশ্বাস নয়, যুক্তিবাদ: বস্তুত সব দর্শনেরই মূল কথাটা ওই। প্রধানত: আল-আশারী এবং আল-গাজ্জালী মোতাজিলাবাদীদের তত্ত্বকথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন এবং মুসলিম-জগৎ থেকে যুক্তিবাদ তথা দর্শন ও বিজ্ঞানের মূলোৎপাটনে সমর্থ হন। আমির আলী একজন মনীষীর এই উক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন: "আল-আশারী এবং আল-গাজ্জালীর আবির্ভাব না হলে আরবেরা গ্যালিলিও, কেপলার এবং নিউটনের জাতিতে পরিণত হতে পারতো।"

এই উদ্ধৃতি-ব্যবহার থেকেই বোঝা যায় আমির আলী উক্ত দুই "মনীষীর" প্রভাবকে মুসলিম জগৎ তথা সমগ্র মানব-সমাজের জন্য চরম অকল্যাণকর বিবেচনা করেছেন। "ইসলাম-প্রচারের প্রথম পাচ শতাব্দী যাবৎ এই ধর্ম মানবসমাজের বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ স্ফুরণে সহায়তা করেছে, কিন্তু তারপর (আল-আশারী এবং আল-গাজ্জালী প্রমুখ চিন্তাবিদদের প্রভাবে) প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন প্রসারলাভ করে,

এবং সমগ্র মানব-সমাজের চিন্তাধারার গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিজ্ঞান-চর্চা এবং দর্শন-চর্চাকে মুসলিম-সমাজে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।'' আমির আলী সুন্নী-সমাজে ইউরোপের অনুরূপ ধর্মচিন্তা-সংস্কার (রিফর্মেশন) এবং ইসলামিক প্রোটেস্টান্টিজ্‌ম্‌ বাঞ্ছনীয় , জ্ঞান করেছেন। তাঁর মতে মধ্যযুগের মোতাজিলাবাদ এই ইসলামিক প্রোটেস্টাণ্টিজ্‌মের পথ সুগম করেছে।

সৈয়দ আমির আলীর মতামত আলোচনা করে মনে হয়, তাঁর যুক্তিবাদ, মোতাজিলাবাদের প্রতি সমর্থন, নবম-দশম শতাব্দীতে বিধিবদ্ধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ পুনর্বিবেচনা এবং মাতৃভাষায় এবাদতের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ—এই কয়েকটি ব্যাপারে ঢাকার ''মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'' তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রেরণা গ্রহণ করেছিল।

১৯৬৭

ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"

যখনই আমরা কোনো পুরনো সাহিত্য-পত্রিকা পড়ি তখনই অতীত কথা কয়ে ওঠে: কিন্তু কথা কয়ে ওঠে অতীতের ভাষায়, দূর থেকে, সমস্বরে কিন্তু বিচিত্র স্বরে, সে স্বরের খানিকটা বর্তমানে এসে পৌঁছে, খানিক-বা পৌঁছে না। এর কারণ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে দৃষ্টিকোণ, সমস্যা, জীবনরীতি সবকিছু নিয়ে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে যায়, এবং সে পরিবর্তন যে কতখানি তা বিশেষভাবে ধরা পড়ে পুরনো পত্রিকা পড়লে। কেননা সচেতনভাবে হোক বা অচেতনভাবে, প্রত্যেকটি পত্রিকাই তার সমকালের সমাজকে প্রতিফলিত করে (সাহিত্যও কি তাই করে না?)। যে-কোনো মতবাদই প্রচার করুক, যত অগ্রসর মতবাদই প্রচার করুক, পত্রিকামাত্রেরই প্রকৃতি ও কর্তব্য এই-ই। তারপর সময় তার কাজ করে যায়, পত্রিকার পাতাগুলো ক্রমে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, এবং তার ওপর ধুলো জমতে থাকে। তারপর একদিন আশ্চর্য হতে হয়, যা এক সময় চাঞ্চল্যকররূপে নূতন মনে হতো, বৈপ্লবিক মনে হতো, তাও কত পুরনো হয়ে যেতে পারে।

ঢাকার আধুনালুপ্ত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' মুখপত্র "শিখা" এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এটি ছিল একান্তভাবে মতবাদমূলক বার্ষিক পত্রিকা; এতে গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা ছাপা হতো না, 'সাহিত্য-সমাজের' বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ অভিভাষণ এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণীই শুধু ছাপা হতো: কৃচিৎ প্রাপ্ত-প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনাও। সমালোচক-মহল পত্রিকাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এমনকি কেউ কেউ 'সাহিত্য-সমাজের' লেখকগণকে 'শিখাপন্থী'

বলেও উল্লেখ করতেন। এতে যে-সব মতামত প্রকাশ করা হতো তার প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই করা হতো, তবে প্রশংসা যতটা নয় নিন্দা বোধ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রশংসা বা নিন্দা যে-কোনো উল্লেখযোগ্য লেখক বা লেখকগোষ্ঠীরই অনিবার্য নিয়তি, কিন্তু 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' কোনো কোনো লেখকের বেলায় নিন্দা লাঞ্ছনার পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এমনকি নির্যাতনের পর্যায়ে বলেও শোনা যায়। কিন্তু সব পুরোনো পত্রিকার মতোই "শিখা"র পৃষ্ঠাগুলোও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে এবং তার ওপর ধূলো জমেছে। আজ আশ্চর্য হতে হয় কত সামান্য ব্যাপার নিয়ে সেদিন ঝড় উঠতে পেরেছিল: সামান্য কিন্তু কত অসামান্য মনে হয়েছিল সেদিনের কাছে। পুরনো "শিখা" পড়লে নূতন করে প্রতীয়মান হয় যে সময় কোনো সমাজে, এমনকি আমাদের সমাজেও স্থাণু হয়ে থাকে না। সময়ের হস্তাবলেপ "শিখার" উপরেও অভ্রান্ত; কিন্তু এতে তার অগৌরবের কিছু নেই, বরং এই-ই তার গৌরবের। কেননা, সময়ের সচলতাই ছিল তার কাম্য।

"শিখার" প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল বাংলা ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসে, পঞ্চম এবং শেষ সংখ্যা ১৩৩৮ সালে। সম্পাদক হিসেবে যাঁদের নাম ছাপা হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন, প্রথম বর্ষে আবুল হুসেন (তিনি নিজের নামের এই বানান লিখতেন), দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে কাজী মোতাহার হোসেন, চতুর্থ বর্ষে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ এবং পঞ্চম বর্ষে আবুল ফজল। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও 'সাহিত্য-সমাজ' আরও কয়েক বছর টিঁকে ছিল এবং যে প্রথম পাঁচ বছর "শিখা" প্রকাশিত হয়েছিল সে - সময়েও এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় লেখকদের অনেক বিখ্যাত প্রবন্ধ "শিখায়" ছাপা হয়নি, হয়েছিল অন্যত্র, যেমন কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' বা আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ইত্যাদি তবু একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, যে-সব মতবাদের জন্যে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' চিহ্নিত, প্রশংসিত ও নিন্দিত তার অধিকাংশই এবং প্রধান অংশই এতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে ও অভিভাষণে ব্যক্ত হয়েছে। এইজন্যে "শিখায়" প্রকাশিত মতবাদের পরিচয় বহুলাংশে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'রও মতবাদের পরিচয়, এবং সেই

সঙ্গে পরিচয় বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের কালান্তরেরও। "শিখার" পুরনো সংখ্যাগুলো 'সাহিত্য-সমাজের' মতবাদের পূর্ণ পরিচয় ধারণ করে না; কিন্তু কালান্তরের যে পরিচয়টুকু বহন করে তা সুস্পষ্ট।

॥২॥

বাংলা ১৩৩২ সালে, ইংরেজী ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' গঠিত হয়।* এর চিন্তার প্রধান প্রেরণা আসতো কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেনের কাছ থেকে। বুদ্ধির মুক্তি ছিল এই সাহিত্য-সংস্থার মূলমন্ত্র। আধুনিক জগতের চিন্তাধারার পবিপ্রেক্ষিতে এবং যুক্তিবাদের আলোকে বাঙ্গালী মুসলিম-সমাজের তৎকালীন সমাজ-চিন্তা, ধর্মচিন্তা ও মূল্যবোধগুলোর বিচার কবাই ছিল সাহিত্য-সমাজের লক্ষ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলমানদের সাহিত্য-সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁদেব বক্তব্য ছিল; কিন্তু লক্ষ্য কবাব বিষয়, প্রতিষ্ঠানগতভাবে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'ব লক্ষ্যীভূত হয়নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ পরে।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' লেখকদের দৃষ্টি ছিল যুক্তিবাদীর দৃষ্টি, চিন্তা-সংস্কাবেব দৃষ্টি. এবং সমাজ-সংস্কারের। তাঁদের দৃষ্টি ছিল রেনেসাঁব দৃষ্টি: চিন্তার গতানুগতিকতা থেকে এবং ঐতিহ্যের অন্ধ-অনুবর্তিতা থেকে তাঁরা বাঙ্গালী মুসলিম-সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন. অতীতের, ইসলামেব এবং বর্তমানের যা-কিছু ভালো তা আত্মসাৎ কবে তাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সঙ্কীর্ণতামুক্ত সুস্থ-

* প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বার্ষিক 'বিববণী'তে সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক আবুল হুসেন লিখেছেন, "শ্রীমান আবদুল কাদির প্রমুখ আমাদেব কতিপয় নবীন সাহিত্য-প্রাণ বন্ধু মিলে গত বৎসব ১৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধাস্পদ মৌঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবেব পৌবোহিত্যে এই সাহিত্য-সমাজের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।" মোট পাঁচজনকে নিয়ে এর কর্ম-সংসদ গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে একমাত্র আবুল হুসেন ছিলেন অধ্যাপক, অন্যান্যরা ছাত্র। সম্পাদক ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা আর কোনো কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়নি।

তৃতীয় সংখ্যা "শিখা"ব প্রকাশিত তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীতে বলা হয়েছে: "শ্রদ্ধেয ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, তরুণ কবি আবদুল কাদিব, অধ্যাপক মৌঃ আনোয়ারুল কাদির প্রভৃতি কয়েকজন উদ্যমশীল ব্যক্তি প্রথমে এই সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।"

উদার বিশ্বমানবতার আকাশতলে, যেখানে বাঙ্গালী মুসলমান বিশ্বজনীন চিন্তার অংশীদার, এবং আধুনিক জগতের প্রাগ্রসর সমাজ ও জাতিসমূহের সমপর্যায়ে স্পষ্টচঞ্চল। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' যে ঐতিহাসিক মুহূর্তে গঠিত হয়েছিল এবং কাজ করেছিল সে সময়ে এটাই ছিল স্বাভাবিক। বস্তুত:, বলতে গেলে বহির্বিশ্বের এবং এই উপমহাদেশের কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল 'সাহিত-সমাজ'। বহির্বিশ্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রুগ্ন তুরস্কের মধ্যযুগীয় খোলস ত্যাগ, খেলাফতের অবসান এবং ধর্মনিরপেক্ষ নবীন তুর্কী রাষ্ট্রের সবল আত্মপ্রতিষ্ঠা। রক্ষণশীল পাঠানদেশ আফগানিস্তানে বাদশা আমানুল্লাহর সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টাও প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। সারা মুসলিম জাহানেই তখন শোনা যাচ্ছিল নব-জাগরণের কল-কল্লোল। সে যুগের পাক-ভারতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, 'সাহিত্য-সমাজ' গঠিত হওয়ার অল্প কয়েক বছর আগে সারা পাক-ভারতে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছে। দৃষ্টি আরেকটু সঙ্কুচিত করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তখন একটা নূতন পর্যায়ের সূচনা হয়েছে: নজরুল তাঁর চোখ-ঝলসানো দীপ্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এবং বিশেষভাবে মুসলিম সমাজের মূল্যবোধগুলোকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে কাজী ইমদাদুল হক তাঁর "আবদুল্লাহ্" উপন্যাস রচনা করেছেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছেন তাঁর সামাজিক প্রবন্ধগুলো। সৈয়দ আমির আলী লিখিত "দি স্পিরিট অব ইসলাম" আরও আগে প্রকাশিত। পার্শ্ববর্তী হিন্দু-সমাজের সারা উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম পাদব্যাপী নব-জাগরণ-সাধনার দৃষ্টান্ত তো সকলের সামনেই ছিল দেদীপ্যমান। রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্য-ক্ষেত্রের এতগুলো ঘটনার অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'। এসব ঘটনার কথা মনে রাখলে বোঝা যায়, 'সাহিত্য-সমাজ' যাঁরা গঠন করেছিলেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা ছিলেন সচেতন মনের অধিকারী, তাঁরা সমকালীন ইতিহাসের তাৎপর্য বুঝেছিলেন এবং এই ইতিহাস থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না রেখে এই ইতিহাসের সঙ্গে সামিল হয়ে তাঁরা মুসলিম চিন্তাজগতে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এই তাৎপর্যের কথা তখনকার মুসলিম-সমাজ পুরোপুরি বোঝেনি। না বোঝার কারণ ছিল। 'সাহিত্য-সমাজের' লেখকেরা বলেছিলেন বুদ্ধির মুক্তির কথা। তাঁরা আধুনিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যুক্তিবাদের আলোকে তৎকালীন মুসলমানদের সমাজ-চিন্তা ধর্মচিন্তা ও মূল্যবোধগুলোকে নূতন করে দেখতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, বহু শতাব্দী আগে মধ্যপ্রাচ্য বা মধ্য এশিয়ার চিন্তা নায়কগণ যে-সব চিন্তা করে গেছেন তাতেই মুসলমানদের যাবতীয় চিন্তার ইতি হয়ে যায়নি এবং নূতন চিন্তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, যুগে যুগে নূতন চিন্তার প্রয়োজন ছিল, এবং আজো আছে। সাহিত্য-সমাজের লেখকদের ভাষাটা ঠিক এই রকম ছিল না, কিন্তু তাঁদের চিন্তা ধারা এবং বক্তব্যটি ছিল এই রকম। নূতন চিন্তার আভাস পেলে রক্ষণশীলেরা চিরদিনই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, সেদিনও হয়েছিলেন। তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন ''মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' লেখকেরা ইসলাম-বিরোধী। 'সাহিত্য-সমাজ'-এর লেখকদের সব মতামতই একেবারে আনকোরা নূতন ছিল না, তাঁদের কোনো কোনো মতামত ছিল সৈয়দ আমির আলীর ''দি স্পিরিট অব ইসলাম'' গ্রন্থে ব্যক্ত মতামতেরই প্রতিধ্বনি (বিশেষ করে কোনো কোনো ইসলামী বিধান সংস্কার-সম্পর্কিত মতামত), এবং বস্তুত: তাঁরা ইসলামকে অস্বীকার তো করতেনই না বরং হজরত মোহাম্মদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তথাপি তাঁদের বিরুদ্ধে ইসলাম-বিরোধিতার অভিযোগ উঠেছিল। কারো মতের সঙ্গে না মিললে ইসলাম-বিরোধী বা রাষ্ট্র-বিরোধী বলার রেওয়াজ একালে সুপরিচিত, অতএব বহুলাংশে গুরুত্বহীন, কিন্তু সে সময়ে এরূপ অভিযোগের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, এবং অভিযোগটা সাহিত্য-সমাজের কারো কারো পক্ষে লাঞ্ছনার কারণ হয়েছিল।

মুসলিম সমাজের কোনো বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে নয়, এই সমাজ সম্বন্ধে সর্বব্যাপী ছিল 'সাহিত্য-সমাজে'র বক্তব্য। এর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, এর মনন ও আচরণ, এর কুসংস্কার, পরিবার-জীবন, সামাজিক প্রথা, গোঁড়ামি, অতীতমুখীনতা, পশ্চিমমুখীনতা, ললিতকলা-বিমুখতা, শিক্ষা-সমস্যা, কোনো কিছুকেই 'সাহিত্য-সমাজ' এড়িয়ে

যেতে চাননি, সব কিছু সম্বন্ধে সমকালীন চিন্তাধারার গলদ তাঁরা উন্মোচন করেছেন, এবং করেছেন বলেই তাঁরা বৃহত্তর সমাজের অপ্রীতিভাজন হয়েছেন। তাঁদের কয়েকটি বক্তব্যের (যা আজ নিতান্ত মামুলি মনে হবে, কিন্তু সেদিন মামুলি ছিল না) বিবরণ দিলে বোঝা যাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল, সমাজের চিন্তাধারা তখন কোন্ স্তরে ছিল এবং এখনই-বা কোন্ স্তরে পৌঁছেছে।

সাহিত্য-সমাজপন্থীরা অবরোধ-প্রথার বিরোধী ছিলেন। (অবশ্য এ-ব্যাপারে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ছিলেন তাঁদের অগ্রবর্তিনী)। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, সাহিত্য-সমাজপন্থীরা এই প্রথার বিরুদ্ধতা করে রক্ষণশীল সমাজকে শঙ্কিত করে তুলে-ছিলেন। আজ যখন আমরা মুসলিম তরুণী ও মহিলাদের দে সাবলীল পদক্ষেপে প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে হেঁটে যেতে, উন্মুক্ত ময়দানে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা করতে, বলিষ্ঠ পেশীর প্রয়োগে আগ্নেয়াস্ত্রের চর্চা করতে, বিচিত্রানুষ্ঠানে ও নাট্যমঞ্চে সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের শিল্প-আনন্দ বিকীর্ণ করতে, তখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে ত্রিশ বছর আগে কোনো সাহিত্য-সভায় মুসলিম মহিলার উপস্থিতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল এবং সমাজের আপত্তিও তাতে ছিল প্রচুর। 'সাহিত্য-সমাজের' কার্যবিবরণী পড়ে আমরা আজ তাই কৌতুক বোধ করি যে, এর দ্বিতীয় বছরের দু'-একটি সভায় দু'-একজন মহিলা আসতে আরম্ভ করেছিলেন, এটা সেকালে একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে গণ্য হয়েছিল।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র আরেকটা নীতি ছিল ললিতকলার চর্চা সমর্থন। চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যাভিনয়ের চর্চা মুসলমানদেরও করা উচিত এই তাঁরা বলতেন এবং এ-ব্যাপারে মোল্লাদের বিরোধিতার সমালোচনা করতেন। ললিতকলা আজ মুসলিম সমাজে অজ্ঞাত নয়, এমনকি বেশ-কিছুটা বিকাশলাভও করেছে, আর্ট ইনস্টিটিউট, বুলবুল একাডেমী এবং এদের চিত্র-প্রদর্শনী ও বিচিত্রানুষ্ঠানগুলি আজ ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু ললিতকলা যে মুসলমানদের আদৌ চর্চা করা উচিত এবং এতে দোষের কিছু নেই, একথা সেদিন

'সাহিত্য-সমাজ'কে বার বার বলতে হয়েছিল। সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত 'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ' শীর্ষক এক প্রবন্ধের আলোচনার বিবরণ দিতে গিয়ে সম্পাদক লিখেছিলেন :

> প্রবন্ধ শুনে কেউ বিশেষ চটেছেন বলে মনে হয় না---তবে কেউ কেউ বলেছেন, "তাও কি সম্ভব ? মেয়ে সেজে রঙ্গমঞ্চে নাচাকুঁদা কি জায়েজ ? একেবারে হারাম, নাউজ্ বিল্লাহ্"।
>
> ---"শিখা", প্রথম বর্ষ ১৩৩৪

সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বছরের দু'একটি সাহিত্য-সভায় দু'একজন মুসলিম গায়ক গান গেয়েছিলেন, এ একটা উল্লেখযোগ্য প্রগতি বলে সে বছরের কার্যবিবরণীতে বর্ণিত হয়েছিল।

সুদ-প্রসঙ্গেও 'সাহিত্য-সমাজের' কিছু বক্তব্য ছিল এবং এ-সম্বন্ধে তাঁরা অনেক কথা বলেছেন। এর লেখকেরা অবশ্য 'রেবা' বা মহাজনী সুদ সমর্থন করতেন না; কিন্তু সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ছেড়ে দেওয়া মুসলিম সমাজের একটা বিরাট আর্থিক ক্ষতি বলে তাঁরা মনে করতেন। সুদ হারাম এই জ্ঞানে মুসলমানেরা সেই সময়ে, এবং পরেও, এই বাবতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার সুদ ছেড়ে দিত এবং সরকার এই সুদের টাকা দান করতেন খৃস্টান মিশনারীগণকে। আজও যে মুসলিম সমাজের সকলেই নির্দ্বিধায় সুদ গ্রহণ করেন তা হয়ত নয়, কিন্তু পাকিস্তানের সরকারী ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়গত পর্যায়ে সুদ এখন আর কোনো সমস্যাই নয়, এসব ক্ষেত্রে কালের গতি সাহিত্য-সমাজপন্থীদের বিরুদ্ধে যায়নি।

'সাহিত্য-সমাজের' মুখপত্র "শিখা" পড়ে আরো একটা ব্যাপারে আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। স্বাধীনতার যুগে ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে, কিন্তু 'সাহিত্য-সমাজের' লেখকগণকে এর চেয়েও একটা মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছিল। সেই সময়ে বাংলার মুসলিম অভিজাত বংশীয় কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উর্দুকে বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষা হিসাবে চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। 'সাহিত্য-সমাজের' প্রথম বর্ষের কার্য-বিবরণী

দিতে গিয়ে সম্পাদক আবুল হুসেন লিখেছিলেন:

(কাজী ইমদাদুল হকের মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত) এই শোক-সভার শেষভাগে 'বাংলা বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত', এই কথার আলোচনা শুরু হয়। মৌ: মু: শহীদুল্লাহ সাহেব একথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে মৌ: খোন্দকার ফয়জুদ্দিন সাহেব উহা সমর্থন করতে গিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি সন্দর্ভ পড়েন। তারপর স্যার আবদুর রহিমের উক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশের ভয়েই হোক বা তাঁর উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা করেই হোক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এ-সম্বন্ধে একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। তখন অগত্যা সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ---"শিখা", ১ম বর্ষ

'সাহিত্য-সমাজের' প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ বলেছিলেন :

এই বাংলাদেশে এমন অনেক মুসলিম আছেন যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন।
---"শিখা", ১ম বর্ষ

একই সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যার এ. এফ. রহমান বলেছিলেন :

আমারই জীবনে এমন একটা সময় দেখেছি যখন নিজের ভাষাটা না জানাই সভ্যতার চিহ্ন বলে ধরা হতো।

---"শিখা", ১ম বর্ষ

'সাহিত্য-সমাজের' দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনেও একই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে ঢাকা মুসলিম হলের তৎকালীন প্রভোস্ট এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ মাহমুদ হাসান নিজে অবাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও বলেছিলেন :

বাংলাদেশে জোর করে উর্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহাম্মকি আর নাই। বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত।
---"শিখা", ২য় বর্ষ, ১৩৩৫

আমাদের সমাজ সমগ্রভাবে না হলেও বহুলাংশে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তা এইসব উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্ট।

বাংলা ভাষার প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানের প্রীতির প্রবাহ আজ বিশালকায় ও দুকূলপ্লাবী, কিন্তু এর উৎস-ধারার পুষ্টি-সাধন ও এতে বেগ-সঞ্চারের কৃতিত্ব সাহিত্য-সমাজের কম নয়।

মুসলমানদের শিক্ষাকে আরবী-ফারসী-সর্বস্ব করায় 'সাহিত্য-সমাজ-পন্থী'দের আপত্তি ছিল। "শিখা"র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল হুসেন বলেছেন, "যুগ-বিশেষের মন্ত্র ও শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করাই শিক্ষার চরম পদ্ধতি বলে গণ্য হলে সে শিক্ষা জীবনকে সংযত-সুন্দর করতে পারে না। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন, "আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি, অন্ধবিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, এবং বর্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা। তার জন্য মাদ্রাসা-শিক্ষা-পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী।' সাহিত্য-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন, "মাদ্রাসা-শিক্ষার প্রতি আমাদের মুসলমানদের অতিরিক্ত নজর থাকাতে শিক্ষা-বিষয়ে তথা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও প্রতিবেশী হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছি।" 'সাহিত্য-সমাজী'রা যখন এসব কথা বলেছিলেন তখন তাঁরা যুগের প্রয়োজনেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন।

'সাহিত্য-সমাজী'রা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন। এখানে সাম্প্রদায়িকতা অর্থে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা যেমন, তেমনি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও (এ সম্বন্ধে পরে আমরা কিছু আলোচনা করব)। তাঁরা ছিলেন জাতীয়তাবাদী। 'জাতীয়তাবাদী' শব্দটা অবশ্য পরবর্তী-কালে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটা রাজনৈতিক গালিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল: কিন্তু 'সাহিত্য-সমাজ' গঠনের সময় পর্যন্ত ভারতে জাতীয়তাবাদ অগৌরবের বিষয় ছিল না। মুসলিম লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও এবং মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা সত্ত্বেও কায়েদে আজম, মওলানা শওকত আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তখনও জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে দাঁড়াননি। কারণ, তখন দ্বিজাতি-তত্ত্বের কথা ওঠেনি এবং পাকিস্তানের দাবীও উত্থাপিত হয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হিন্দু-মুসলমান উভয়কে ব্যথিত ও

ক্রুদ্ধ করেছিল, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন এক পতাকার নীচে না হলেও এক শামিয়ানার নীচে তাদের সমবেত করেছিল। ইকবালের বিখ্যাত কওমী তারানা 'সারা জাহাঁ সে আচ্ছা হ্যায় হিন্দুস্তান হামারা' হিন্দু-মুসলমান সকলের মনেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তা-বোধের অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল। সেই সময়কার এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই সাহিত্য-সমাজীদের জাতীয়বোধকে দেখতে হবে। Be rational and national এই ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র—বুদ্ধির মুক্তিরই যা সম্প্রসারিত বিবৃতি–কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁরা রাজনীতিক ছিলেন না, সাহিত্য ও সমাজচিন্তাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

কিন্তু অন্য অর্থে—রাজনৈতিক অর্থে নয়, দৈশিক অর্থে তাঁরা মুসলমানদের মনে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন। দৈশিক জাতীয়তাবোধ বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে চিরকালই ক্ষীণ: আজও, এই স্বাধীনতা লাভের পরেও পূর্ব-পাকিস্তানীর সে বোধ, যে-মাটি থেকে সে জীবন-রস আহরণ করে সে-মাটির প্রতি তার প্রেম ও প্রীতি খুব সুস্পষ্ট ও সবল নয়। দৈশিক জাতীয়তা-বোধের এই ক্ষীণতার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছিলেন "সাহিত্য-সমাজে'র চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদ:

> "...মুসলমানদের যে চেহারাটা মনে জাগে সেটা এই যে তারা যেন 'না ঘাটকা না ঘরকা'। শত শত বৎসর তারা এদেশে আছে অথচ তাদের দৃষ্টি যেন আরবের খর্জুর বন ও পারস্যের দ্রাক্ষাকুঞ্জে নিবদ্ধ। ফলে, ভারতীয় বলে তারা নিজেদের ভাবতে পারছে না অথচ আরব-পারসীকও হতে পারছে না।... মুসলমানেরা এমনভাবে চলে যেন তারা এখানকার মুসাফির। এ হতভাগ্য 'কওম' কি এখনও ভাববে না যে বাংলা যদি তার দেশ নয়---আরব-পারস্য-আফগানিস্তান যদি তার দেশ নয়---তবে কি সে শূন্যে বাসা নির্মাণ করবে?
>
> ---"শিখা" ৪র্থ বর্ষ ১৩৩৭

'সাহিত্য-সমাজ'পন্থীদের উল্লিখিত মতামতগুলো ত্রিশ বছর আগের রক্ষণশীল সমাজকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পর্দার বিলোপ দাবী, সুদের সমর্থন, বাংলা-ভাষা-প্রীতি, চিত্রশিল্প-সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যাভিনয় সমর্থন, মাদ্রাসা-শিক্ষার সমালোচনা, সাম্প্র-দায়িকতার বিরোধিতা, কোনোটাই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিপোষক

ছিল না, এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পোষকতা যা করে না তাকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে এটাই স্বাভাবিক। সেদিনের এই সমস্যাগুলো আজ নেই, এসব ক্ষেত্রে 'সাহিত্য-সমাজপন্থীদের' ভূমিকা একদিন কেউ না কেউ পালন করতোই কিন্তু সারা দুনিয়ার সমাজ বদলে যাচ্ছে এ সম্বন্ধে তারা যে সচেতন ছিলেন, এবং নিতান্ত বাঁচবার তাগিদে এই সামাজিক বিবর্তনে তাঁদেরও ভূমিকা রয়েছে এটা যে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, এখানেই 'সাহিত্য-সমাজের' তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

॥ ৩ ॥

কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ছাড়াও গভীরতর চিন্তা তাঁরা করেছিলেন; অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তাঁরা মুসলিম চিন্তাধারার একটা মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁদের মতামতের যে আলোচনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এবার তাঁদের সর্বপ্রধান বক্তব্যটি বোঝা যাবে। কাজী আবদুল ওদুদ এক প্রবন্ধে বলেছিলেন:

> আমাদেব পূববর্তীরা ইসলামেব যে রূপ দিতে প্রযাস পেয়েছেন তা যথেষ্ট পবিচ্ছন্ন। স্পষ্টভাবেই আমাদেব সামনে গ্রহণীয়রূপে বিধৃত। ইসলাম নাবীব অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান-প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিতকলার চর্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ় কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসেব চিন্তার দ্বাবা। এই-সমস্ত কথাই আমাদের নূতন করে ভেবে দেখতে হবে, ভেবে দেখতে হবে, মুসলমান সমাজের মানুষের কর্ম ও চিন্তাব স্বাধীনতায এইভাবে যে অনেকখনি নূতন রকমের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত কবা হযেছে এতে করে কি সত্যকার কল্যাণ লাভ হয়েছে?
>
> ---বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা, "শিখা", প্রথম বর্ষ

পরে সাহিত্য-সমাজের অন্যান্য সদস্য অনুরূপ কথা বার বার বলেছিলেন। তাঁরা, বিশেষত আবুল হুসেন, ইসলামী আইনের অন্যান্য দিকেরও উল্লেখ করেছিলেন। (যেমন উত্তরাধিকার বিধি, বিবাহ ও তালাক-বিধি ইত্যাদি), কিন্তু সে-সবেরই সারাংশ ও মূল বক্তব্য উপরের উদ্ধৃত অংশ রয়েছে।

বাহ্যত মনে হতে পারে, উদ্ধৃত অংশে ইসলাম তথা কোরআন-হাদিসের মৌলিক নীতি ও আদর্শ লংঘনের অধিকার দাবী করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। মধ্যযুগে ইসলামের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতিই এই অসহিষ্ণুতা, এবং এই সমালোচনা অবরোধ-প্রথা, সুদ আদান-প্রদানে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি লক্ষ্য করে। রক্ষণশীল সমাজ এসব ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল; কিন্তু যুগধর্ম ও মুসলিম সমাজের বিবর্তন, 'সাহিত্য-সমাজে'র অনুকূলেই রায় দিয়েছে।

ওদুদ সাহেবের এই উক্তি একটি সুবিদিত ইসলামী আইন-পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তা হচ্ছে ইজতেহাদ। ইজতেহাদের অধিকার গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম জাহানে আর স্বীকার করা হয় না। বলা হয়, মুজতাহিদ হবার উপযুক্ত লোক আর জন্মাচ্ছে না—যা অবশ্য বিতর্কসাপেক্ষ। এরূপ উক্তি আলেম-সমাজের আস্থাহীনতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবেরই লক্ষণ, কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ। এসব উক্তিতে ইজতেহাদের নীতিটা বাতিল হয়ে যায় না। সৈয়দ আমির আলী এ যুগে ইজতেহাদের অধিকার পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। সাহিত্য-সমাজপন্থীরা ইসলামী আইন সংস্কারের যে দাবী বারবার জানিয়েছেন তা কিন্তু ঠিক ইজতেহাদের দাবী নয়। ইজতেহাদ একটা ধর্মীয় ব্যাপার; সাহিত্য-সমাজপন্থীরা মুসলিম আইনের সংস্কার চেয়েছিলেন, কিন্তু তা একটা জাগতিক ব্যাপার হিসাবেই চেয়েছিলেন এবং তাঁদের সব দাবীর মূলে ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'র আদর্শ।

এই বুদ্ধির মুক্তি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। সাহিত্য-সমাজের Motto ছিল "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" "শিখা"র প্রত্যেকটি সংখ্যার প্রথমেই এই কথাগুলো ছাপা হত। এই বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছিলেন; এই তাৎপর্যের ইঙ্গিত ওদুদ সাহেব থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিতেও রয়েছে। বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল হুসেন বলেছিলেন :

> হজরত বলেছেন,—'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ' (খোদার গুণাবলী লাভ করতে চেষ্টা কর)। মানুষের চরম বিকাশের প্রথম পথ হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধি—

যাতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে যুগধর্মের ইঙ্গিত অনুসারে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সহজ হয়। অতীতের কোন যুগ-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যারা বর্তমানকে অস্বীকার করে তাদের বুদ্ধি মুক্ত নয়।

----"শিখা", ১ম বর্ষ

কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে গঠিত তাঁর 'বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক গলদ' প্রবন্ধে বলেছিলেন :

বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্মশিক্ষা হতে পারে না। ধর্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির অভাবে আজকাল আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---শিখা" ১ম বর্ষ

একই প্রবন্ধে কাজী আনোয়ারুল কাদির বোধহীন ও হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অন্ধ ধর্মাচরণকে এক ধরনের পৌত্তলিকতা বলে অভিহিত করেছিলেন।* সাহিত্য-সমাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন বলেছিলেন:

আমরা চক্ষু বুঁজিয়া পরের কথা শুনিতে চাই না বা শুনিয়াই মানিয়া লইতে চাই না---আমরা চাই চোখ মেলিয়া দেখিতে, সত্যকে জীবনে প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে। আমরা কল্পনা ও ভক্তির মোহ-আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চাই না। আমরা চাই জ্ঞান-শিখা দ্বারা অসার সংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকা-মুক্ত করিয়া ভাস্বর ও দীপ্তিমান করিতে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না---আমরা চাই বর্তমান মুসলিম সমাজের বদ্ধ কুসংস্কার এবং বহুকালসঞ্চিত আবর্জনা দূর করিতে। ---দ্বিতীয় বর্ষের কার্য বিবরণী, 'শিখা',দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩৫

---

* এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিছক বাহ্যিক অনুষ্ঠান মানেই ধর্ম নয়, এই মত সাহিত্য-সমাজপন্থীরা পোষণ করতেন এবং এই কারণেই তাঁদের কেউ কেউ জনসাধারণের অবোধ্য আরবী ভাষায় খোৎবা-পাঠ অর্থহীন বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি কখনো তাঁদের প্রধান বক্তব্যে পরিণত হয়নি।

বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য আরো কিছুটা পরিষ্কার হয় জনাব আবুল ফজলের "তরুণ-আন্দোলনের গতি" শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন:

> যাঁহাদের মস্তিষ্ক সজীব, তাঁহারা নিত্য-নূতন পথের আবিষ্কার করিবেন, ইহাতে যদি অতীতের বিরুদ্ধতা হয়, তাহাতে কিছু আসিয়া-যায় না। অতীতের বিরুদ্ধতা মুসলমানের জন্য বড় ক্ষতির নয়। কিন্তু অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার জীবনে চলার পথে একটা ফুলস্টপ দেওয়াই তাহার পক্ষে মারাত্মক। অতীতকে অস্বীকার করিতে আমি বলি না। কিন্তু অতীতের দিকে ফিরিয়া যাওয়াতেই আমার আপত্তি। অতীতের কাছে যতখানি আলো পাওয়া যায় তাহা আমি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু পুরাতনের গৌরব দিয়া তাহার অন্ধকারকে নিতে আমি রাজী নই।----"শিখা", তৃতীয় বর্ষ, ১৩৩৬

অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য এসব উদ্ধৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। 'সাহিত্য-সমাজে'র লেখকদের প্রিয় ছিল রবীন্দ্র-নাথের এই বাণী: 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।' এ প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। ওদুদ সাহেব ১৩৩৩ সালে 'সাহিত্য-সমাজে'র প্রথম বছরের এক সাহিত্য-সভায় তাঁর বিখ্যাত 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে বলেছিলেন:

> আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নেই,---জগৎ যেমন এক স্থানে বসে নেই, মানুষ তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের এক স্থানে স্থির হয়ে নেই---আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদা-জাগ্রতচিত্ততার।
>
> ---"শাশ্বত বঙ্গ", ৩৯৯ পৃ:

এর কয়েক বছর পরে "শিক্ষা-সঙ্কট" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন:

> এক দিনের খাওয়ায় যেমন অন্য দিনের চলতে চায় না, এক যুগের চিন্তায়ও তেমনি অন্য যুগের চলে না।
>
> ---"শাশ্বত বঙ্গ" ২৪৭ পৃ:

"শিখা" পত্রিকায় মুসলিম সমাজের ধর্মচিন্তাকে সরাসরিভাবে বিশ্লেষণ না করে, অন্য প্রসঙ্গে সাধারণভাবে যাঁরা এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন অথবা এর পাশ ঘেঁষে গেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজী মোতাহার হোসেন এবং কবি আবদুল কাদির। কাজী মোতাহার হোসেন 'ধর্ম ও শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন:

> সংস্কৃতে স্তোত্র পাঠ করা আর আরবীতে নামাজ পড়াই নিয়ম। যার অর্থবোধ হয় না, যে কথার সহিত প্রাণের যোগ নাই, সেইসব কথায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করায় কতকটা হৃদয়-মনের তৃপ্তি হয়, তা বুঝে ওঠা কঠিন।---'শিখা", ৪র্থ বর্ষ

এর আগের বছরে আবুল ফজল এ দেশে আরবীতে খোৎবা-পাঠের সমালোচনা করেছিলেন ("শিখা", ৩য় বর্ষ); তারও আগে সৈয়দ আমির আলী তাঁর "দি স্পিরিট অব ইসলাম" গ্রন্থে আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশে আরবী ভাষায় এবাদতের রীতির সমালোচনা করেছেন, এবং মাতৃভাষায় এবাদতের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনিও এ ব্যাপারে মৌলিকতা দাবী করেননি, তৎকালীন ভারতবর্ষের তরুণ মুসলিম সমাজের একাংশের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মাতৃভাষায় খোৎবা-পাঠ এবং এবাদত সংক্রান্ত অভিমত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' গঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই এ দেশের মুসলিম সমাজে আলোচিত হয়ে আসছে। 'সাহিত্য-সমাজ'-এর অন্যান্য অভিমত এই প্রতিষ্ঠান এবং সমকালীন সমাজ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করায়, মাতৃভাষায় খোৎবা-পাঠ এবং এবাদতের প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এর আরও একটা কারণ সম্ভবত এই যে চিন্তা-জীবন এবং ব্যবহারিক জীবনই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য, ধর্মজীবন নয়।

ধর্মের জন্য মানুষ নয়. মানুষের জন্যই ধর্ম, এই মর্মে কাজী মোতাহার হোসেন অভিমত প্রকাশ করেছেন 'ধর্ম ও শিক্ষা' প্রবন্ধের আরেক স্থানে:

> সব সময় মনে রাখতে হবে, লোকহিতই ধর্মের উদ্দেশ্য; ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় অকল্যাণ হচেছ, তবে বুঝতে হবে, কোথায়ও একটা গোলমাল আছে। হয়, ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধ হয় নাই, নয়ত ধর্মের সে অংশের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বর্তমান অবস্থায় তা অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে।

'নাস্তিকের ধর্ম' ("শিখা", ৫ম বর্ষ) প্রবন্ধের শিরোনাম যে সম্ভাবনারই ইঙ্গিত বহন করুক, এতে বিভিন্ন প্রকারের ও স্তরের আস্তিক্যবাদের কথাই বেশী। এবং প্রকৃতিবাদের আবরণে তিনি এরূপ সন্তর্পণ নাস্তিক্যবাদের নৈতিক চিন্তামূলক দিকের অবতারণা করেছেন যে এই দুই প্রকার চিন্তার মধ্যে যে কোনো বিরোধ আছে তা বোঝাই যায় না।

'সাহিত্য-সমাজ'-এর সুপরিচিত কোনো অভিমতকে প্রধান বিষয় করে লিখিত কবি আবদুল কাদিরের কোনো প্রবন্ধ "শিখায়" প্রকাশিত হয়নি। এতে তাঁর প্রকাশিত একমাত্র প্রবন্ধ "লোকসঙ্গীত"। এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

> বাংলাদেশে সাধারণ ইসলাম যেভাবে প্রচারিত হয়, তাহা জনসমাজ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আলেমদের দেওয়া ইসলাম বাঙালী চাষীর জীবনে অনেকাংশে আশ্চর্য রকমে বিফলিত হইয়া গিয়াছে---শরীয়তের হুবহু প্রচলন বাংলার মাটি সহিতে পারে নাই, তাই মুসলমান চাষী সঙ্গীতাদি সম্পর্কে শরীয়তী নিষেধক উপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণবীয় লীলাবাদের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।
>
> ---"শিখা," প্রথম বর্ষ

বাংলার লোক-সঙ্গীতের আলোচনাকালে প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত এই অভিমতে লেখকের ধর্ম-সংক্রান্ত মতামতের কোনো বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় না, দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র।

বুদ্ধির মুক্তি প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির পরিমাণ একটু বেশী দেওয়া হল দু'টি কারণে : প্রথমত, এই বিতর্কমূলক বিষয়ে 'সাহিত্য-সমাজ'-পন্থীদের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁদেরই ভাষায় পাঠকদের পরিচয় হওয়া উচিত, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁদের মুখপত্র "শিখা" বা তাঁদের অধিকাংশেরই প্রবন্ধের বই অধুনা একান্তই দুর্লভ।

বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য, আশা করি, এইসব উদ্ধৃতিতে পরিষ্কার হয়েছে। বুদ্ধির মুক্তির উদ্দীপনা যে কখনো বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেনি এমন কথা বোধ হয় বলা যায় না ; স্থানকালের কথা সাহিত্য-সমাজপন্থীরা সব সময় মনে রাখতে পারেননি ; ইসলামের অংশত অকার্যকরী হয়ে যাওয়া এবং আল্লার গুণাবলী অর্জনের ব্যাপারে হজরত মোহাম্মদকেও অতিক্রমের সম্ভাবনা ইত্যাদি মর্মে কয়েকটি ; স্পষ্ট উক্তি না করাই সঙ্গত হত কিন্তু তা বলে ইসলাম বা হজরত মোহাম্মদের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাহীন ছিলেন না। বস্তুত ইসলাম ও হজরতের প্রতি শ্রদ্ধার দিক দিয়ে তাঁরা কারো পেছনে ছিলেন না, তবে তাঁদের শ্রদ্ধাটা ছিল জনসাধারণের থেকে ভিন্নধর্মী : জনসাধারণের শ্রদ্ধা যেখানে অন্ধ অনুভূতি-নির্ভর, সেখানে তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল বুদ্ধি-নির্ভর। এই তফাৎটা সে সময়ের রক্ষণশীল সমাজ বুঝতে পারেনি। তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটা দুঃসাহসিকতা ও মৌলিকতা ছিল, এবং তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা

ছিল যা সে সময়ের বুদ্ধিজীবী মহলের একটা বিরাট অংশকে স্পর্শ ও উদ্দীপিত করেছিল। তাঁদের সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এ. এফ. রহমান, ডঃ মাহমুদ হাসান এবং ডঃ মাহমুদ হোসেন (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)। ডঃ মাহমুদ হোসেন সাম্প্রতিককালে এক প্রবন্ধে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' স্থাপনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেছেন :

> ...Kazi Abdul Wadud had a daringly original mode of thinking···Mr. Abul Husain ...was a man of will and action. The man of thought and the man of action combined in 1927 to found Dacca Muslim Sahitya Samaj, which came to be regarded as a new school of thought. I was also one of them ...We preached through our writings the ideal of emancipation of intellect.
>
> It must be admitted that some young men in their enthusiasm lost balance and aroused the antagonism of the conservative. But it is also a fact that the purging flame of truth did help to destroy a number of social evils. Prejudice against music and over-adherence to the Purdah are cases in point. There were also some economic and political questions regarding interest, special concessions etc. As a matter of fact a re-valuations and a better appreciation of the meaning of revelation and religion were aimed at--not their repudiation. These fundamental questions are by no means new to the world, nor even to the Muslim world. But this was the first time such questions were openly and, perhaps. unbiasedly sought to be thrashed out in the Bengali language in the teeth of opposition from the orthodox.
>
> *The Cultural Life of Old Dacca*, 'Pakistan Quarterly', Vol. VII, No. I, Spring, 1957.

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র সঙ্গে ডঃ মাহমুদ হোসেনের যে নিবিড় পরিচয় ও সংশ্রব ছিল এই উদ্ধৃতিতে তাই প্রমাণিত হয়। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তাঁরও পূর্ণ সমর্থন ছিল; কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, পর্দা-প্রথা, সঙ্গীত-বিরোধিতা, সুদ-বিরোধিতা, ইত্যাদিকে তিনিও বড় সমস্যা বলে মনে করতেন। এই উদ্ধৃতিতে একটিমাত্র ভুল হচ্ছে 'সাহিত্য-সমাজ' গঠনের তারিখটি। 'সাহিত্য-সমাজে'র সক্রিয় সদস্য ও উৎসাহী লেখকদের মধ্যে অন্যান্য যাঁরা পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় প্রাক্তন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, রাজনীতিক ও আইনজীবী আবদুস সালাম খান, এবং শিক্ষাবিদ মোমতাজউদ্দিন আহমদ ও এ. এফ. এম. আবদুল হক।

'সাহিত্য-সমাজের' প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের পর নজরুল ইসলাম মন্তব্য করেছিলেন: "এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মৌ: আনোয়ারুল কাদিব প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর চাই না।" (প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণ, "শিখা", ১ম বর্ষ)। নজরুল এখানে আনোয়ারুল কাদিরের 'বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছিলেন।

রেনেসাঁর কয়েকটি বড় লক্ষণ 'সাহিত্য-সমাজে'র মধ্যে বর্তমান ছিল; অন্ধ-অনুবর্তিতা বর্জন, জ্ঞান-পিপাসা, যুক্তিবাদিতা, পৃথিবীর মানস-সম্পদ আহরণ করে জাতির জীবনকে সমৃদ্ধ করা, ললিতকলার চর্চা করে জীবনকে সুন্দর করা, এসবেরই প্রেরণা দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে। এই প্রেরণায় তাঁরা অনেক দুঃসাহসিক উক্তি করেছিলেন। চতুর্থ বর্ষের "শিখায়" "সম্পাদকের কথা" শীর্ষক আলোচনায় সম্পাদক বলেছিলেন:

> চিন্তা-রাজ্যের কাপুরুষতা সমাজে যত শীঘ্র দূর হয় এই 'সাহিত্য-সমাজী'গণ তাহাই কামনা করেন। এই সমাজের সভ্যগণ ইহা লইয়া যেন গৌরব করিতে পারেন যে, সস্তায় লোকবরেণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা ইঁহাদের কাহারও নাই।

সে গৌরব 'সাহিত্য-সমাজীরা' করতে পারেন। সাধারণত: গতানুগতিক চিন্তাধারায়ই বাঙ্গালী মুসলিম-সমাজ চিরদিন অভ্যস্ত। এই অভ্যাসের বদ্ধ জলাভূমিতে 'সাহিত্য-সমাজ' ছিল উদ্দাম ঝঞ্ঝা; অতএব, তরঙ্গ সেদিন অনিবার্যভাবেই জেগেছিল। এককভাবে দু-একটি দুঃসাহসিক উক্তি এ শতাব্দীতে আরও মুসলিম লেখক করেছেন, কিন্তু সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে

কতকগুলি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দু:সাহসিক চিন্তা সাহিত্য-সমাজের লেখকেরাই করেছেন। এই কারণে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাধারার ইতিহাসে তাঁদের জন্য একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে।

॥ ৪ ॥

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে 'সাহিত্য-সমাজে'র অভিমতের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া সঙ্গত বলে মনে হয়। এর সদস্যরা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন, তবে তাঁরা প্রধানত স্ব-সমাজের সাম্প্রদায়িকতারই সমালোচনা করেছেন। বিশেষত: আবুল হুসেন হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতায় নিরাশ না হয়ে হিন্দু-অসাম্প্রদায়িকতার উপর বোধ হয় একটু বেশী আস্থা স্থাপন করেছিলেন।* এ ব্যাপারে তিনি যতটা স্বাপ্নিক আদর্শবাদী ছিলেন, ততটা বাস্তববাদী ছিলেন না। এইসব কারণে সে সময়ে কারো কারো ধারণা হয়েছিল যে সাহিত্য-সমাজের সদস্যরা হিন্দু-ঘেঁষা। কথাটা কতখানি ঠিক বলা কঠিন; ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কেউ সে-রকম ছিলেন কিনা তা সমকালীনদের পক্ষেই বলা সম্ভব; "শিখা"-তে যতটা দেখা যায়, তাঁরা হিন্দু-ঘেঁষা ছিলেন বলে নয়, আত্মনিরীক্ষা তাঁদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে এবং স্ব-সমাজের ত্রুটি সম্পর্কে অচেতন অথবা নীরব থেকে শুধু অন্য সমাজের ত্রুটি-নির্দেশেই সমস্যার সমাধান হয় না এই কারণে তাঁরা স্ব-সমাজের সাম্প্রদায়িকতার প্রতিই প্রধানত: দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রতিবেশী সমাজের সাম্প্রদায়িকতাকে তাঁরা ক্ষমার চক্ষে দেখেছেন--সাহিত্যে, সমাজে অথবা রাজনীতিতে। সাহিত্য-সমাজ গঠনের প্রথম বছরেই কাজী আবদুল ওদুদ 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন।

> বাংলা সহিত্য আজ জগতের দৃষ্টি একটুখানি আকর্ষণ করতে পেরেছে এবং তাতে এর সত্যকার অধিকার আছে। কিন্তু তবু সত্যের অনুরোধে সাহিত্যরসিকদের নিশ্চয়ই বলতে হবে এ সাহিত্য খুব বেশী পরিমাণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য; মানুষের দু:খ ও আনন্দের প্রকাশের চাইতে হিন্দুর বিশেষ দু:খ ও বিশেষ আনন্দ চর্চাই এতে বেশী। "বাংলার মুসলমানকে মুসলমান হতে হবে" এ হচ্ছে অনেক পরিমাণে মুসলমানের অন্তরে বাংলা সাহিত্যের হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়া। -- --বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর যে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকখানি অস্বাভাবিক রকমে

---

* 'আমাদের রাজনীতি,' "শিখা", ৫ম বর্ষ।

> হিন্দু, অর্থাৎ বিশ্বের আঙিনার এক পাশে তার বিশেষ রুচি ও বিশেষ দুঃখ নিয়ে ফুটে উঠে যে হিন্দু জগতের সঙ্গে তার অবস্থার মোকাবেলা করতে চাচ্ছে সে হিন্দু নয়, কিন্তু বিশ্বের মানবযাত্রীদের পাশ কাটিয়ে তার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কূটতর্কে সময় কাটাচ্ছে যে হিন্দু সেই হিন্দু। --"শিখা", ১ম বর্ষ

সাহিত্য এবং বাস্তব ক্ষেত্রে অনুরূপ মানসিকতার আরও সমালোচনা "শাশ্বত বঙ্গ" গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ করেছেন।

এরূপ সমালোচনায় তিনি একক ছিলেন না। কাজী আনোয়ারুল কাদির তাঁর "আমাদের দুঃখ" নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে (প্রকাশিত ১৯৩৬)সংকলিত 'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যকে মোটের উপর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য বলে বর্ণনা করেছেন। ঐ পুস্তকে সংকলিত 'নেতাদের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হিন্দু চিন্তানায়কদের সাম্প্রদায়িকতার সমালোচনা করেন। স্যার পি.সি. রায় একবার এক প্রবন্ধে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, দেশের অনেক হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে। তাঁর এই উক্তির সমালোচনা করে কাজী আনোয়ারুল কাদির তাঁর প্রবন্ধে বলেন:

> সম্প্রদায়-বিশেষের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং গোটা ভারতবর্ষের সর্বনাশ হওয়া এই দু'টো জিনিস যে এক এ মনে করা আমাদের দেশের একটা মস্ত ভুল।

একই প্রসঙ্গে কিছু পরে তিনি বলেছেন:

> স্যার পি. সি. রায় তাঁর এই প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের মঙ্গলকে দেশের মঙ্গল বলতে চান। এ সম্বন্ধে ভারতবাসীকে নতুন করে ভাবতে হবে। দেশের মঙ্গল অর্থে দশের মঙ্গল বুঝতে হবে। দশ মানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান সব।

সাম্প্রদায়িকতা-প্রসঙ্গে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর কোনো বিশিষ্ট সদস্য নন এবং "শিখার" কোনো বিশিষ্ট লেখক নন এমন একজন প্রবন্ধকারের একটি প্রবন্ধ একালে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। লেখকের নাম (অধ্যাপক) নাজিরউদ্দিন আহমদ, প্রবন্ধের শিরোনাম "স্বাধীন ভারতের দাস", "শিখা"র পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত (১৩৩৮)। প্রবন্ধটির কিছু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি:

> স্বাধীন ভারতের দাস, কথাটা শুনিয়া অনেকেই হয়ত চিন্তা করিবেন এই পরস্পর-বিরোধী কথার অর্থ কি? কিন্তু স্বাধীনতা ও দাসত্ব এ দুইয়ের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। কত উন্নত স্বাধীন জাতির গৌরবের ইতিহাসের পশ্চাতে কত না নিপীড়িতের ক্রন্দন।----স্বনিয়ন্ত্রিত ভারতে মুসলমানের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে। পুরুষানুক্রমে হিন্দুসমাজ মুসলমান

বিদ্বেষকে তাহার রাজনৈতিক জীবনের এক মূলমন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক ভাষায় মুসলিম-বিদ্বেষী এক-একটা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মুসলিম-বিদ্বেষ হিন্দুর জাতীয়তার আদর্শেও প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতের যে জাতীয়তার আদর্শ হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হিন্দু-জাতীয়তা; তাহাতে স্বতন্ত্র সত্ত্বা-বিশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের স্থান নাই।

তাই মনে হইতেছে যদিও ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইতেছে তথাপি সমস্ত ভারতবাসীর জন্য তাহা সত্য হইবে কিনা সন্দেহ। সাত কোটি মুসলমানের ভবিষ্যৎ ২৬ কোটির সহিত নির্মম প্রতিযোগিতায় কি হইবে স্থির করিতে বেশী চিন্তা করিতে হয় না। জানি না মুসলমান সমাজের অন্তর্নিহিত কোন অসাধারণ প্রতিভা এ বিপদের হাত হইতে তাহাকে ত্রাণ করিতে পারিবে কি না।

তাৎপর্যপূর্ণ কথা এই যে এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে, পাকিস্তান পরিকল্পনা যার অনেক পরের ঘটনা; এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণ কথা হচ্ছে এ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল "শিখা" পত্রিকায়।

॥ ৫ ॥

"শিখা" পত্রিকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' চিন্তাধারা যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় দেওয়াই এ আলোচার প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁদের রচিত সমগ্র সাহিত্যের নয়; তবে, তাঁদের সাহিত্য-কৃতির কিছুটা উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, তাঁরা ছিলেন মূলত: সমাজ-চিন্তক। ধর্মীয় বিষয় নিয়েও তারা চিন্তা করেছিলেন কিন্তু এদেশে প্রচলিত যে সব ধর্মীয় বিধান ও সেগুলোর ব্যাখ্যার সঙ্গে মুসলিম সমাজ ও মুসলিম চিন্তাধারার প্রগতির প্রশ্ন জড়িত ছিল প্রধানত: সেগুলোই ছিল তাঁদের চিন্তার লক্ষ্যীভূত। এই প্রসঙ্গে তাঁরা চিন্তার স্বাধীনতা ও ক্রমবিকাশমানতার উপর জোর দিয়েছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁরা আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু সাহিত্য-সমাজের স্থিতিকালের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কদির, এবং মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছাড়া আর কারো রচনায় বিশুদ্ধ সাহিত্য-চিন্তা বা সাহিত্য-সমালোচনা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁরা আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের এই বিভিন্নমুখী চিন্তার বাহন ছিল প্রবন্ধ: সৃষ্টি-মূলক সাহিত্য নয় বা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নয়। গল্প-উপন্যাস-কবিতা

তাঁরা তুলনামূলকভাবে কম, লিখেছিলেন, নাটক আবুল ফজল ছাড়া আর কেউ লেখেননি। প্রধানত: এই কারণেই তাঁদের প্রভাব ততটা ব্যাপক হয়নি যতটা হওয়া উচিত ছিল। 'আপত্তিকর' চিন্তাধারা নজরুলের এবং এবং "কল্লোল"-চিহ্নিত সাহিত্যিকদের রচনায় কম ছিল না, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের সজীবতায় ও প্রাণময়তায় সমস্ত আপত্তির প্রশ্নই চাপা পড়ে গেছে।

কিন্তু প্রবন্ধ-সাহিত্য সাহিত্যেও এবং এদেশে এখনো যথেষ্ট সমাদৃত না হলেও মূল্যবান ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্য। জাতির মননশীলতা ও চিন্তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় প্রবন্ধ-সাহিত্যেই, এবং এদিক দিয়ে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের' লেখক-দের রচনাবলী বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তাঁদের আলোচিত বহু সমস্যা আজ আর সমস্যা নয়, বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলো একালে অবান্তর, তবু তাঁদের বহু রচনার আজও সাহিত্য-মূল্য আছে, এবং আছে ঐতিহাসিক মূল্য। স.হিত্য-সমাজের আগে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে যুক্তিবাদিতাব পরিচয় বেশী পাওয়া যায় না, এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন তো কোনো দিনই হয়নি। যুক্তিবাদিতা কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্য-সংস্থারই জীবনদর্শন হয়ে ওঠেনি। এ ব্যাপারে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজই' পথ-প্রদর্শক। কিন্তু তাঁদের রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের একালের সমাজ বিশেষ পরিচিত নয়। এর কারণ অনেকেরই প্রবন্ধ সংকলতি হযনি বা যা সংকলিত হয়েছিল এখন আর তা পাওয়া যায় না। এঁদের অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলো কখনো সংকলিত ও প্রকাশিত হলে দেখা যাবে সাহিত্য ও সমাজ, সংস্কৃতি ও ললিত-কলা সম্বন্ধে কত সচল ও সদাজাগ্রত ছিল তাঁদের চিত্ত, কতখানি যুক্তিনিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে তাঁরা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। এ শতাব্দীর বাঙ্গালী মুসলিম-সমাজের চিন্তার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য পাওয়া যাবে তাঁদের প্রবন্ধাবলীতে, কিন্তু সে ঐশ্বর্যকে তাঁদের সমকালীন সমাজ সর্বান্ত:করণে গ্রহণ করেনি, এবং সে ঐশ্বর্যের সঙ্গে একালের সমাজও বিশেষ সুপরিচিত নয়।

পাকিস্তানী সংস্কৃতির তাৎপর্য

এ-দেশের সংস্কৃতি-আলোচনায় অনেক সময় শিথিলভাবে এ-রকম একটা ধারণা-সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যে, পাকিস্তানের সংস্কৃতি সর্বাত্মকভাবে ইসলামী বৈশিষ্ট্যেই বিশিষ্ট, এবং ভবিষ্যতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তাও হবে ইসলামী সংস্কৃতি। পাকিস্তানের সংস্কৃতি যে সর্বাত্মকভাবে ইসলামী সংস্কৃতি নয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু ভবিষ্যতের সংস্কৃতি সর্বাত্মকভাবে ইসলামী সংস্কৃতি হবে কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন। অনেকে বলেন, পাকিস্তানের সংস্কৃতি সর্বাত্মকভাবে ইসলামী সংস্কৃতিই হবে, কেননা পাকিস্তান একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, তার শাসন-সংবিধানেও সেই কথা বলা হয়েছে, এবং ইসলামী আদর্শ রূপায়ণের জন্যই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা।

এ-বিষয়ে বোধহয় দ্বিমতের অবকাশ নেই যে পাকিস্তানে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ সাধন মুসলমানদের একটা বিশেষ দায়িত্ব। এ-দায়িত্ব উপলব্ধির নির্ভুল প্রমাণ আমরা স্বাধীনতা লাভের পর যথেষ্টই পেয়েছি। ইসলাম আমাদের এবং সেই সঙ্গে বিশ্বমানবকে এমন কতকগুলি মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধ দিয়েছে, যে জন্য আমরা সঙ্গতভাবে গর্ববোধ করতে পারি। সেইসব মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধ—যেমন তাওহিদ, মুসলিম সামাজিক সাম্য, গণতন্ত্র, মানবতাবোধ, নারীর মর্যাদা—এ দেশের মুসলিম সমাজ-জীবনে পূর্ণভাবে রূপায়িত হলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে না; এবং এর প্রভাব অন্য সমাজের পক্ষে অকল্যাণজনক হবে তাও মনে হয় না, অন্তত আমাদের মনে হয় না। পরাধীন আমলে কতকটা বাইরের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে, এবং কতকটা আমাদের নিজেদেরও দোষে ক্লাসিক্যাল ইসলামী সংস্কৃতি এবং ইসলামী মূল্যবোধগুলি থেকে আমরা অনেক দূরে সরে পড়েছি। সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ললিতকলার ক্ষেত্রে মুসলমানেরা একদিন উন্নতির সুউচ্চ শিখরে

উন্নীত হয়েছিল, পশ্চিমী দেশগুলি আজ তার প্রশংসা করছে এবং তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছে, অথচ আমরা অবনতির নিম্নতম স্তরে। এইসব চিন্তা-ভাবনা ইসলামী সংস্কৃতির জন্য মুসলমানদের মধ্যে একটা আবেগময় উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। স্বাধীনতার যুগে, অনুকূল রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরিবেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ-সাধন তাই মুসলমান তার একটা বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইসলামী সংস্কৃতি এবং পাকিস্তানী সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ একার্থবোধক হতে হবে। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ-প্রদেশের যাত্রা, কবি-গান, লোকগাথা, লোকগীতি, হস্তশিল্প, নৃত্যকলা, নাট্যমঞ্চ, সাহিত্য এবং এমনি আরও অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়গুলি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের প্রায় একাধিপত্য রয়েছে, যেমন যাত্রায়, সাঁওতালী নৃত্যে, মনিপুরী নৃত্যে। এ-সব ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অবদান অস্বীকার করা সম্ভব নয়, এবং ভবিষ্যতেও যে তাদের এইসব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চলবে না এবং তারা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

পূর্ব-পাকিস্তানের এই সংখ্যালঘু-সংস্কৃতিকে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে পারি না, এবং এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উপরও আমরা জোর করে ইসলামী সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে পারি না। আমরা তাদের বলতে পারি না, 'আমরা যেমন ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তুলছি তেমনি আপনারাও ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তুলুন এবং আপনাদের এতদিনকার অনৈসলামিক সংস্কৃতি বর্জন করুন।" এই সাংস্কৃতিক জবরদস্তি যদি সম্ভব না হয় তবে পূর্ব-পাকিস্তানে এতদিন যেমন অনৈসলামিক সংস্কৃতি ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে, এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সংখ্যালঘু সংস্কৃতির যে সামগ্রিক যোগফল তাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির চেহা-রাটা পুরোপুরি ইসলামানুগ হবে না, তা বলাই বাহুল্য। রোমান্টিক কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং যুক্তি ও বাস্তব-জ্ঞান বর্জন করা সব যুগের সব দেশের মানুষেরই একটা বড় দুর্বলতা। একমাত্র এই রকম কল্পনার কাছে পুরোপুরি

আত্ম-সমর্পণ করলে তবেই ভুলে থাকা সম্ভব যে পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে; এবং এই কারণে এ-প্রদেশের সংস্কৃতি পুরোপুরি ইসলামী সংস্কৃতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আরও একটা বড় কারণ আছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কথা বাদ দিয়ে যদি কেবল মুসলমানদের কথা ধরা যায়, তবু এমন কথা বলা যায় না যে সব মুসলমানকেই বিশুদ্ধ ইসলামী আদর্শে সংস্কৃতিমূলক কাজ করে যেতে হবে। মুসলমান সর্বদা পিউরিটানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তোলেনি, ভবিষ্যতেও তুলবে না, কারণ সেটা সম্ভব নয়। পল্লীগীতি বা বাউল-সঙ্গীত, লোকগাথা বা আধুনিক সাহিত্য, কোনোটাই বিশুদ্ধ ইসলামী বস্তু নয়, এমনকি এসবের মধ্যে বে-শরা অনৈসলামিক জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে মিশে রয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি বলতে হবে যে এগুলি পূর্ব-পাকিস্তানী সংস্কৃতির অঙ্গীভূত নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত? এবং এছাড়া আরও বিস্তর ক্রিয়া রয়েছে যার সঙ্গে ইসলামের পুরোপুরি সামঞ্জস্য হয় না। যেমন নৃত্যকলা। মরহুম বুলবুল চৌধুরী তাঁর নৃত্য-উদ্ভাবনীগুলির মধ্য দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতির রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু নৃত্যকলা ক্ল্যাসিক্যাল ইসলাম-অনুমোদিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়। নাট্যমঞ্চও ক্লাসিক্যাল ইসলামী সংস্কৃতির বহির্ভূত সাংস্কৃতিক উদ্যম। মধ্যযুগের মুসলমানেরা গ্রীকদের কাছ থেকে দর্শন বিজ্ঞান সব-কিছুই নিয়েছিল, কিন্তু নেয়নি নাটক। তা বলে আমরা নাট্যমঞ্চ বর্জন করতে যাচ্ছি না। তারপর চিত্রকলা। ইসলাম চিত্রকলাকে অনুমোদন করেনি, এব বিবোধিতাই করেছে। এসব আমাদের নায়েবে-নবীদেরই কথা। (মাত্র দু'একজন অন্যরূপ বলেন) কয়েক বছর আগে একজন বিশিষ্ট আলেম তাঁর নিজের ফটো পর্যন্ত নিতে আপত্তি করেছিলেন। কায়েদে আজমের ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখতে বা বই-পত্রিকায় ছাপতে আলেম সমাজের আপত্তি না থাকলেও, পাকিস্তানী নোটে তাঁব প্রতিকৃতি ছাপতে আপত্তি উঠেছিল। চিত্রকলার প্রতি এই বিরূপতার জন্যই মধ্যযুগের গোড়া ধর্মবাদীরা এ্যারাবেস্ক ছাড়া আর কোনো চিত্রপদ্ধতি সমর্থন করেননি। সে-যুগের ইরানী পুঁথিচিত্রণ এবং মোগল চিত্রকলা এই ধর্মবাদীদের উপেক্ষা করেই গড়ে উঠেছিল। এই চিত্রকলাকে কি বলা হবে? ইসলামী? আমি ইরানী পুঁথিচিত্রণের মধ্যে হজরত মোহাম্মদের চিত্র দেখেছি। তা ছাড়া বর্তমান যুগের কোনো কোনো শিল্পীর কতকগুলি চিত্র, যেমন জুবায়দা

আগার "যৌবন", কামরুল হাসানের নগ্ন "স্নানার্থিনী", এগুলিকে কোনো মতেই বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। চিত্রকলার প্রতি ইসলামের বিরূপতার অন্যতম ফল হিসাবে মুসলিম শিল্পীরা চিরদিনই ভাস্কর্যশিল্পকে উপেক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু ধর্মবাদীদের প্রভাব-মুক্তির যে-সব লক্ষণ গত কয়েক শতাব্দীতে লক্ষ্য করা গেছে তার যদি কোনো তাৎপর্য্য থাকে তবে অনায়াসেই বলা চলে, ভাস্কর্য-শিল্পও চিরদিন পূর্ব-পাকিস্তানী শিল্পী ও জনসাধারণের কাছে অনাদৃত থাকবে না। *

এইভাবে চিত্রে ও নৃত্যে, সঙ্গীতে ও সাহিত্যে এবং সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপের আরও বহুবিধ ক্ষেত্রে মুসলিম শিল্পী-সাহিত্যিকরা এমন অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা ইসলামী বস্তু নয়, যার সঙ্গে ধর্মের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই, এমনকি যা কখনো কখনো অনৈসলামিক। অতীতে এরূপ ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে এবং ঘটাই স্বাভাবিক। এই মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সংখ্যালঘু সংস্কৃতি যোগ করে যে সামগ্রিক সংস্কৃতি, তাই পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি এবং তা পাকিস্তানেরও সংস্কৃতি। পশ্চিম-পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জানি না; কিন্তু বিশ্বাস করি সেখানকার সংস্কৃতিও পুরোপুরি ইসলামানুগ নয়। সেখানকার (এবং এখানকার) পরিচ্ছদরীতি, যেমন শালওয়ার টুপী পাগড়ী মূলতঃ আরব থেকে আমদানী হয়নি, হয়েছিল মধ্য-এশিয়া থেকে; (শাড়ী সম্পূর্ণ বাঙ্গালী তথা ভারতীয় বস্তু) সেখানকার খটক নৃত্য বা লুড্ডি নৃত্যকেও ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী সংস্কৃতির অনুমোদিত অনুষ্ঠান বলা যায় না। তাই বলে সংস্কৃতির এই বহিরঙ্গগুলিকে অপাকিস্তানী বলে বাতিল করতে কেউ বলছেন না।

পাকিস্তানী সংস্কৃতিতে "অনৈসলামিক" বস্তুর পরিমাণ কম নয়, সংখ্যালঘু-সংস্কৃতি এর মধ্যে ধরা হোক বা না হোক। এই "অনৈসলামিক" সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে যদি আমরা বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতিকেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি বলি তবে আমাদের সংস্কৃতির অনেক-কিছু, এমনকি হয়তো অধিকাংশই বাদ দিতে হবে এবং সে দাবী হবে যেমন অযৌক্তিক, তেমনি অবাস্তব। কেবল অতীত বা বর্তমান সম্বন্ধে নয়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সেই কথা। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি থাকবে, থাকা অনিবার্য এবং জীবনের বহু ক্ষেত্রেই

* সম্প্রতি সরকারী আর্ট কলেজে ভাস্কর্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।
(পাদটীকা ১৯৬৮)

তার প্রভাব পড়বে. কিন্তু বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতিই আমাদেব সব কথা এবং শেষ কথা হবে না, যেমন এতদিন হয়নি। পিউরিটানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অতীতের মুসলমানেরা বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি গড়তে পারেননি, ভবিষ্যতেও সেটা সম্ভব হবে না। এই কারণে যে, সংস্কৃতির সব-কিছুই ইসলাম বা আর কোনো ধর্মেরই চতুঃসীমার মধ্যে পড়ে না, এবং এক্ষেত্রে এমন অনেক-কিছু আছে—যেমন নৃত্য, চিত্রকলা এমনকি সঙ্গীত—যা ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করেই গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও তা হবে এবং হবে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে। অতীত এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতা সেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। শুনতে কারো কারো অপ্রীতিকর মনে হলেও এবং হৃদয়ে বেদনার অনুভূতি জাগলেও বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এই যে, আজ পর্যন্ত খৃস্টান, হিন্দু বা মুসলমান যে সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছে, তা অনেকাংশে ধর্মবাদীদের ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা বা লঙ্ঘন করেই সম্ভব হয়েছে। ধর্মীয় ব্যাখ্যার চতুঃসীমার মধ্যে তারা যদি তাদের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করে রাখত তাহলে তারা, এবং সেই সঙ্গে সারা বিশ্ব, সংস্কৃতির দিক দিয়ে অনেক দরিদ্র থেকে যেত, যেমন দরিদ্র থেকে যেত বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে।

স্বাধীনতার আমলে পাকিস্তানের অধিবাসীদের সামনে আজ নূতন নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হচ্ছে। তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং বিদেশের মানুষও এদেশে আসছে। এই আন্তর্জাতিক সংযোগের ফলে এদেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, দর্শন এবং সমাজের ক্ষেত্রে বিচিত্র রকমের প্রভাব পড়ছে, ভবিষ্যতেও পড়বে। এর মধ্যে কিছু কিছু মন্দ জিনিস হয়ত থাকবে, কিন্তু ভাল জিনিসও থাকবে। অতীতে সংস্কৃতির যেমন রূপান্তর হয়েছে ভবিষ্যতেও তেমনি হবে। বিশুদ্ধ ধর্মীয় ব্যাখ্যার নির্দিষ্ট পথে এ-রূপান্তর ঘটেনি এবং ঘটবে না। এই কারণেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির কথা বলা অবাস্তব রোমান্টিকতা মাত্র।

আমাদের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তা হবে জাতিভিত্তিক, তার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধান হতে পারে, অপ্রধানও হতে পারে। সে সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক এবং জাতীয় জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করলেই খুশী হব, সেটাই হবে তার বিচারের মানদণ্ড। পিউরিটানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গেলে এবং তার বিচার করতে গেলে

আমাদের অনেক-কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে হবে। আমরা শুধু এইটুকু নিম্নতম শর্ত দিতে পারি যে আমাদের সংস্কৃতি যেন রাষ্ট্র-বিরোধী না হয় এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার না করে। এই শর্তটুকু পালিত হলে সে সংস্কৃতি গোঁড়া ধর্মবাদীদের ব্যাখ্যা মাফিক বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি হল কি না, তা আমরা দেখতে যাব না।

১৯৫৮

চিন্তার অগ্রসরণ

এ যুগেও এমন লোক প্রচুর আছেন যাঁরা মনে করেন, মানুষের ইতিহাসে তাঁদের অনুসৃত মতটাই চূড়ান্ত কথা এবং শেষ কথা, এর পরে বা এর বাইরে মানুষের চিন্তা করার আর কিছুই নেই। অশিক্ষিত বা সাধারণ শিক্ষিত মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি একথা বলছি না; কেননা তাদের দিক থেকে দেখতে গেলে কথাটার কিছুমাত্র মূল্য নেই। আমি তাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলছি যাঁরা সুশিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবী, যাঁরা অসাধারণ না হলেও সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের মাঝখানে খানিকটা অসাধারণ।

মানুষ যতোই শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত, মুক্তবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদী হোক, অনেকের মনের একটা অংশ বোধ হয় প্রকৃতিগতভাবেই রক্ষণশীল থেকে যায়। সেই অংশটা কিছুতেই কোনো একটা প্রত্যয়কে হৃদয়াবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না এবং চায়-ও না। সেটাই তার অবলম্বন এবং সেই অবলম্বনকে নিয়ে সে দৃঢ় থাকতে চায়। নইলে অত্যন্ত মুক্তবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদী মানুষও কি করে বলতে পারে যে তার অনুসৃত মতটাই মানুষের ইতিহাসে চূড়ান্ত এবং শেষ কথা?

এ রকমটি হয় যখন প্রত্যয়-বিশেষের সঙ্গে হৃদয়বেগ এসে যোগ দেয়। যতক্ষণ শুধু প্রত্যয় থাকে ততক্ষণ নূতন অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণ আলোকে সে-প্রত্যয় অন্ধকারের মতোই বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে, এবং বিদীর্ণ যখন হয় তখন আক্ষেপের কোনো কারণ থাকে না, তখন বরং মুক্তির এবং নব আবিষ্কারের আনন্দই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যয়ের সঙ্গে থাকুক আর এমনি থাকুক, হৃদয়াবেগকে

সিংহাসনচ্যুত করা কঠিন। হাজারো অপদার্থ, হাজারো ত্রুটিময় হলেও প্রিয়জন এবং প্রেয় বস্তু হৃদয় থেকে বিদায় নিতে চায় না। এখানে যুক্তির একাধিপত্য অচল। সেই হৃদয়াবেগ যুক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে অপরাজেয় হয়ে ওঠে। মত-বিশেষকে অনুসরণের ক্ষেত্রেও যখন প্রত্যয় বর্তমান থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকে হৃদয়াবেগ, তখন সে মতকে একান্ত রক্ষণশীল মন নিয়ে সমর্থন করে চলেন মুক্তবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদী মানুষ।

যাঁরা যুক্তিবাদী, তাঁরা অন্যতর বা শ্রেষ্ঠতর যুক্তি পেলেও প্রত্যয়ের পরিবর্তন যদি না করেন, তাহলে তাঁরা কি করে যুক্তিবাদী আখ্যা পেতে পারেন? তাঁদেরকে তাহলে মুক্তবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদী শ্রেণী থেকে বাদ দিয়ে কথা বলাই ভালো।

কিন্তু তবু তাঁরা মুক্তবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদী সমস্ত ক্ষেত্রেই, এমন কি তাঁদের প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও, তবে সমস্ত যুক্তির শেষে তাঁরা ফিরে আসেন এবং ফিরে আসতেও চান তাঁদের নিজেদের প্রত্যয়েই। অবশ্য এরকম অনেক সময় হয় যে এক প্রত্যয় থেকে আরেক প্রত্যয় যাওয়ার মতো শ্রেষ্ঠতর যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ রকমও কম ঘটে না যে, শ্রেষ্ঠতর যুক্তি পাওয়া গেলেও তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ যুক্তি মানুষ উদ্ভাবন করতে চায় তার নিজের প্রত্যয়ে অটল থাকার জন্য। এই উদ্ভাবন-প্রয়াসের মূলে ক্রিয়াশীল আসলে হৃদয়াবেগ। হৃদয়াবেগ তখন যুক্তিবাদীর ছদ্মাবরণে বলিষ্ঠতর যুক্তি উদ্ভাবনে ব্রতী হয়। এটাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। হৃদয়াবেগ তখন বর্মের মতো ঘিরে থাকে প্রত্যয়কে, পঞ্জরাস্থি যেমন ঘিরে থাকে হৃদয়কে। এইখানে মানুষ রক্ষণশীল। এখানে তার আশ্রয়ও। কেননা ক্ষণে ক্ষণে যদি প্রত্যয়ের পরিবর্তন হয়, তাহলে বাস্তবিকই প্রত্যয় বলে কিছু থাকতে পারে না, জীবন অনিশ্চিত, নিরালম্ব, বিস্বাদ, অসহনীয় হয়ে ওঠে। এবং, প্রত্যয় ও হৃদয়াবেগ যেখানে নেই মানুষ সেখানে একান্ত দুর্বল ও অসহায়।

তবু একটি কথা সব সময় মনে রাখা দরকার। প্রত্যয় মানুষের ইতিহাসে নূতন নয়, এবং প্রত্যয়ের পরিবর্তনও নূতন কথা নয়। আজকের মতো অতীতেও মানুষের হৃদয়ে হাজারো রকমের প্রত্যয়

বাসা বেঁধেছে, কিন্তু অনেক প্রত্যয়কেই অশ্রুজলের মধ্যে একদিন বিদায় দিতে হয়েছে। অশ্রু এবং হৃদয়াবেগ তাকে পথরোধ করতে পারেনি। এর ফল মানুষের জীবনে শেষ পর্যন্ত এবং সব সময়েই খারাপ হয়েছে তা নয় বরং এভাবেই তার অগ্রগতি সূচিত হয়েছে।

এটা মনে করাই তাই সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রগতিশীল মনের পরিচয় হওয়া উচিত যে, ইতিহাস যখন সর্বদাই গতিশীল, তখন কোনো প্রত্যয়, মত বা আদর্শই চিরদিনের জন্য নয়, এবং চিরদিনের নয় বলে যদি কখনো প্রমাণিত হয় তাহলে তাতে আক্ষেপ করার কিছুই নেই। আজকের প্রত্যয়, মত বা আদর্শ তার ভূমিকা পালন করুক, কিন্তু ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠতর প্রত্যয়, মত বা আদর্শের জন্যও পথ খোলা থাক। ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠতর মত বা আদর্শের কাছে যদি আজকের মত ও আদর্শের পরাজয় ঘটে, তবে সে পরাজয় লজ্জার নয়, বিষাদের নয়, আনন্দের। অতীতের অনেক চিন্তা এবং সে চিন্তাজাত প্রত্যয়, মত ও আদর্শকে আজ আমরা আদিম, অর্ধ-আদিম বা মধ্যযুগীয় মনে করে থাকি। ভবিষ্যতে যদি এমন দিন আসে, যেদিন আমাদের আজকের চিন্তাও তেমনি মনে হবে, তাহলে সে দিনটি মানুষের বিজয়ের পরিচয়ই বহন করবে, পরাজয়ের নয়। সেদিনের আনন্দ ও গৌরবের অংশ আমরা না পেতে পারি, তবু অন্তত সেদিনের স্বাপ্নিক হিসেবে পরিচয় দিতে আমরা যেন লজ্জাবোধ না করি।

১৯৫৪

মনোবৃত্তির দিক দিয়ে মানুষের প্রগতি না পশ্চাদ্‌গতি হয়েছে তা তর্কসাপেক্ষ এই সাম্রাজ্যবাদ, পারমাণবিক বোমা, কালোবাজার, হিংস্র দাঙ্গার দিনে। মানব-প্রকৃতির এরূপ ভীষণতা, এরূপ রক্তলোলুপতা আমরা এক সময় কল্পনাও করতে পারতাম না।

তবু আরেক দিক দিয়ে, বিস্তৃততব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে বোঝা যায় মানুষ প্রগতির পথেই অগ্রসর হচ্ছে। গেল দু-এক শতাব্দী বিচার করলে হয়ত স্পষ্ট বোঝা যাবে না: দু-হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার বছর আগে মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন্ স্তরে ছিল আর আজ কোন্ স্তরে পেঁীছেছে তা বিচার করে দেখলেই প্রগতির রূপ স্পষ্টতর হয়।

প্রকৃতির ক্ষমতাকে মানুষ করায়ত্ত করে চলেছে, পৃথিবীর ওপর এতিম হয়ে বেঁচে থাকতে সে চায় না। প্রকৃতির বিমাতা-সুলভ ঔদাসিন্যকে, কঠোরতাকে, অন্ধ ক্রূরপনাকে পরিচারিকার বিশ্বস্ততায় পরিণত করার তার সাধনা, অসম্পূর্ণ হলেও আজ অনেক দূর অগ্রসর। সাগর, ঝঞ্ঝা, মেঘ, সূর্য...প্রথমে দেবত্ব, পরে অন্ধশক্তির ভীষণতা থেকে মুক্ত হয়ে আজ বহুলাংশে ভৃত্যে পরিণত। দেশ আর কাল আজ প্রতি মুহূর্তে সংকোচমান: এই অবিরাম সংকোচের শেষ অবস্থা এখনো অকল্পিত। আদিম মনের বিস্ময় কাটার পরের উপলব্ধি সর্ববস্তুভূত, আত্মার মতো সঞ্চারিত একটা শক্তির। আধুনিক কালে বিশ্ব-জগৎ-সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার, প্রকৃতির শক্তিগুলো আয়ত্বাধীন করার এবং তার সম্পর্কে স্থান-বিশেষে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো মহলের সিদ্ধান্ত সেই সর্ববস্তুভূত শক্তিকেও অস্বীকার করার দিকে।

উপরে যে প্রগতির উদাহরণ দেয়া হলো সেটি, এবং জীবনের বহুমুখী রূপায়ণ—সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, চারুশিল্প, দর্শন এবং আরো অনেক-

কিছু সহ সমগ্র জীবনযাত্রা বিচার করে দেখলে প্রতিপন্ন হবে যে প্রগতির পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, পারমাণবিক বোমা, কালোবাজার, এক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের নির্মূলন---এসবও মনুষ্যত্বের ধারণাকে পুনর্বিচার করে দেখবার জন্য জোর তাগিদ দিচ্ছে না কি?

তবু এর পাশাপাশি মনের চেতনা নতুন দ্যুতিও লাভ করেছে।

দিগ্বিজয় একদিন ছিল গৌরবের ব্যাপার, যুবরাজদের প্রধার করণীয়ঃ সাম্রাজ্যবাদ আজ সর্বত্র নিন্দিত, বিলীয়মান। পারমাণবিক বোমার ব্যবহাব নিষিদ্ধ করার, তথা রাষ্ট্রসমূহকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা চলছে। কালোবাজার, দাঙ্গা, মানবেতর ছাড়া আর সবার কাছেই ঘৃণিত। দাঙ্গা, মন্বন্তর বা সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানব-কল্যাণেচ্ছায় প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার প্রশ্ন মানবতাবাদীর কাছে অবান্তর। জীবন ক্রমাগত আপনার প্রাপ্যমূল্য দাবী করছে ছোট-বড়ো নেতা ও শাসকবর্গে কাছে, অধিকতর মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করছে চিন্তানায়ক, সাহিত্যিক ও কবিদের। মানবতাবোধ দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, অগ্রণী হচ্ছে মানবসমাজকে সুন্দরতর করার দিকে। ভবিষ্যৎ আজ তাই অন্ধকার নয়।

কায়েমী স্বার্থের অনেক তৃষ্ণার্ত শিকড় অপরের জীবন-রসকে শুষে নেবার জন্য অলক্ষ্য বঙ্কিমতায় অগণ্য ক্ষেত্রে আজো প্রবর্ধমান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেইসব শিকড়কে কেটে ফেলার জন্য সমাজের স্তরে স্তরে ছুরিকাও শানানো হচ্ছে।

মানুষ নিরন্তর তার ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাত্রার সংস্কার করতে করতে অগ্রসর হচ্চে পরিপূর্ণ জীবনলাভের দিকে।

সব সময়েই যে সজ্ঞান প্রচেষ্টার সঙ্গে তা নয়। যে মুহূর্তটির সঙ্গে সম্বন্ধ সেই মুহূর্তে, যে ত্রুটিগুলোর সম্মখীন হতে হয় শুধ সেগুলোকে ছেঁটে ফেলার দিকে অধিকাংশের প্রবণতা। সেটুকু করতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট। আরেকটু এগিয়ে যার সম্মুখীন হতে হবে তার প্রতি তারা তাকায় না, তাকাবার ক্ষমতাও তাদের নেই। জীবনকে সংস্কৃত করে নেবার এই চেষ্টাটুকু সজ্ঞান হলেও জীবন সম্বন্ধে ধারণা তাদেব অপূর্ণ। এবং ভবিষ্যতের কোনো লক্ষ্যও তাদের নেই।

পৃথিবীতে আরেক শ্রেণীর মানুষ জন্মগ্রহণ করেন এক, দুই বা কয়েক শতাব্দী পর পর। তাঁদেরকে বলা হয় পয়গম্বর, প্রতিভা, যুগস্রষ্টা বা এমনি কিছু। মানব-সমাজের বিশেষ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এঁরা ভ্রষ্ট জীবনকে পূর্ণতর রূপ দেবার পথনির্দেশ করে যান। এঁদের দৃষ্টি পশ্চাত্তের এবং সম্মুখের বহু শতাব্দীকে অতিক্রম করে প্রসারিত।

এই দু-শ্রেণীর মধ্যে সংযোজক আরেক শ্রেণীর মানুষ থাকেন যাঁরা যুগ-প্রবর্তকদের বাণী ও লক্ষ্যকে সাধারণ্যে প্রচার ও কার্যে পরিণত করেন। সাধারণ শ্রেণীকে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করেন।

বহু শতাব্দী ধরে এমনিভাবে চলেছে মানুষেব অগ্রগতি। লক্ষ্য অবশ্য এখনো বহু দূরে, জীবন এখনো অপূর্ণ। এই অপূর্ণতার উপলব্ধির পরিমাণ অনুযায়ী পূর্ণতা লাভের আকাঙক্ষা আমাদেব চেতন বা অবচেতন, প্রচেষ্টা তীক্ষ্ণ বা মসৃণ।

তথাপি মোটের উপর প্রগতি সত্য,—এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষের লক্ষ্য পরিপূর্ণ জীবন। এই লক্ষ্য যে আকারেই থাক, এব যতই স্তব ও শ্রেণীভেদ থাক, মানবজন্মের গোড়া থেকেই এ ছিল এবং আজো আছে। গোড়া থেকেই চলে আসছে মানুষের জীবনেব বিবর্তন।

এই জীবনের দুটো দিক: একটা মানসিক, আবেকটা মানসাতীত। বাইবের জীবনযাত্রা আর মনের ক্রিয়াশীলতাব ধাবা কিছু আগু-পেছু হলেও সমান্তরাল। মানসাতীতের সহিত সংঘর্ষে মনে যে নব নব চেতনার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় তাই দেখিয়ে দেয় প্রগতির পথ। এই পথেই জীবন অগ্রসর হয় রূপান্তরের দিকে।

এই মন কিন্তু সম্মুখীন সমস্যাসমূহকে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা দিয়ে বিচার করে দেখেছে।

মনের আদিমতা যখন বেশী ছিল তখন মানুষের ক্রিয়াকলাপের পেছনে ছিল ভয় ও বিশ্বাস। সৃষ্টি-রহস্য ছিল তার অজ্ঞাত, প্রকৃতির ক্ষমতা ছিল অনায়ত্ত, তাই প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে সে ছিল অসহায়। এ অবস্থায় যে ধর্ম সে কল্পনা করেছিল তা ছিল ভয়ের ধর্ম, আর এই ধর্মের নির্ভর ছিল অন্ধবিশ্বাস। সৃষ্টি-রহস্য আবিষ্কার এবং প্রকৃতির ক্ষমতা ক্রমাগত আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এই ভীতি আর এই বিশ্বাস ভেঙে গেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে

ধর্মেরও রূপান্তর হয়েছে : অতএব, মানসাতীত জগৎ সম্বন্ধে মনোভঙ্গীর এবং মননধারার পরিবর্তন ঘটেছে. সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জীবনের রূপান্তরণ।

ধর্ম ছাড়াও মনন-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বাস্তব ক্ষেত্রের কৃতকার্যতা ও বিফলতার ব্যক্তিগত বা ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা। একদিকে ভয় ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূল যেমন ক্ষয়িত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে। এমনিভাবে মননধারার রূপান্তর ঘটতে ঘটতে আমরা এসে পৌঁছেছি বর্তমান যুগে।

আদিমতম ধর্ম থেকে ভিন্ন রকমের ধর্ম আজো সমাজের নানান স্তরে নানান পরিমাণে মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করেছে, কিন্তু উন্নত সমাজের প্রবণতা দার্শনিক প্রশ্নাবলীর সমাধান ধর্ম-নিরপেক্ষ বিচারবৃত্তির সাহায্যে আবিষ্কার করার দিকে। এই বিচারবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয় বাস্তব প্রয়োজনীয়তা দিয়ে। সৃষ্টি-রহস্য বহুলাংশে আবিস্কারের ফলে, এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে বহুলাংশে করায়ত্ত করার ফলে সেই আদিম ভীতি ও বিশ্বাস নেই। বস্তুজগৎকে বস্তুজগৎ ছাড়া আর কিছু আজ মনে করা হয় না। অতি-প্রাকৃতিক অদৃশ্য শক্তির ধারণার প্রভাব থেকে চিন্তাধারা মুক্ত হওয়ার ফলে, এবং নিজের ক্ষমতার বিস্ময়কর বিকাশের ফলে এমন একটা আত্মবিশ্বাস মানুষের মধ্যে জন্মেছে যে; নিজের চিন্তাধারার মধ্যেও সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

বস্তুত বস্তুমুখিন মানুষের মনে আজ বিচারবৃত্তিই সর্বাধিক প্রবল। বিচারবৃত্তির এই প্রাধান্যের ফলে অন্ধবিশ্বাসপ্রবণতা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ধর্ম এবং ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। আজ তাই এসবকেও বিচার করে দেখার দিকে একটা প্রবণতা অনেকের মধ্যেই লক্ষণীয়। জন্মহেতু এসবের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত বলে স্বীকার করলেও বিশ্বাস-ক্ষীণতা হেতু ব্যবহারিক জীবনে এগুলোর অঙ্গ-স্বরূপ আচার অনুষ্ঠানগুলো তারা অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করে না, বরঞ্চ সেগুলোর গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

অন্যদিকে সামাজিক সংযোগের ক্ষেত্রে নীতিবোধ আজ জীবনবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ধর্মীয় বা অন্য কোনো প্রকার সূত্রের সঙ্গে সাধারণত নয়। নৈতিক জীবন বাস্তব প্রয়োজন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নৈতিক কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতা-শানানো বিচার-বৃত্তি দিয়ে। বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিত অতীতলব্ধ অভিজ্ঞতা এবং জীবনদ্যুতি-উদ্ভাসিত ভবিষ্যদ্-দৃষ্টি, আর কিছু নয়। সমাজের অঙ্গীভূত অনেককিছু এ অবস্থায় ক্ষতিকর

বলে, কুসংস্কার বলে বিবেচিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এসবের সঙ্গে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত কোনো কোনো মহলে অস্বীকৃত।

আজকের দিনের নীতিবোধ বিচার-বৃত্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, আকাশ থেকে পড়া কোনো বীজ থেকে মনের ক্ষেতে এর উপ্তি হয়নি। আদিমতম মুহূর্ত থেকেই এই নীতিবোধ মানুষের মনে ছিল, কমবেশী ঘুমিয়ে। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানস-প্রকৃতির পরিবর্তন এবং বিচারবৃত্তির প্রবলতর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিবোধ বিকশিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

এর বিকাশের সহায়তা করেছে অনেক-কিছু: রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনসমূহ। উদাহরণ: চুরিডাকাতি, হত্যা, মিথ্যাকথন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ বাইরের শক্তিগুলো দিয়ে। সৎজীবন যাপন, দয়া প্রদর্শন, সদ্ব্যবহার প্রদর্শন ইত্যাদি আদিষ্ট ও অনুমোদিত হয়েছে বাইরের শক্তিগুলো দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এসব—এবং আরো বহু ব্যাপার—ভাল কি মন্দ সে বোধ মানুষের মনে বিকশিত হয়েছে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতারও ফলে। 'মানুষ বিচার-শক্তিসম্পন্ন প্রাণী' একথা মনে রাখলেই তার নীতিবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্রিয়াশীলতা উপলব্ধ হয়।

আজকের দিনে নীতিবোধের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই সবচেয়ে বড়ো কথা। আগে বলেছি: জীবনাবোধের সঙ্গে এই নীতিবোধের সংশ্লেষ রয়েছে। জীবনবোধ আজ শুধু নিজের বেলা নয়, এর সঙ্গে প্রতি দিন অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত হচ্ছে মানবতাবোধও।

আর এই মানবতাবোধও শুধু আত্ম-বহির্ভূত ক্ষেত্রে নয়, আত্মক্ষেত্রেও। এখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আদিম নীতিবোধের সঙ্গে আধুনিক নীতি-বোধের পার্থক্য। আমিও মানুষ, অন্যেরাও মানুষ, এই বোধের বিকাশের ফলে নীতিবোধ নতুন অর্থ লাভ করেছে। চুরি ডাকাতি হত্যা ইত্যাদি আগে কমবেশী নিষিদ্ধ হয়েছিল ধর্ম রাষ্ট্র সমাজ কর্তৃক। আজ এসবকে ঘৃণিত মনে করা হয় এই বোধের জন্য যে, আমিও মানুষ, অন্যেরাও মানুষ: মানুষ হিসাবে এই ঘৃণিত কাজগুলো আমি করতে পারিনে এবং করে আমারই মতো মানুষকে

জীবনের উপাদানগুলো তথা জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারিনে। আমরা মানুষ, অতএব পরস্পরকে আমরা দেব মানুষের মর্যাদা।

এ প্রকার মনোবৃত্তি যাদের, তাদের সংখ্যা এখনো বেশী নয়, তবে দিন দিনই তাদের সংখ্যা বাড়ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, উক্ত নীতিবোধ অনেকের মনে এরূপ দৃঢ়মূল যে যুগপৎ ধর্মীয়, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্য এসে যদি আজ উপস্থিতও হয় তবু তারা এই রকমই থাকবে।

মানুষ ক্রমাগত বস্তুমুখিন হওয়ার ফলে, এবং তার নীতিবোধ—অন্য কথায় বিবেক—ধর্মনিরপেক্ষ বিচারবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জীবনযাত্রা ধর্মের সঙ্গে ক্রমাগত সম্পর্কহীন হয়ে আসছে। জন্যহেতু ধর্মবিশেষের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার করলেও দৈনন্দিন ধর্মাচরণগুলো ক্রমেই পরিত্যক্ত হচ্ছে। যে-কোনো ধর্মাবলম্বীর দিকে তাকালেই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ হয়। অনেকে ধর্মকে প্রগতির বিরোধীও মনে করেন। ধর্মের ভবিষ্যৎ তাহলে কি?

মনে হতে পারে, ভবিষ্যতে ধর্ম হয়ত লুপ্ত হয়ে যাবে। ধর্মের মধ্যে চিরন্তনতা যদি না থাকে, ধর্ম যদি সমাজের কোনো অবস্থাবিশেষের পরিবর্তন সাধনের মাত্র যন্ত্রস্বরূপ হয়, তবে বলতে হবে, তার যেটুকু কাজ সেটুকু শেষ হয়ে গেলেই তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। ধর্মের কোনো অস্তিত্ব আর থাকবে না।

কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, ধর্মের অনেক উত্থানপতন অতীতে হয়ে গেছে। কোনো ধর্ম যখন অকার্যকর হয়ে গেছে, অথবা সকল মানুষের প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হয়েছে, তখনই নতুন কোনো ধর্মের উদ্ভব হয়েছে।

আজো প্রায় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের ধর্মকে ভিতরে বাইরে পুরোপুরি মেনে চলে। তাদের ধর্মাচরণে কোনো বিচ্যুতি নেই, কোনো স্খলন নেই, তাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো ভাঙন আসেনি, ভাঙন আসে না।

এই শ্রেণীর মানুষ আগামী যুগে একেবারেই থাকবে না এরূপ মনে করার বোধ হয় কোনো কারণ নেই। মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য যখন

সত্য, পৃথিবীতে সব রকম লোকের জন্যই যখন সম্ভব, তখন মনে হয় ধার্মিক লোকেরও অভাব হয়তো কোনো দিন হবে না। প্রকৃতি, জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের জন্য এক-একজন এক-একদিকে আকৃষ্ট হয়, (যেমন শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মপ্রাণতা, নিরীশ্বরবাদিতা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে), এবং সেদিকেই সে শান্তি, তৃপ্তি, ও জীবনের সার্থকতা খোঁজে। কোনো অলৌকিক কারণে নয়, মানব-প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের জন্যই ধর্ম মনে হয় সম্পূর্ণ বিলপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্বল্প।

১৯৪৭

সমৃদ্ধি সংস্কৃতি মূল্যবোধ

বহু-আলোচিত বৈষম্য-নীতি সত্ত্বেও এদেশে সমৃদ্ধির সম্প্রসারণ যে ঘটছে তা স্বীকার্য। সর্বজনীনভাবে ঘটছে তা নয়—কেননা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তা সম্ভব নয়; ব্যাপকভাবে ঘটছে তাও নয়—কেননা নিয়োজিত সম্পদের পরিমাণ অপ্রতুল। কিন্তু সম্পদের সম্প্রসারণ ঘটছে এবং তার লক্ষণ নানা ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। নতুন নতুন শিল্পকারখানা, সৌধশ্রেণী ও সিনেমাগৃহ পল্লী ও শহরাঞ্চলের চেহারা দ্রুত বদলে দিচ্ছে, প্রাইভেট কার ও সুসজ্জিত বিপণীর সংখ্যা বাড়ছে, এবং সুবেশ পুরুষ ও সুবেশা সালংকারা নারী সর্বত্র দৃষ্টিগোচর।

দৃশ্যত এই আর্থিক সমৃদ্ধি আমাদের সংস্কৃতি-জীবনেরও সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে। নানা শ্রেণীর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে এবং সর্বত্রই ছাত্র-ছাত্রীদের অভূতপূর্ব ভিড়। দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রেডিও এখন শিক্ষিত জীবনের অঙ্গে পরিণত, এমনকি সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও জনপ্রিয়; সিনেমা-গৃহগুলি জনাকীর্ণ, এবং নৃত্য-সঙ্গীত নাট্যানুষ্ঠান সর্বত্র সাগ্রহে পরিপোষিত। পুস্তক-প্রকাশনা ও পাঠক-সংখ্যা ক্রম-সম্প্রসারণমান। চিত্র-প্রদর্শনী ও সাহিত্য-সভার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতি-রুচির এই দৃষ্টিগ্রাহ্য সম্প্রসাবণ যতটা পরিমাণগত ব্যাপার ততটা উৎকর্ষের ব্যাপার নয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নয়। শিক্ষাক্ষেত্রেই বোধ হয় এটা সবচাইতে স্পষ্ট।

বর্তমানে সকল প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অভূতপূর্ব ভিড়; কিন্তু আমরা জানি, শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে। আমাদেরই সমাজে শিক্ষার সুযোগ যখন ছিল সংকীর্ণ তখন অনেক প্রতিভা ও মনীষা শিক্ষালয়গুলি থেকে বেরিয়ে এসেছেন; জনসমাজে তাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন; কিন্তু তেমন মনীষা ও প্রতিভার আবির্ভাব এখন একান্ত দুর্লভ। এবং সহজাত প্রতিভা ও অধ্যবসায় যেটুকু সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারতো, কূটকৌশলীদের গোপন সঙ্কেতে পরিচালিত ছাত্র-রাজনীতির আবর্তে তাও নিমজ্জমান।

সঙ্গীত-জলসা, সাহিত্য-সভা ও চিত্রপ্রদর্শনী, সিনেমা, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা সংস্কৃতি-রুচির প্রসারের লক্ষণ, কিন্তু সংস্কৃতি-রুচির প্রসার এবং সংস্কৃতির উন্নতি এক কথা নয়। এই সংস্কৃতি-রুচির প্রসারকে প্রধানত প্রমোদপ্রিয়তার প্রসার বলাই সঙ্গত, এবং প্রমোদ-প্রিয়তা সব সময় সংস্কৃতি-প্রিয়তা নয়। যে-সব অনুষ্ঠানে বুদ্ধি-বৃত্তির প্রয়োগ-সমস্যা অথবা প্রগাঢ় অনুভূতির প্রশ্ন নেই, আছে সহজ আনন্দ, সে-সব অনুষ্ঠানই সাধারণত জনপ্রিয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-জলসা, চিন্তামূলক সাহিত্য-সভা ইত্যাদির ন্যায় অনুষ্ঠান তাই দুর্লভ ব্যাপার। অন্যদিকে সিনেমার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান।

সিনেমার আকর্ষণ কিন্তু সহজ আনন্দই শুধু নয়। সিনেমাজগতে সেইসব ফিল্মেরই জনপ্রিয়তা বেশি যে-সব ফিল্মে যৌন-নৈতিকতা শিথিল, নগ্নতাবাদের প্রচার সুস্পষ্ট এবং আদিম প্রবৃত্তিগুলির উত্তেজনা সহজলভ্য। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ভূভাগের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, একটা বহুল-প্রচারিত ধর্মীয় আদর্শবাদ সত্ত্বেও। কিন্তু এক্ষেত্রে এ প্রদেশে আরেকটা অপ্রত্যাশিত সংকট ঘনীভূত। সেটি হচ্ছে, বাংলা ফিল্মের ব্যর্থতা এবং উর্দু ফিল্ম কর্তৃক তার স্থান দখল। নিজের ভাষার ফিল্ম বর্জন করে অন্য ভাষার ফিল্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব: এমন ব্যাপার অন্য দেশে সুদুর্লভ। এর অনেক কারণ থাকতে পারে: শিল্প হিসেবে বাংলা ফিল্মের অনুৎকর্ষ; কাহিনীর অনুৎকর্ষ; বিকৃত অবাস্তব জীবনচিত্র ও যৌনতাবাহুল্যের প্রতি আকর্ষণ, সামাজিক ও ঐতিহ্যগত কারণে যা বাংলা ফিল্ম অপেক্ষা উর্দু ফিল্মে সহজ-পরিবেশনীয় এবং সহজলভ্য। প্রতি-যোগিতার যদি কোনো অর্থ থাকে তবে এই সর্বশেষ লক্ষণটি বাংলা ফিল্মেও কালক্রমে সংক্রামিত হবে। উর্দু ফিল্মের অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ কোন্‌টি তা বলা কঠিন, কিন্তু প্রধান কারণ যাই হোক, এটা সাংস্কৃতিক অবক্ষয়েরই লক্ষণ।

সেই সঙ্গে এটি রুচির স্থূলীকরণেরও পরিচয়। এবং রুচির স্থূলীকরণ কেবল দর্শক-সমাজে সীমাবদ্ধ নয়, পাঠক-সমাজেও তা লক্ষণীয়। আমাদের সংস্কৃতি-জগতের একটা করুণ অভিজ্ঞতা এই যে, শুধু সেইসব গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকাই জনপ্রিয় যেগুলি অপেক্ষাকৃত তরল রসের পরিবেশক, এবং উত্তেজক ও অশ্রদ্ধেয় ভাবাবেগের পরিপোষক। উদার মতবাদ, গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা এবং সূক্ষ্ম মননশীলতার বাহনগুলি প্রায় অপাংক্তেয়। এরূপ

প্রবণতা যে কোনো কালেই ছিল না তা নয়, তবে রুচির স্থূলীকরণের এই ব্যাপকতা বিশেষভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা। সিনেমা-ব্যবসায়ী এবং গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশকেরা এবিষয়ে সচেতন, আর এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণেও তারা পূর্ণ উদ্যমশীল। এমনকি সজ্ঞানে রুচির স্থূলীকরণই অনেক সময় তাদের লক্ষ্য। এবং এই কারণেই সম্ভব হয়েছে শিল্প-সাহিত্যের অবিমিশ্র ব্যবসায়ীকরণ, যার উদ্দেশ্য শিল্প-সংস্কৃতির সেবা নয়, মুনাফা এবং দ্রুত মুনাফা। অবশ্য এইখানে একটা তর্ক সম্ভব : গাছে কাক বসার জন্যেই তাল পড়লো, অথবা পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল বলেই তাল পড়লো। রুচির স্থূলীকরণ ও শিল্প-সাহিত্যের ব্যবসায়িকরণ, এর কোন্‌টি কার্য এবং কোন্‌টি কারণ সে প্রশ্ন এখানে বড় নয় এবং সে প্রশ্নের মীমাংসাও বোধ হয় সম্ভব নয়। মূলত যেটিই হেতু হোক, সূচনা-স্তরের পর এর একটি অন্যটিকে উদ্দীপিত করেছে, এবং এ দুইটি এখন আমাদের সমাজে বাস্তব সত্য।

তবে ভালো কাজও সম্প্রতি কিছু কিছু হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যমে গবেষণা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক তৎপরতা প্রসারমাণ, এবং এইটি একটি সুলক্ষণ। এ ক্ষেত্রে মহৎ সাফল্য অবশ্য এখনো দৃষ্টিগোচর নয়, এবং মহৎ সাফল্য দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু একথার প্রবল প্রতিবাদ বোধ হয় সম্ভব নয় যে মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ বহু বছর থেকে বিশেষ-কিছু সংযোজন করেনি, এবং অন্যের অনুসরণে অতীতের নতুন ভাষ্যের বেশী এগোয়নি। বস্তুত মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ বহুদিন থেকে প্রায় স্তব্ধ। অন্য দেশের মৌলিক ও নতুন নতুন চিন্তা-ধারা স্ব-সমাজে সঞ্চারণের উদ্যমও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে আরো একটি সংকট ঘনায়মান, অথবা ইতিমধ্যেই ঘনীভূত : সেটি হচ্ছে, সৃষ্টিমূলক প্রতিভার সংকট। সাহিত্যে নতুন নতুন প্রতিভার আবির্ভাব হচ্ছে এমন কথা আমরা আগের মতো আর বলছি না। সাহিত্যের নানা বিভাগে এক সময় যাঁরা অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমাদের সামনে এসেছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানে, পত্র-পত্রিকায়, সরকারী-বেসরকারী অফিসে অথবা ফিল্মে হয়তো সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে সফল, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে তাঁদের অনেকেই অপসৃত, অথবা অপসৃত-প্রায়, অথবা সাহিত্যের মূল্যবোধে বিভ্রান্ত। চিত্রশিল্পেও নতুন নতুন প্রতিভার আবির্ভাব সম্প্রতি দুর্লভ।

এসবই ঘটছে সমৃদ্ধির সম্প্রসারণ সত্ত্বেও। সকল ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রতিভার আবির্ভাব আশা করা সঙ্গত নয়, কেননা তা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিভার ও সংস্কৃতিমানের প্রায় সর্বব্যাপী অবনমনও সুলক্ষণ নয়। এই অবনমনের কারণ সমাজের নতুন সমৃদ্ধি এমন কথা বলা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয়, কেননা এ যুগের অথবা অতীত যুগের অগ্রসর ও সমৃদ্ধ দেশগুলির অভিজ্ঞতায় তার সমর্থন পাওয়া যায় না। সে-সব দেশে সমৃদ্ধি, মনীষা ও উন্নত সংস্কৃতি-বিকাশ অনেক সময় পাশাপাশি ঘটতে দেখা গেছে। এদেশেও তাই ঘটবে এমন প্রত্যাশা আমাদের ছিল। কিন্তু সে প্রত্যাশাপূরণ আজ যেন সুদূরপরাহত।

এই সংকটের সঠিক কারণ নির্ণয় দুরূহ। কিন্তু নয়া সমৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সামাজিক লক্ষণ সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। এর একটি হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের ব্যবসায়িকরণ ও আরেকটি রুচির স্থূলীকরণ, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। আরও দুটি লক্ষণ হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধনশীল মান। এই লক্ষণগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এবং সমান্তরাল নয়, বরং একটি অন্যটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এর মধ্যে একটি অত্যন্ত মৌলিক ব্যাপার হচ্ছে নতুন সমৃদ্ধির যুগে জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতিশীল মান। স্বাধীনতার আমলে যে আর্থিক সমৃদ্ধি সম্প্রসারিত হচ্ছে তা সমাজের অনেকের জীবনে শুধু স্বাচ্ছন্দ্যই আনেনি, পূর্বযুগের তুলনায় জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নতও করেছে: খাদ্যে ও বস্ত্রে, বাসগৃহে ও আসবাবে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষায়, ললিতকলা চর্চায়, বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনে ও নানাবিধ সামাজিকতায়, প্রমোদ-সন্ধানে, সংবাদপত্র রেডিও ও অন্যান্য বহুবিধ উপকরণের চাহিদায়। এই মান কিন্তু কোনো স্থির ব্যাপার নয়, প্রতি বছরই এ উচ্চতর হচ্ছে: কিছুটা সম্প্রসারণশীল সমৃদ্ধির নিজস্ব তাগিদে, কিছুটা বিদেশীদের প্রভাবে এবং কিছুটা বিদেশ-ফেরতদের সাড়ম্বর উদাহরণে। মনোন্নয়ন সব সময়েই যে বস্তুগত তা নয়, অনেক সময় স্টাইলগত। এবং এই ক্রমোন্নতিশীল মান একটা সমস্যারও সৃষ্টি করেছে: এ শুধু ভাগ্যবান পরিবারগুলিতে সীমাবদ্ধ না থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যাপকতর অংশে একটা নির্মম সর্বজনীন রূপ নিতে চাচ্ছে।

নির্মম—কেননা সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক জীবনযাত্রার একটা নিম্নতম মানে উপনীত হওয়া এবং সে মান রক্ষা করা এই সমাজের পরিবারগুলি নিছক

সামাজিক চাপে পড়ে অবশ্যকর্তব্য জ্ঞান করছে: জীবনযাত্রার উপকরণে ও পদ্ধতিতে যেন অন্তত একটা নিম্নতম মানের পরিচয় পাওয়া যায়, কোনো কিছু যেন বাদ না পড়ে, নইলে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়বে, নেমে যেতে হবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজে, এবং তারপর বৃন্তচ্যুত হয়ে নিম্নতর সমাজে। সমাজের মানুষেরা সচেতন যে বাড়ীঘর ও আসবাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, পারিবারিক শিক্ষা, নানাবিধ সামাজিকতা, বিবাহ-সম্পর্ক ইত্যাদি কতকগুলি দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাপার দিয়ে তীক্ষ্ণচক্ষু সমাজ বিচার করে কার কেমন পয়সা আছে, অথবা কোন্ পরিবার কতটা "ভদ্র", অথবা "কালচার্ড"। এইসবের দু'একটি ব্যাপারে কমতি হলেই প্রমাণ হয় যে "পয়সা নেই", এবং "পয়সা নেই"-এর মতো সামাজিক সম্মানহানির ব্যাপার বোধ হয় আর কিছু নেই।

নতুন এবং ক্রম-সম্প্রসারণশীল সমৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত মানুষদের এইসব দায়িত্ব বাড়ছে—অথবা বাড়ছে বলে তারা মনে করছে—কিন্তু অর্থো-পার্জনের অসম সুযোগ ও অর্থের অসম বণ্টন, মুদ্রাস্ফীতি এবং সেই সঙ্গে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের দরুন এই দায়িত্ব অধিকাংশের পক্ষেই অগ্নিপরীক্ষার মতো দুঃসহ এবং "পয়সা নেই"-এর বিভীষিকায় কণ্টকিত।

জীবনযাত্রার এই ক্রমবর্ধনশীল মানের তাড়না থেকে লেখক-সম্প্রদায় মুক্ত নন, কেননা তাঁরা প্রধানত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই মানুষ। এই তাড়না আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তা বোঝা যাবে যদি মনে রাখি যে এই তাড়নার পাশাপাশি রয়েছে দুটি সামাজিক সত্য: রুচির স্থূলীকরণ এবং শিল্প-সাহিত্যের ব্যবসায়িকরণ। আমরা জানি, সিনেমা-শিল্পের অবিচল দৃষ্টি বক্স-অফিসের প্রতি, এবং বক্স-অফিসের নিশ্চিত পন্থা জীবনের আর্দ্র আবেগবহুল বিকৃত চিত্র ও যৌন-নৈতিকতার শিথিলতা। যেসব সাময়িকপত্র বহুল প্রচারিত অথবা বহুল প্রচারিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী, সেগুলিরও অবলম্বন তাই; পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান-গুলিও প্রাকৃতরুচি সমাজের একই রকম চাহিদা সম্পর্কে সচেতন, এবং সে চাহিদা পূরণে যত্নশীল। জীবনযাত্রার মান রক্ষার তাগিদে এই চাহিদা সম্পর্কে উদাসীন থাকা লেখকদের পক্ষে সুকঠিন। বহু শক্তিমান খ্যাতিমান লেখকই তাই শিল্প-সৃষ্টির আনন্দকে ত্যাগ করে সিনেমা-উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন সিনেমা-পত্রিকায়—বাংলাদেশে শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গেও। উত্তম সৃষ্টি, এবং মৌলিক সৃষ্টি যদি দ্রুত ও প্রচুর মুনাফা

অর্জনে সমর্থ না হয় তবে প্রকাশক তা নেবে কেন, এবং প্রকাশক না নিলে লেখকই বা তা লিখবেন কেন? গবেষণা ও মননমূলক রচনার ব্যাপারে যদি লেখক দেখেন যে তিন দিন খেটে যে অর্থাগম হবে তিন মাস খেটেও হবে তাই, তবে তিনি তিন দিনের বেশী পরিশ্রমের উৎসাহ পাবেন কোথা থেকে, এবং ঐ রচনাটির জন্যে দশবিশ টাকার বই-পত্রিকা কিনতে এবং আট-দশটা লাইব্রেরীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পড়াশুনা করতে যাবেন কেন? পড়াশুনার আনন্দ, গবেষণার আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু জীবনের কঠিন বাস্তবের প্রতিও তিনি অন্ধ নন। জীবনের কঠিন বাস্তব চতুর্দিক থেকে তাঁর চেতনাকে আঘাত দিচ্ছে, জীবনযাত্রার উর্ধ্বশ্বাস মিছিলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই উর্ধ্বশ্বাস জীবনে যে-পরিমাণ পরিশ্রম তাঁর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের, অথবা মান অক্ষুণ্ন রাখার অথবা শুধু জীবনযাত্রার সহায়ক হবে তা তিনি অবশ্যই করবেন; কিন্তু যে-পরিমাণ পরিশ্রম তা করবে না, বরং তাঁর জীবনযাত্রার মানকে আরও নামিয়ে দেবে, সে পরিমাণ পরিশ্রম---অপরিহার্য হলেও, প্রিয় হলেও, সে পরিমাণ পরিশ্রম করতে তিনি জৈবিক নিয়মেই সঙ্কুচিত হবেন। কেননা তিনি সচেতন যে রুচির স্থূলীকরণ ও শিল্প-সাহিত্যের ব্যবসায়িকরণের যুগে তাঁর এই শ্রম ও সাধনার মূল্য সমাজ বুঝবে না। অতএব তিনি অগ্রসর হবেন, হতে বাধ্য হবেন, এবং হতে বাধ্য হচ্ছেন সেই পথে যেপথে তাঁর জীবনযাত্রার সামাজিক রূপটা অক্ষুণ্ন থাকে এবং জৈবিক চাহিদাগুলির পূরণ হবে। এর একটা পথ তাঁর রচনার স্থূলীকরণ যা তিনি করছেন। আরেকটা পথ নির্বিচার অনুবাদ। স্বাধীনতার আমলে এ প্রদেশে অনুবাদ-সাহিত্যের অভূতপূর্ব প্রসার তাই অনিবার্যভাবেই ঘটেছে।

অনুবাদ একটা বাঞ্ছনীয় সাহিত্যকর্ম, কেননা অনুবাদও সাহিত্যের একটা শাখা। উত্তম অনুবাদ-সাহিত্য পাঠক-সমাজের রুচির সম্প্রসারণে ও মৌলিক সাহিত্যের রূপ-বৈচিত্র্য সাধনে সহায়তা করে। কিন্তু এ দেশে সাম্প্রতিককালে যে-সব অনুবাদ হয়েছে তার বেশীর ভাগই বৈদেশিক ও বিজাতীয় রাজনৈতিক স্বার্থের আনুকূল্যে এবং এই কর্মে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরাও অংশ নিয়েছেন। যে পরিমাণে অংশ নিয়েছেন, এবং এই কাজে যে-পরিমাণে তাঁরা তাঁদের উদ্যম ও সময় নিয়োজিত করেছেন, সেই পরিমাণে আমাদের মৌলিক সাহিত্যের অগ্রগতি স্তম্ভিত হয়ে থেকেছে।

কিন্তু এ হল সামাজিক বাধ্যতার প্রশ্ন—যার কিছুটা প্রকৃত এবং কিছুটা হয়তো কাল্পনিক। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটি প্রশ্ন আছে—বিবেকের প্রশ্ন, মূল্যবোধের প্রশ্ন। এই বিবেক এবং এই মূল্যবোধের প্রশ্ন অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে শুধু লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী-সমাজের প্রশ্নই নয়, সমগ্র সমাজের প্রশ্ন, এবং সমগ্র সমাজের প্রেক্ষিতেই প্রশ্নটির বিচার কর্তব্য।

নয়া সমৃদ্ধির যুগে আমাদের সমাজের একটা নগ্ন লক্ষণ হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। বিশেষভাবে সমৃদ্ধির সম্প্রসারণ উপলক্ষেই তা লক্ষণীয়। সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সুযোগ পেলেই শোভনতা, নৈতিকতা, মানবিকতা ইত্যাদি সদগুণকে অসংকোচে পদদলিত করে যে-কোনো পদ্ধতিতে বিত্তশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। এই মনোবৃত্তি সমাজে যে কখনো ছিল না তা নয়, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে এর প্রসার এবং স্বাধীনতার আমলে নতুন নতুন সুযোগের অন্ধকার গলিপথে এর বিশেষ ব্যাপকতালাভ। এর মধ্যে আছে মুনাফাবৃত্তি, কালোবাজারী, চোরাচালান, উৎকোচ এবং অন্যান্য সুবিদিত সুবর্ণপদ্ধতি। আমাদের সমাজের স্বাভাবিক নৈতিকতা ও ধর্মবোধের জন্যে এসব আগে ঘৃণিত হতো। এখনও হয়, তবে অতোটা নয়, এসবই গা-সওয়া হয়ে গেছে এবং যেন অবাঞ্ছিত কিন্তু অনিবার্য স্বাভাবিকতা বলে স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি এই সুবর্ণ-পদ্ধতি-গুলি বর্তমানে যেন আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত, কেননা জীবনযাত্রার পদ্ধতিও সংস্কৃতির অঙ্গ বলে গণ্য। এবং এই সুবর্ণপদ্ধতি অবলম্বনই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, এবং নৈতিকতা বোকামি, এই এখন বিবেচিত। উল্লিখিত সুবর্ণ-পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি যদি সফলকাম হয় এবং দৃশ্যত স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে পারে তবে সমাজে সে অপাংক্তেয় হয় না, বরং প্রশংসিত হয়। নিন্দিত হয় কেবল তখনই, যখন সে ব্যর্থ হয়। তার বিপরীত প্রকৃতির কোনো ব্যক্তি যদি নৈতিকতা ও সততার জন্যই আর্থিক দৈন্যে পীড়িত হয় তবে কারো কারো কাছে সে প্রশংসা হয়তো পায়, কিন্তু সামাজিকভাবে সে অপাংক্তেয় ও উপেক্ষণীয়ই থেকে যায় এবং মূর্খ বলে বিবেচিত হয়। বস্তুত বর্তমানে আমাদের সমাজের অনুচ্চারিত নির্দেশ এই: "যদি সমাজে সম্মান পেতে চাও, তবে যেমন করে পারো পয়সাওয়ালা হও। আমরা অবিশ্যি খোলাখুলি বলি না যে তুমি মুনাফাখোরী কর, কালোবাজারী কর, চোরাচালান কর অথবা ঘুষ খাও। তুমি তো জানোই যে আমাদের আইন আছে। তুমি একটু অসতর্ক হলেই আইনের রশিতে আমরা তোমাকে

পেঁচিয়ে মারব। কিন্তু এই-সমস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে তুমি যদি কোনো প্রকারে পয়সাওয়ালা হতে পারো, যদি দেখি যে তুমি ওস্তাদ লোক, তাহলে তোমার জন্য আমাদের সালাম নির্ধারিত রইল।"

বস্তুত একথা অস্বীকার করা কঠিন যে সাম্প্রতিক কালে আমাদের সমাজে প্রায় সর্বজনীনভাবে রুচিহীন বিত্তপূজা কায়েম হয়েছে। এ রকম ব্যাপার যে আর কোনো যুগে ছিল না তা নয় ; যে-কোনো উপায়ে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকুক, বিত্তের জৌলুস চিরকালই মানুষকে মুগ্ধ করেছে। বহু সংস্কৃতি-বান ভূম্যধিকারী-পরিবারের পূর্ব-পুরুষ দস্যুবৃত্তি করত এমন কাহিনী দুর্লভ নয়। কিন্তু গুণী ব্যক্তির প্রতিও সমাজ ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হতো। একমাত্র বিত্তের মানদণ্ডেই সমাজের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদিত হতো না। এবং নৈতিক অর্থে "অধর্ম" ও অধার্মিকের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করতেও সমাজ সংকুচিত হতো না। কিন্তু সফল নীতিহীনতাই এখন প্রশংসিত।

এই কলুষিত মূল্যবোধ আমাদের লেখক-সমাজে কিছুমাত্র সংক্রামিত হয়নি এমন কথা কি আমরা জোর করে বলতে পারি ? যে-কোনো উপায়ে বিত্তবান হওযার আকাঙক্ষা, এবং এই আকাঙক্ষার প্রেরণায় নীতি ও নৈতিকতা বিসর্জন, আদর্শ-বদল, ব্যক্তিস্বার্থে পরস্পরের পৃষ্ঠপোষণ এবং সাহিত্যের ভান, অর্থাৎ যে-কোনো উপায়ে নিজের জন্যে যতোটা পারা যায় গুছিয়ে নেওয়া, এইসব ব্যাপার, দুঃখের বিষয়, আমাদের সাহিত্য-সমাজে একবারে দুর্লভ নয়। এবং এই সমাজেই, একজন লেখকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জৌলুস যতোটা মূল্যবান বিবেচিত, একনিষ্ঠ লেখক-ব্যক্তিত্ব ততোটা নয়।

এই আলোচনার বক্তব্য অবশ্য এই নয় যে মূল্যবোধ-বিরোধী অথবা সংস্কৃতি-বিরোধী প্রবণতা সমৃদ্ধিপূর্ব যুগে যুগে ছিল না। প্রত্যেক যুগেরই কোনো না কোনো প্রকৃতির মূল্যবোধ-ও-সংস্কৃতি-বিরোধী প্রবণতা থাকে ; এ যুগে যেমন আছে, অতীতেও বহু শতাব্দী ধরে তেমনি ছিল, তবে তার প্রকৃতি ছিল অন্য রকম। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যুগের প্রবণতাগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া, কেননা সংকটের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হলে তার নিরসনের পন্থাও হয়তো আবিষ্কৃত হবে।

আমাদের সমাজে যে নীতিহীন রুচিহীন বিত্ত-পদ্ধতির প্রসার ঘটছে তার সুফল যে এই পদ্ধতির কৃতী ব্যক্তিরা আর তাদের, বংশধরেরা পাবে না তা নয়; এমনকি সমাজও তাদের সমৃদ্ধির একাংশ পেতে পারে; কিন্তু

পৃথিবীতে কোনো কাজ, কোনো মনোভঙ্গী এবং কোনো সমৃদ্ধি-দর্শনই ফল-বিরহিত নয়। সমাজে এই দর্শনই যদি প্রতিষ্ঠিত ও অনুসৃত হয় যে বিত্ত অর্জনের যে কোনো পদ্ধতিই বৈধ তবে এই পদ্ধতি-উদ্ভূত কোনো কৃতী পুরুষ, অথবা অন্তত সেই কৃতী পুরুষেব বংশধর শেষ পর্যন্ত নিরাপদ থাকার আশা করতে পারে না। কেননা পৃথিবীর কোনো সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বীবিরহিত মানুষ সম্ভব নয়। এক ব্যক্তি বিত্তশালী হওয়ার কোনো মহাজনপন্থা প্রদর্শন করলে আর পাঁচজন অনতিবিলম্বেই তা অবলম্বন করে, এবং তার শিকার শুধু সাধারণ মানুষেরা নয়, কৃতী পুরুষেরাও হতে পারে: এবং হয়ে থাকে। মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় কোনো সমাজে যদি পুরুষানুক্রমে রক্তের বদলে রক্তপাতের রীতি প্রচলিত থাকে, যদি থাকে স্ব-সমাজের নরমাংস ভক্ষণের রীতি এবং নরমুণ্ড সংগ্রহের ঐতিহ্যগৌরব তবে সে সমাজের খুব কম সংখ্যক মানুষই নিরাপদ জীবনের আশা করতে পারে।

মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক সততাকে চোখে ঠেরে যে সমৃদ্ধি, ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে সেইটাই শেষ কথা নয়। তার রীতি ও পদ্ধতিগুলি সমাজের সকল স্তরে সঞ্চারিত হতে থাকে, এবং এমন একটা জটিল চক্রের সৃষ্টি করে যাতে বহু লোক জড়িয়ে পড়ে এবং আরো বহু লোকের জীবন বিচিত্র পথে প্রভাবিত হয়। নিয়ত ঘূর্ণ্যমান এই চক্র অন্ধভাবে মানুষকে নিষ্পেষিত করে—নিরীহ মানুষকেও—এবং সাধারণত নিরীহ মানুষকেই, তারপর সমগ্রভাবে সমাজকে। সংস্কৃতিগতভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে। বহু জাতি ও সমাজেরই অভিজ্ঞতা এই যে, এক নীতিহীনতা অন্য নীতিহীনতাকে উৎসাহিত করে, এবং এক লালসা মানুষকে অন্য লালসার দিকে আকর্ষণ করে। কোন্‌টি কারণ এবং কোন্‌টি কার্য এই কূটতর্কে না গিয়েও বলা যায়, অর্থনৈতিক নীতিহীনতা, রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা, যৌন-বিলাস, সাংস্কৃতিক অধোগতি এবং আরো অনেক দুর্লক্ষণ প্রায় এক সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, এবং জাতি ও সমাজকে তার অন্তিম নিয়তির পানে টেনে নিয়ে যায়। এটা উদ্বেগেরই বিষয় যে স্বাধীনতার আমলে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ বহুকাল পরে সমৃদ্ধির কিছু সুযোগ পেলেও সেই সঙ্গে পৃথিবীর বহু অবলুপ্ত ও অবলুপ্তিমান জাতি ও সমাজের দুর্লক্ষণগুলির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছে।

১৯৬৪

এই সভ্যতা

পায়চারি করতে করতে কানে এল, পাড়ার এক ছেলে—বয়স তার সাত বা আট হবে–আনমনে গুনগুন করে গান করছে :

ভালবাসা মো—রে
ভিখারী করে—ছে,
তোমারে করেছে রা—নী

জিজ্ঞাসা করলাম, এ গান তুমি কোথায় শিখেছো ? সে বললে, মানুষের কাছে, সবাই তো গায় —

ছেলেটির দোষ নেই। সে জানে না এ গানের তাৎপর্য কী, সে বোঝে না যে, এ গান তার মুখে মানায় না। কিন্তু তবু সে শিখেছে যে-নিয়মে সে কথা বলতে শিখেছে সেই নিয়মে, কারণ এ শ্রেণীর গান পথে-ঘাটে গ্রামোফোনে রেডিওতে এত বেশী গাওয়া হয় যে, সময় সময় আমার মনে যে-সব পাখী মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে তারা হয়তো একদিন একযোগে এই গানগুলো গেয়ে উঠবে।

আমাদের দেশে—বলতে কি সব দেশেই–এমন কতকগুলো গান আছে, যা বিশেষ করে ছেলেমেয়েদেরই উপযোগী; এমন কতকগুলো গান আছে যা ছেলেমেয়ে এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই উপযোগী; আবার এমন কতকগুলো গান আছে যা কেবল প্রাপ্ত-বয়স্কদেরই উপযোগী। উদ্ধৃত কথা কয়টি যে-গানের, তা এই শেষোক্ত শ্রেণীর। এ গানটি অবিশ্যি অপেক্ষাকৃত নিরীহ; তবে এই শ্রেণীর এমন অনেক গান আছে যা ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে শুধু যে বেমানান তাই নয়, এ শ্রেণীর গান তাদের শোনাই উচিত নয়।

এ যুগে, অর্থাৎ গ্রামোফোন-সিনেমার যুগে এটা অবিশ্যি অতি-আশা। কিন্তু এ-ও তো ঠিক, নরনারী যখন প্রেমালাপ করে তখন তারা ছোট ছেলেমেয়েদের (এবং দুনিয়ার আর-সব মানুষের) চোখের অন্তরালেই তা করে। তবে এ শ্রেণীর গানই বা কেন তারা ছেলেমেয়েদের এড়িয়ে গাইবে না বা শুনবে না ?

এ ধরনের শালীনতা-বোধ মানব-সমাজে চিরদিনই কম ছিল এবং এখনও কম ; কিন্তু এ যুগে, সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে কোনো কোনো ব্যাপারে শালীনতা-বোধ বলতে আদৌ কী বোঝায়, তা-ই বলা কঠিন। যেমন ধরুন হলিউডী ফিল্মে, ব্যবসায়ী দামী হোটেলে, ক্লাবে, নৃত্যে-অভিনয়ে, এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠানে রঙ্গনটী এবং কুল-কন্যাদের বিস্রস্ত-বসন রূপোপচার নিবেদন। পশ্চিমী দেশে এ প্রকার যাবতীয় আয়োজনে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা উপস্থিত থাকে কিনা জানি না, তবে সচিত্র পত্রিকার কল্যাণে এসব অনুষ্ঠানের ছবি তারা যে পুরোমাত্রায় উপভোগ করে তাতে সন্দেহ নেই। এবং এসব পত্রিকা যেহেতু আমাদের দেশেও চলে অতএব এ দেশের ছেলেমেয়েরাও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার এই আশীর্বাদ থেকে একেবারে বঞ্চিত নয়।

পাশ্চাত্ত্য রঙ্গনটীদের অঙ্গসজ্জা—অথবা অঙ্গসজ্জার অভাব—হয়তো একটা স্টাইল। পশ্চিমী দেশগুলোর সামাজিক সমাবেশেও যখন এ স্টাইলের সংক্ষেপিত সংস্করণের প্রাদুর্ভাব প্রায় সর্বজনীন, তখন এ একটা জীবন-রীতি, এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অঙ্গ। গ্রীষ্মকালের জন্য এ রীতি, বরফ-ঝরানো শীতের রাত্রের জন্যও তাই ; কিন্তু এ শুধু নারীদের জন্য, পুরুষদের জন্য নয়।

পশ্চিমের সামাজিক সমাবেশে পুরুষ ফুল-স্লিভ সার্ট ও টাই-সহ সবকিছু পরে গেলেও, শুধু কোট বাড়িতে রেখে গেলে সে হাফ-ড্রেস্ট ; কিন্তু আবাহুমূল-ও-আবক্ষনগ্না লেডি মডার্ন ও কালচার্ড। এ স্টাইল তাই লেডি ও তার এ্যাডমায়ারার নির্বিশেষে সকলেরই প্রিয়। আরও প্রিয় বেদিং-স্যুট।

কিন্তু বেদিং-স্যুট-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কচিৎ-কখনো ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এই ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাজকুমারী মার্গারেট একবার ইতালী বেড়াতে গিয়ে একান্ত অজ্ঞাতসারে এক ফরাসী ফটোগ্রাফারকে এবং প্যারিসের এক সচিত্র পত্রিকার সম্পাদককে ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন। রাজকুমারী বেদিং-স্যুট পরে সমুদ্র-স্নান করছিলেন, সেই সময়ে উক্ত

ফটোগ্রাফার কোথাও লুকিয়ে থেকে মার্গারেটের ফটো তুলেছিলেন আর সে ফটো ছাপা হয়েছিল প্যারিসের এক পত্রিকায়। এজন্যে সেই ফটো-গ্রাফার আর সেই পত্রিকা-সম্পাদককে ফরাসী কর্তৃপক্ষ দণ্ড দিয়েছিলেন। কারণ, বেদিং-স্যুট-পরিহিতা সাধারণ ঘরের জলকন্যাদের ফটো পত্রিকায় ছাপা যেতে পারে, কিন্তু রাজকুমারীর ও-রকম অবস্থায় তোলা ফটো তো আর ছাপা যেতে পারে না।

কূটনৈতিক সৌজন্যের দরুন ফরাসী সরকার ইংরেজ রাজপরিবারের এই ঐতিহ্যকে সম্মান করেন বলেই এই দণ্ড, নইলে ব্যাপারটা চির-রোগী ডাক্তারের চিকিৎসা-বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ থেকে এই বোঝা যায় যে, সাধারণ এমনকি অভিজাত পরিবারেরও নারীর জন্য যা প্রশংসনীয় আধুনিকতা, রাজকুমারীর জন্য তা অপমান। কথাটাকে খুব সোজা করে বললে এই দাঁড়ায় যে, রাজকুমারীর মাংসল রূপ-লাবণ্য শুধু রাজকুমারীর নিজস্ব, অথবা তাঁর প্রেমিক ও স্বামীর নয়নরঞ্জনের জন্য, কিন্তু যারা রাজকুমারী নয়, তাদের মাংসল রূপ-লাবণ্য-প্রদর্শনী সর্ব-সাধারণের নয়নরঞ্জনের জন্য। অর্থাৎ তাদের ইজ্জতের মূল্য সমান নয়।

কিন্তু বেদিং-স্যুট সামাজিক স্টাইল নয়, ক্রীড়া-বিশেষের পোশাক মাত্র, অতএব সে-প্রসঙ্গ থাক। উক্ত কালচার্ড ও মডার্ণ সোসাইটি-লেডির প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, প্রাচ্যের নারীর পরিচ্ছদ-ও-অলংকরণরীতির মধ্যে কি এমন কিছুই নেই যার লক্ষ্য তার রূপযৌবনকে উজ্জ্বল-তীক্ষ্ণ-আকর্ষণীয় করে তোলা, আর চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, তার যৌন-আকর্ষণ বৃদ্ধি? থাকবে না কেন, আবহমান কাল ধরেই আছে। তবে—এ দেশের কথাই ধরা যাক—বাঙ্গালী নারীর পরিচ্ছদ ও প্রসাধন-রীতির মূলে যে প্রেরণা তা মৌল জৈব প্রেরণা, আর তা অনেকটাই অচেতন, গাছে ফুল ফোটা ও ফল ধরার মতো—স্বপ্রজাতির বিস্তারের জন্য। এর মধ্যে যা সচেতন তাও নারীর সহজাত সৌন্দর্যসাধনা। আর তার প্রেরণার কেন্দ্র সমাজ-অনুমোদিত কোনো পুরুষ। এই বৃত্তের মধ্যেই তার সম্ভোগ। পক্ষান্তরে উক্ত পশ্চিমী কালচার্ড ও মডার্ণ লেডির পরিচ্ছদরীতির লক্ষ্য একান্তভাবে সচেতন ও সোস্যালাইজড্; প্রায় সর্বজনীনভাবে মানসিক—এবং অসংখ্য ক্ষেত্রে বাস্তব—মধুকরীবৃত্তি, সৌন্দর্যসাধনা নয়। অধিকন্তু তার বিবসন-প্রায় মাংসল রূপ-যৌবন সিনেমা জার্নালিজ্‌ম্ ইত্যাদি কয়েক প্রকার শিল্পের প্রধান মূলধন ও কাঁচামাল। আর এইসবের মূল কথাটা, সচেতনভাবে, বিশুদ্ধ সম্ভোগ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, বালীদ্বীপ এবং আফ্রিকার কোনো কোনো সমাজের নারীদের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে অবশ্য বলা সম্ভব এরা তো সম্পূর্ণ নগ্ন-বক্ষা। কিন্তু তাদের নগ্নতা, এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোনো কোনো দ্বীপের নারীর আপাদমস্তক নগ্নতা প্রকৃতির অচেতন নগ্নতার মতো; ওটা সভ্যতার আদিমতার লক্ষণ, প্রগতির নয়। এবং এই নগ্নতা সম্পর্কে ইভের মতোই তারা অচেতন। তারা এখনো স্বর্গবাসিনী। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার উদ্যতফণা সর্পের হিসহিসানি কখনো তাদের সচেতন করে তুললে তারা লজ্জারুণ ও ত্রস্ত হয়ে উঠবে, এবং বস্ত্রের সন্ধানে ছুটোছুটি করবে। কিন্তু পশ্চিমী মডার্ণ ও কালচার্ড নারীর অর্ধনগ্নতা প্রগতিবাদী সভ্যতার বৃত্তে সচেতন অনুশীলন, আর তা কালচারেরই অঙ্গ স্বরূপ। অধিকন্তু পশ্চিম-জগতের ন্যুডিস্ট আন্দোলন একটা কাল্ট-এ পরিণত।

এখন, পশ্চিমী নারীর বিবসন-প্রায় দেহ-লাবণ্য-প্রদর্শনী শালীন রুচি-সম্মত কিনা? এ সম্বন্ধে সর্বজনীন ঐকমত্য দুর্লভ। আমরা বাঙ্গালীরা বলবো এটা শালীন রুচি-সম্মত নয়, কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলোর লোকেরা তা বলবে না। এতে তারা কিছুই দোষের দেখবে না, যদিও এই দেহ-লাবণ্য-প্রদর্শনী নিরন্তরই দেহ-লাবণ্যবিপণিতে পরিণত। প্রায়ই ওসব দেশের খবরেব কাগজে যে-সব বিবরণ দেওয়া হয় তাতে বোঝা যায়, দুর্নীতির কী ঘূর্ণি-স্রোতে বয়ে যাচ্ছে পৃথিবীব ওই অংশে। এই ঘূর্ণি-স্রোতে প্রতি মাসে হাজার হাজার পরিবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। অর্থের মতো অনর্থেরও ওখানে প্রভূত প্রাচুর্য। আর বড়োদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যই যেন কিশোর-কিশোরীরাও নেমেছে দুর্নীতির অবগাহন-স্নানে। যৌন-নৈতিকতা ওসব দেশে ক্রমেই পরিহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনের এ-সম্পর্কিত এক রয়্যাল কমিশনের রিপোর্টে সম্প্রতি বলা হয়েছে, ইংলণ্ডে জীবিত জারজ সন্তানের সংখ্যা শতকরা সাতজন। যারা জন্মের পূর্বেই বিনষ্ট হয়েছে অথবা চতুর মাতার প্রযত্নে শিখণ্ডী পিতার পরিচয় লাভ করেছে, তাদের সংখ্যা শতকরা কত কেউ বলতে পারে না। তথাপি যৌন-নৈতিকতা পুনরুদ্ধারের কোনো আন্দোলন ওসব দেশে হচ্ছে বলে আমি জানি না।

আমাদের দেশে যে নৈতিক স্খলন নেই, তা আমি বলছি না। কিন্তু এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, সমাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার কাজ অনেক

বাকী—যেমন এদেশে তেমনি ওসব দেশে, এবং এজন্য শালীনতাবোধের একটা সুস্পষ্ট মানদণ্ড স্থির করা দরকার। আমার ধারণা, বালক-বালিকাদের নৈতিক কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নই হচ্ছে এই মানদণ্ড। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে, শুধু বালক-বালিকাদের নৈতিক কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে কড়া নজর রাখলেই সমাজ সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে এবং ওটাই একমাত্র সমস্যা; আমি বলতে চাই এই যে, যে-সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অসংকোচে অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে যাওয়া যায় না, যে-সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অপ্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর তা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেও অস্বাস্থ্যকর তা, সমাজের পক্ষেও অস্বাস্থ্যকর এবং অকল্যাণজনক।

প্রেম-নিবেদন এবং বিরহ-বেদনা কোনো এক মানব এবং কোনো এক মানবীর নিজস্ব, কিন্তু প্রেম-নিবেদন ও বিরহ-বেদনাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-শিল্প-নৃত্য-সিনেমা-সংগীত-নাটক উৎসারিত হয় তা সমাজের, এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু যেহেতু সমাজের সেহেতুই এসব সাহিত্য-শিল্প-কলানুষ্ঠানের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব হচ্ছে সমাজকে সুন্দর করা—অসুন্দর করা নয়; সমাজকে উন্নত করা, মার্জিত করা—অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাওয়া নয়। 'বিশুদ্ধ' আনন্দ দেওয়াই শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য কথা উঠতে পারে, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করতে গিয়ে শুধু অপ্রাপ্তবয়স্কদের কথা মনে রাখলে তো চলে না। চলে না ঠিকই, শুধু অপ্রাপ্তবয়স্কদের কথা মনে রাখতেও আমি বলছি না, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের এমন একটা সীমা নিশ্চয়ই আছে যা লংঘন করলে শালীনতা ও সুরুচির সীমাও লংঘন করতে হয়।

অবশ্য তার পরেও আমার বক্তব্য এই যে, প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে যা স্বাভাবিক, অপ্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে তা অকল্যাণজনক হতে পারে, এবং যা তাদের পক্ষে অকল্যাণজনক তা তাদের থেকে দূরে রাখাই উচিত। এমন অনেক গান ও ফিল্ম আছে যা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি; এবং এমনি বাড়াবাড়ি দেখা যায় অন্যান্য চারুশিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। এ বাড়াবাড়ি আধুনিক প্রাচ্যে যতটা না দেখা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্ত্যে দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু শেষ এখানেই নয়, এই বাড়াবাড়িকেই লংঘন করে মূলধন খাটাবার প্রতিযোগিতা সিনেমায় ও সচিত্র সাময়িকীতে, পোর্ণোগ্রাফী নামে

আখ্যাত গল্পে ও উপন্যাসে, এবং এই বাড়াবাড়ির প্রেরণাকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক সমাজ থেকে হাজার সমাজে, বয়স্কদের আসর থেকে কিশোরদের কাঁচা রক্তে। আমার ধারণা এর কোথাও একটা সীমারেখা টানা দরকার কিশোরদের মুখের দিকে চেয়ে। যে-সব সিনেমা, সচিত্র সাময়িকী অথবা 'সাহিত্য' কোনো একটা বিশেষ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা অথবা বিশেষ বয়সের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়, অথচ কিশোরদের জন্যও মঙ্গলজনক নয়, সেগুলো কার জন্য মঙ্গলজনক তা আমি বুঝি না।

১৯৫৩

চাঁদের মৃত্যু চাঁদের জন্ম

বিজ্ঞানীরা বহুকাল যাবৎ বলে আসছেন চাঁদ একটা ক্ষুদ্রতর পৃথিবী, তবে তফাত এই যে সেখানে হাওয়া নেই, পানি নেই, সবুজ গাছ নেই, ফুল নেই, কোনো প্রাণী এমনকি কীট-পতঙ্গেরও অস্তিত্ব নেই। সে এক মৃত পৃথিবী। তারার কথা তাঁরা যা বলেন তা আরো ভীষণ। শুনে আমরা চুপ করে থেকেছি, জানি যে বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা চলে না। তাঁরা চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে চাঁদে যা-ই দেখুন, চাঁদ তার নিয়মিত কাজ করে গেছে, দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে এবং নিজের সামর্থ্য আর তিথি অনুযায়ী পৃথিবীর রাত্রিঢাকা অঞ্চলগুলোতে বরাবরের মতই কিরণ দিয়েছে। মায়ের কোলে চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীর বই বন্ধ রেখে মানুষ চাঁদের শুভ্র জোৎস্নার স্নিগ্ধ স্পর্শকেই ভালোবেসেছে। জ্যোতিষ্কের মেলা বসেছে রাত্রির অন্ধকারে, সেদিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকেছে। হুইটম্যানের মতো। হুইটম্যান মাত্র একজনই, আমরা কেউ হুইটম্যান নই,তবু একদিক দিয়ে, এই চাঁদ আর তারার ব্যাপারে দূরবীনধারী বিজ্ঞানী ছাড়া বাকী আমরা সবাই তো হুইটম্যান: ওই চাঁদ, ওই জ্যোতিষ্কপুঞ্জ যে শুধু পাথর আর বালুকাপিণ্ড আর অগ্নিকুণ্ড এসব কথা আমাদের শুনতে ভালো লাগে না :

When I heard the learned astronomer,
When the proofs, the figures, were ranged in
columns before me,
When I was shown the charts and diagrams,
to add, divide, and measure them,
When I sitting heard the astronomer where he
lectured with much applause in the lecture-room,
How soon unaccountable I became tired and sick,

Till rising and gliding out I wandered off by myself,
In the mystical moist night-air, and from time to time,
Looked up in perfect silence at the stars.

যখন আমি পণ্ডিত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বক্তৃতা শুনলাম,
যখন ভূরি ভূরি প্রমাণ আর অঙ্ক আমার সামনে
স্তূপীকৃত করা হল,
যখন অঙ্ক কষে, মেপে, চার্ট আর নক্সা
আমাকে দেখানো হল,
যখন বক্তৃতা-গৃহে বসে প্রচুর হাততালির মধ্যে আমি
জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে বক্তৃতা করতে শুনলাম,
তখন কেন জানি না শীগগীরই আমি ক্লান্ত
ও পীড়িত হয়ে উঠলাম,
শেষ পর্যন্ত আমি একাই উঠে বেরিয়ে গেলাম
শিশিরভেজা রহস্যময় রাত্রির মুক্ত হাওয়ায়,
এবং ক্ষণে ক্ষণে
সম্পূর্ণ নীরবে চেয়ে রইলাম ঊর্ধ্বাকাশে
তারকাপুঞ্জের পানে।

কিঞ্চিৎ আক্ষেপের কথা এই যে, হুইটম্যান এখানে চাঁদের উল্লেখ করেননি। কেননা, বোঝা যায়, এই বিশেষ রাত্রের বিশেষ সময়টিতে আকাশে চাঁদ ছিল না (থাকলে তিনি তার উল্লেখ করতেন বলে আমার বিশ্বাস)। কিন্তু সেটি বড় ক্ষতি নয়। এখানে বড় লাভ এই যে, বিজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চাঁদতারা বিষয়ক নীরস বক্তৃতা থেকে পালিয়ে হুইটম্যান শিশিরভেজা রহস্যময় রাত্রির মুক্ত হাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন, এবং দাঁড়ালেন আকাশময় ছড়ানো তারকাপুঞ্জের পানে চাইবার জন্য। বিজ্ঞানের কঠোর তথ্য থেকে পালিয়ে অনুভূতির সত্যকে তিনি চাইলেন, মহাবিশ্বের মহাজীবনের স্নিগ্ধ তারকাময় অনুভূতিকে হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে নিজের সত্তার মধ্যে পেতে চাইলেন।

রবীন্দ্রনাথেরও একটি কবিতায় এমনি অনুভবের প্রকাশ আছে, যেমন "তুমি প্রভাতের শুকতারা":

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য,
সে কথা মানবই
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।

কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য,
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশির-বিন্দুর
সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলিফুলের উপমা তুমি...।

জীবন-সায়াহ্নে রচিত এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত কবিতা নয়, কিন্তু এখানে যে অনুভব তা কবিমনেরই অনুভব।

তবে, এখানেও চাঁদ নেই। ঋতুপরিক্রমা রবীন্দ্রনাথকে যেমন মুগ্ধ করেছে, বসন্ত-বৈশাখ-বর্ষা-শরৎ তাঁর অনুভবের জগৎকে যেমন শিহরিত-দোলায়িত-সিক্ত-স্নিগ্ধ করেছে চাঁদ তেমন করেনি। তবু চাঁদ ও তারা তাঁর অনেক কবিতা ও গানের ললাটে দীপ্তি পেয়েছে এবং "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে" গানটি পুরোপুরি চাঁদকে নিয়েই :

নীলগগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশী, ছড়াও কি এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বাল।

চাঁদ রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান বিষয় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালেরও নয়, কিন্তু তাঁর 'সাজাহান' নাটকের একটি গানে এই সুন্দর কথাগুলো আছে :

এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।

সবাই অবশ্য চাঁদকে এই দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। অর্থনৈতিক বঞ্চনায় পীড়িত একজন আধুনিক কবি চাঁদকে ঝলসানো রুটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত কবিরই বা দোষ কি, শেলীর মতো কবিই কি খোলা-চোখে চাঁদকে দেখতে পেরেছেন?

And like a dying lady, lean and pale,
Who totters forth, wrapped in a gauzy veil,
Out of her chamber, led by the insane
And feeble wanderings of her fading brain,
The moon arose up in the murky East
A white and shapeless mass.

এখানে চাঁদের ইমেজ নেই, আছে এক শীর্ণ পাণ্ডুর খড়বড়ে মুমূর্ষু বৃদ্ধার। এই বৃদ্ধার চিন্তাই এখানে প্রধান, চাঁদের নয়। আরেকটি ছোট কবিতায়ঃ

Art thou pale for weariness
Of climbing heaven and gazing on the earth,
Wandering companionless
Among the stars that have a different birth,—
And ever changing, like a joyless eye
That finds no object worth its constancy ?

এখানে চাঁদ চাঁদ নয়, কবির মানসিক অবস্থার প্রতীক। এই দুইটি কবিতাতেই শেলী চাঁদের দিকে তাকিয়েছেন চোখের উপর পুরু পর্দা ঝুলিয়েঃ একটিতে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধার, আরেকটিতে তার নিঃসঙ্গ ক্লান্ত মনের হতাশার। কিন্তু মানুষের ভাগ্য যে এমনি ঘোলাটে দৃষ্টি সকলের নয়। শেলীরই একজন সহযোগী, কাব্য-প্রতিভায় যিনি তাঁর চেয়ে খাটো ছিলেন না, সেই কীট্‌সের "ওড টু এ নাইটিংগেল" কবিতায় নির্মেঘ উজ্জ্বল নীল আকাশের পূর্ণ চাঁদের কী স্নিগ্ধ দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই আড়াইটি চরণের জ্যোতিষ্ক-পুঞ্জের ভিড় থেকে!—

...Tender is the night,
And haply the Queen-Moon is on her throne.
Cluster'd around by all her starry Fays....

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি, ডব্লিউ. এইচ. ডেভিস, মাইনর কবি বলে গণ্য হলেও একমাত্র 'লেইজার' (অবকাশ) নামক কবিতাব জন্য ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে যাঁর স্থান চির-নিশ্চিত তিনি তাঁর "চাঁদ" কবিতায় বলেছেন :

Thy beauty haunts me heart and soul,
Oh thou fair Moon, so close and bright :
Thy beauty makes me like the child,
That cries aloud to own thy light ;
The little child that lifts eacharm
To press thee to her bosom warm.

তারপর ওই কবিতাতেই রাত্রির পাখির গানের সাদা জ্যোৎস্না ঝরছে। ব্লেকের একটি কবিতায় চাঁদ নিঃশব্দ আনন্দের রাত্রির দিকে চেয়ে হাসছে এবং ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের একটি পুরো কবিতায় গাছের ফল, কুকুরের থাবা, কপোতের বুক, ইঁদুরের নখর ও চোখ, নালার মাছ আর কাশবন সবই চাঁদের জ্যোৎস্নার রূপোয় মুড়ে গেছে।

জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে সমালোচকের একটা প্রধান অভিমত এই যে তাঁর কবিতা চিত্ররূপময় অনুভূতিময় বিশুদ্ধ কবিতা, এতে ভাব-চিন্তা তত্ত্ব-চিন্তা কিছুই নেই। কিন্তু কিছু কিছু যে আছে তাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর "আট বছর আগের একদিন" কবিতাটির উৎসারণ মানবজীবন যাপনের একটা চরম মৌলিক হতাশা থেকে; তাঁর "মৃত্যুর আগে" কবিতায় ব্যক্ত সর্বব্যাপ্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রেমের সঙ্গে তুলনা করলে এটা পরিস্কার বোঝা যায়। চরম হতাশা থেকে উৎসারিত বলে "আট বছর আগের একদিন" কবিতায় চাঁদ একটা ভৌতিক রূপ নিয়েই অস্ত গেছে:

> থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে
> চোখ পাল্টায়ে কয়: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
> চমৎকার!
> ধরা যাক্ দু একটা ইঁদুর এবার---'
> হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
> আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো---
> বুড়ি চাঁদটারে আমি
> ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার----

কিন্তু জ্যোৎস্নার শুভ্র-সুন্দর চিত্ররূপও তাঁর কবিতায় আছে:

> কাঁচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল
> চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
> উত্তর সাগরে।

'কুড়ি বছর পরে' নামক কবিতায় চাঁদের এই চিত্ররূপটাই বা কি সুন্দর:

> হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
> সরু-সরু কালো-কালো ডাল-পালা মুখে নিয়ে তার
> শিরীষের অথবা জামের,
> ঝাউয়ের---আমের . . . . . .।

একজন আধুনিক বাঙালী কবিও রোমাণ্টিক মানবীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীতে চাঁদকে দেখতে পেরেছেন। সানাউল হক আধুনিক কবিতার শব্দ-কসরতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পূর্বে, তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায় "এই চাঁদ" কবিতায় লিখেছিলেন:

> প্রথম কখন জানি সেই কোন্ বিস্ময়ের রাতে
> দিগন্ত-জরায়ু হতে অকস্মাৎ নগ্নপদপাতে
> নেমে এলো এই চাঁদ: ক্ষীণতনু আলোক-সম্ভবা।

নীলঘ্রাণস্পর্শশুদ্ধ সৌরলোকসভা
কী রহস্য উদঘাটনে আনন্দ-বিবশা।
ছায়াচ্ছন্ন বনানীর শীর্ষে শীর্ষে কী বিদ্যুৎ-কশা।

*　　　　*　　　　*

জানালার তলে আর জানালার চেরা-চেরা ফাঁকে
সে-রাতের শিশু-চাঁদ জীবনের দাবী নিয়ে জাগে :
তোমার-আমার মন ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে ঝিলমিল
তোমার-আমার চোখ আজো তাই বাসনা-সুনীল।
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্রমে শেষ আলোর পূর্ণিমা
তবু ফের দানা বাঁধে রাঙা-রাঙা জীবনের সোনা :
হাজার বছর আগে এই চাঁদ এনেছিলো যেই অরুণিমা
অমর আকাশতলে সুর তার আজো হয়বোনা।

না, হাজার বছর আগে নয়, বিজ্ঞানীদের মতে বহু শত কোটি বছর আগে। কিন্তু সে তথ্যের তর্ক থাক : মানুষের জীবনের সঙ্গে চাঁদের এই তো সত্যি-কারের আত্মীয়তা।

এই অনেক কবি-চোখের চাঁদ দেখা আর বিজ্ঞানী-চোখের চাঁদ দেখার মধ্যে কি তফাত! কোনো বিজ্ঞানী কি কখনো চাঁদের জন্যে কচি শিশুর মতো কাঁদতে পারবেন এবং সে চাঁদকে কচি কচি হাত দিয়ে গরম বুকে চেপে ধরতে চাইবেন? সে চোখ, সে মন, সেই অপূর্ব ক্ষমতা তাঁরা হারিয়েছেন, এবং আমরাও যাতে হারাই পরোক্ষভাবে সেজন্যেই তো তাঁদের সাধনা। টেলিস্কোপে ক্যামেরা জুড়ে যে চাঁদের ছবি তাঁরা তৈরি করেছেন তা বসন্তরোগীর মুখের মতো ; এবং কখনো তাঁরা চাঁদে গিয়ে পৌঁছুলে সেখানকার কিছু বালু, কিছু মাটি, কিছু পাথরের নমুনাই তাঁরা বয়ে নিয়ে আসবেন না, অনেক ফটো এবং ফিল্মও তুলে নিয়ে আসবেন, তারপর সেই ফটো লাখো লাখো পত্রিকায় ছাপা হবে, সেই ফিল্ম লাখো লাখো প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে এবং বহু কোটি টাকা খরচ করে পৃথিবীর নরনারী যা দেখবে তা শুধু প্রাণহীন পাহাড় ও মরুভূমি। যে-কোনো একদিন জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে চাঁদের দিকে তাকালে অনায়াসে যা দেখা যায় তার চেয়ে কতো নিকৃষ্ট এই দেখা।

তবু তাই একদিন পৃথিবীর নরনারী দেখবে, তা দেখাই এখন তাদের নিয়তি, গ্যাগারিনের রোমাঞ্চকর প্রথম মহাশূন্য-অভিযানের এই হবে পরম পরিণতি। খবরের কাগজে পড়েছি গ্যাগারিনের মহাশূন্য ভ্রমণের পর লাখো লাখো মানুষ চাঁদে যাবার জন্যে আবেদন জানিয়েছে। কী অপূর্ব রোমাঞ্চকর এই মূঢ়তা। সাহারায় হাওয়া আছে, এবং বিজ্ঞানীরা বলেন তার নীচে হ্রদ লুকিয়ে আছেঃ চাঁদের সেসব কিছুই নেই। তবু সে চাঁদে যাওয়ার কী বীরোচিত এই উচ্চাশা। তবু এই ব্যাপার একদিন ঘটবেই, সেখানকার ফটো, ফিল্ম, ভ্রমণকাহিনী মানুষকে উন্মত্ত করে তুলবে, এবং তুলবে খুব শীগগীর। এবং সেইদিন, যেদিন চাঁদের সরেজমিনের ফটো আর ফিল্ম মানুষ দেখবে, সেখান থেকে ফিরে আসা মানুষের অভিজ্ঞতার কথা শুনবে সেদিনই চাঁদের মৃত্যু হবে। তখনো চাঁদ আকাশে ভাসবে এবং পৃথিবী জুড়ে জ্যোৎস্না দেবে কিন্তু কোন্ সচেতন মানুষ তাকে আব সেই পুরোনো চোখ দিয়ে দেখতে পাববে? মানুষের চেতনায, কল্পনায়, অনুভূতিতে চাঁদের চেয়ে তার কলঙ্কটাই তো হয়ে উঠবে বড়।

কিন্তু সেদিন আরেকটি চাঁদের জন্ম হবে। চাঁদে যারা যাবে তারা সেখান থেকে দেখতে পাবে আরেকটি চাঁদ, খুব পুরাতন কিন্তু একেবারেই নতুন, মানুষ আর কখনো দেখেনি এমন একটি চাঁদ, সবুজ-নীল-ধূসব এবং খুব উজ্জ্বল, এবং বর্তমান চাঁদের চেয়ে চারগুণ বড়ো। সে চাঁদ আমাদের পৃথিবী। আমাদের পৃথিবী সমুদ্র-মেখলা শস্য-শ্যামলা তুষারশৈল-কিরীটিনী মরুধূসর যুগ্মশুভ্রমেরু মণ্ডিতা এবং সর্বোপরি বায়ুমণ্ডলসেবিতা: সূর্যকর প্রতিফলিত হয়ে এর রূপ হবে চোখঝলসানো, এবং আবর্তমান পৃথিবী ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার রূপ বদলাবে। চাঁদ থেকে এ হবে একটা অপূর্ব শোভা, একটা দুর্লভ দৃশ্য।

কিন্তু শুধু এই দুর্লভ দৃশ্য উপভোগ করাই নয়, মানুষের মনে আসবে কি সেই মানবিক অনুভবের বিপ্লব যা এ অবস্থায় স্বাভাবিক? অথবা চাঁদ হয়ে উঠবে একটা বক্তৃতামঞ্চ, রাজনৈতিক দর্শনের পীঠভূমি, পৃথিবীর শেষ যুদ্ধের অস্ত্রাগার অথবা গুপ্তচরের আড্ডা, যা করার জন্যে রাজনীতিকরা উদ্‌গ্রীব? মানুষ যখন পৃথিবীর দিগন্তের চক্র-সীমা অতিক্রম করবে তখন সে পৃথিবীকে দেখতে পাবে মহাশূন্যে ভাসমান একটা গোল মৃত্তিকা-পিণ্ডরূপে; সেই মুহূর্তে এই পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়াই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক।

এইটেই স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর প্রাচ্য ভূখণ্ডের মানুষ যেমন পশ্চিম ভূখণ্ডের সব মানুষকেই দেখে শ্বেতাঙ্গরূপে, পাশ্চাত্তোর মানুষ যেমন প্রাচ্যের সব মানুষকেই দেখে অশ্বেতাঙ্গরূপে তেমনিভাবে, না, তার চেয়েও মহৎভাবে, পুরনো চাঁদের অভিযাত্রী নতুন চাঁদের মানুষকে দেখবে শুধু মানুষরূপে। প্রবাসীর কাছে যেমন তার জন্মভূমির বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, মহৎ ও হীন সব মানুষই প্রিয় ও প্রেয় হয়ে ওঠে ফুলের কুঞ্জ আর খাল-নালা-ডোবা সবই সুন্দর মনে হয়, সবই মনকে দুরন্তবেগে টানে, তেমনি সেই অভিযাত্রী পৃথিবীর সব মানুষকে শুধু মানুষ বলে ভাবতে পারবে, ভালোবাসতে পারবে। ইংরেজ সৈনিক-কবি রিউপার্ট ব্রুক অনেক সুন্দর জিনিসের সঙ্গে অসুন্দর জিনিসকেও ভালোবাসতে পেরেছিলেন: তিনি ভালোবেসেছিলেন সাদা থালা ও বাটি, নরম ধূলো, ভেজা ছাদ, রুটির কড়া আবরণ, কাঠের নীল ধোঁয়া, কর্কশ কম্বল, মাটির গর্ত, পুরনো কাপড়ের গন্ধ, শরীরের বেদনা, ট্রেনের হাঁপানী। এবং এই আকাঙক্ষা তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে লোকে যেন বলে যে তিনি ছিলেন প্রেমিক। তিনি মহৎ প্রেমিক নিশ্চয়ই, আর তাঁর সেই কবিতার নামও 'মহৎ প্রেমিক'। চাঁদের অভিযাত্রী যদি কোনো রাজনৈতিক মন্ত্রণা নিয়ে সেখানে না যান তবে তিনি যে এমনি মহৎ প্রেমিক হবেন এই তো স্বাভাবিক। এই তো স্বাভাবিক যে তিনি অনুভব করবেন এবং সব মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইবেন এই মহান, এই অপূর্ব, এই স্বর্গীয় অনুভব যে পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা আর কিছু নয়, শুধু মানুষ—তারা হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, খ্রীস্টান নয়, বৌদ্ধ নয়, শ্বেতাঙ্গ নয়, কৃষ্ণকায় নয়, ধনী নয়, দরিদ্র নয়। তিনি সকল ধর্ম সকল বর্ণ সকল রাজনীতির চামড়ার মধ্য দিয়ে দেখতে পাবেন একই রকম প্রগাঢ় ও উষ্ণ মানবিক হৃদয়ের স্পন্দন। তিনি বলতে পারবেন:

এইসব মানুষেরই রক্ত আছে,
সেই রক্তে রয়েছে উষ্ণতা,
এইসব মানুষেরই রক্ত লাল, লাল,
এইসব মানুষেরই রক্ত হয় অনেক সময়
মত্ত তুফানের বেগে উদ্দাম, উত্তাল।
এইসব মানুষেই রয়েছে হৃদয়। ... ...
শোণিতের লালে-লালে হৃদযেব রঙে-রঙে
অতলান্ত কি ভূমধ্যসাগরের নেই ব্যবধান,
এদের দু'তীরে যারা মানুষের পেয়েছে সম্মান

আর যারা পায়নি সম্মান
তাদের সবারে আমি ভালোবাসিয়াছি।

আমার আনন্দ, আমি মানুষকে জেনেছি মানুষ
আমার আনন্দ, আমি মানুষকে ভালোবাসিয়াছি।

চাঁদে গেলে যদি সব বর্ণ সব ধর্মের বৈষম্য বিলোপ পায়, যদি মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে, তবেই নতুন চাঁদের জন্ম সার্থক হবে, আর পুরানো চাঁদের হবে পুনর্জন্ম। পুরানো চাঁদ থেকে একটা নব মানবীয় দর্শনের শুভ্র দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবে, সে দীপ্তিতে স্নাত হয়ে পবিত্র হয়ে উঠবে নবজাত চাঁদ। তা যদি না হয় তবে অন্তত একটি চাঁদের মৃত্যু হবে. এবং সে মৃত্যুতে সংক্রামিত হবে আরেকটি চাঁদ।

১৯৬১

প্রান্তীয় সাহিত্যিক

সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেক সময়েই স্তরবিভাগ করা হয় প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণী হিসাবে, কখনো বা অন্যভাবে, কিন্তু এমন সাহিত্যিকের সংখ্যা নেহাত কম নয় যাঁরা হয়তো এসবের কোনোটিতেই পড়েন না। যে কোনো উত্তম সাহিত্যিকের মতোই তাঁরা সাধনা করেন, গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা লেখেন, সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত থাকেন, কিন্তু তাঁদের রচনা ক্ষণজীবী। তাঁদের অনেকেরই রচনা ছাপা হয় না, হলে লোকে পড়ে না, পড়লেও অচিরেই ভুলে যায়। অনেক সময় সমালোচকরা এঁদেরকেই ফেলেন সর্বশেষ শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে, অনেকে তাতেও অনিচ্ছুক। এই স্তরের সাহিত্যিকদের অবস্থিতি সাহিত্য-জগতের প্রান্তভাগে—এ জগতের স্পর্শ তাঁরা পেয়েছেন, সাহিত্যিকও এক হিসাবে তাঁরা ঠিকই, কিন্তু তাঁদের রচনা গদ্যে ও পদ্যে রচনাই শুধু হয়, সাহিত্য হয়ে ওঠে না। এ তথ্যটি অবশ্য তাঁদের ছাড়া আর সকলেরই জানা থাকে। তাঁদের রচনা যে সাহিত্য বলে গণ্য হয় না তার কারণ গণনীয় সাহিত্য তাঁরা রচনা করতে পারেন না, সে ক্ষমতা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। কিন্তু তা বলে সাহিত্যচর্চায় তাঁরা পশ্চাদপদ নন, অন্তত যতদিন সম্ভব তাঁরা এ-চর্চা ছাড়েন না, অন্য যে কোনো উত্তম সাহিত্যিকের মতোই তাঁরা সাহিত্যের জন্যে উৎসর্গিতপ্রাণ।

এই শ্রেণীর সাহিত্যিক অন্তত সাহিত্যিক-মহলে সুপরিচিত—ব্যক্তিগতভাবে প্রায়ই নয়, তবে শ্রেণীগতভাবে নিশ্চয়ই। যে কোনো মানের পত্রিকা-সম্পাদক মাত্রেই এঁদের চেনেন—বস্তুত সম্পাদকদের টেবিলে এঁদের লেখাই পৌঁছে থাকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে। দামে এঁদের লেখা ভারী নয়, কিন্তু ওজনে নিশ্চয়ই; গুণে তাঁরা গণ্যমান্য নন, কিন্তু গণনায় অগণ্য। এঁদের মধ্যে সব বয়সের এবং সব রকম মতামতেরই

লেখক থাকেন; এঁদের মধ্যে থাকেন রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী, দক্ষিণ-পন্থী ও বামপন্থী, কিন্তু সম্পাদকেরা সাধারণত এঁদের প্রতি বাম। সম্পাদকদের বাজে কাগজের ঝুড়ি প্রধানত এঁদের লেখাতেই ভর্তি হয়ে থাকে। আনন্দময় অভিজ্ঞতা এ অবশ্যই নয়, তবে এরূপ অভিজ্ঞতা প্রতিভাধরদেরও অনেক সময় হয়ে থাকে। নজরুলের হয়েছিল। 'কবিতা-সমাধি'' নামে তাঁর প্রথম কবি-জীবনের একটা কবিতায় সে ইতিহাস বিধৃত রয়েছে:

পরিশ্রমে গলদঘর্ম,---সারা নিশি জেগে
ভাবিনিরে মুহুর্মুহু লাথ্যাঘাতি রেগে,
সে কি লেখা লেখিলাম মহা মহা পদ্য!
অক্ষর একুন করি যোজিলাম চৌদ্দ!
মৃচ্ছকটিক আর শব্দসার ভ্রমি'।
আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি!
রচিলাম কি বিকট ছন্দ বাছি বাছি,
জাহাজে বেঁধেছে যেন শত শক্ত কাছি!
কবিদের ভাব সব 'না-বলিয়া-নিয়া'
সাহিত্য-আসরে এনু গুম্ফ আস্ফালিয়া!
এ লেখা কি ব্যর্থ হয়?---তবে নাম মিছে!
''বাঃ ভাই!'' বন্ধুরা কয় দন্ত-সঙ খিঁচে!
চাটুবাক্যে লুব্ধ হয়ে কবিতারাশিকে
পাঠালাম ছোট বড় সকল মাসিকে।
সম্পাদক অভদ্র সে না দেয় উত্তর,
বিষম রুখিয়া শেষে লিখিনু ''দুস্তোর।
টিকিট খেয়েছ মম,---যেতে দাও;----এবে
হে ভদ্র, কবিতাগুলি ফিরায়ে কি দেবে?''
শেষে সে সহস্র পত্র লেখার দরুন
'রিপ্লাই' আসিল ওহো, ভীষণ করুণ
''অবশ্য, কিছুও তা'র পাই যদি ঘেঁটে---
কবিতা-সমাধিপূত পেপার-বাস্কেটে'' !!!

এটি নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা, প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৬ সালে। ব্যর্থ-মনোরথ তরুণ কবির নৈরাশ্য ও বিক্ষোভ এতে সোচ্চার। এই নৈরাশ্য ও বিক্ষোভ অধিকাংশ উমেদার তরুণ লেখকেরই, এবং প্রান্তীয় সাহিত্যিকেরও। তবে নজরুলের থেকে প্রান্তীয় সাহিত্যিকের

তফাত এই যে, নজরুলের মতো প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিকদের ক্রম-বিকাশ এবং অনেক সময় দ্রুত বিকাশ আছে, এবং আছে উজ্জ্বল দীপ্তি, কিন্তু প্রান্তীয় সাহিত্যিকদের বিকাশ অতি মন্থর, এবং কখনো বা একেবারেই নাস্তি। নজরুল একদিন 'বিদ্রোহী' রচনা করেন এবং দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু লঙ্ঘন করে যান, কিন্তু এ একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। এর পেছনে সাধনা ও বিকাশের ইতিহাস আছে। কিন্তু বিকাশ নেই বলে প্রান্তীয় সাহিত্যিককে অনেক সময় পেপার বাস্কেটের অনুচ্চ দেওয়ালের মধ্যেই স্থান নিতে হয়।

তবে পেপার-বাস্কেট সব প্রান্তীয় সাহিত্যিকেরই একমাত্র গতি নয়। কারো কারো অজস্র লেখা বেরোয়, কারো বা বই—এমন কি অজস্র বই। বের করেন, পয়সা থাকলে, তাঁদের কেউ কেউ নিজেই; বের করেন পৃষ্ঠপোষক, কেননা পৃথিবীতে সব রকম লেখকেরই পৃষ্ঠপোষক থাকা সম্ভব; এবং কখনো কখনো প্রকাশকরাও তাঁদের বই ছাপেন, এমনকি আগ্রহের সঙ্গে; সকলের আগে ছাপেন—সিরিজের পর সিরিজ ছাপেন—বিশেষ করে 'জনপ্রিয়' উপন্যাস। ইতিপূর্বে বলেছি সম্পাদকেরা সাধারণত এইসব লেখকের প্রতি বাম; তাঁদের প্রতি বাম অনেক সময় প্রকাশকরাও; কিন্তু সব সময় নয়। এই উক্তি কিছুটা সংশোধন করে বলা যায়, অনেক সময় প্রকাশকদের কাছে প্রান্তীয় লেখকদেরই সমধিক সমাদর; বিশেষ করে উপন্যাসের বেলায়। উন্নত মানের লেখকেরা তাঁদের কাছে ভিড়তেই সাহস পান না। তবে একথাও ঠিক, প্রান্তীয় লেখকদের মধ্যে শুধু ঔপন্যাসিকই থাকেন না, সব রকমের লেখকই থাকেন—থাকেন গল্পলেখক, নাট্যকার, কবি, চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। প্রভাবের দিকে দিয়ে এঁদের মধ্যে ঔপন্যাসিকের পরেই কবি ও নাট্যকারের স্থান। সমাজের চোখের সামনে থাকেন এরা সবচেয়ে বেশী। সুযোগ পেলেই এঁরা সভাসমিতিতে নিজেদের কবিতা আবৃত্তি করেন, এবং এঁদের লেখা নাটক সৌখিন ও নবিশ নাট্যসম্প্রদায় (অনেক সময় তাঁদেরই উদ্যোগে গঠিত) যত্রতত্র অভিনয় করে থাকে।

এত করেও সাহিত্যের কৌলিন্য প্রান্তীয় সাহিত্যিকদের জন্যে দুরাশা, এই হচ্ছে সাহিত্যের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। তাই বলে সামাজিক ক্ষেত্রে এঁরা সর্বদাই অকুলীন নন। এঁদের মধ্যে কেরানী থেকে প্রধানমন্ত্রী, কপর্দকহীন থেকে জমিদার, খোন্দকার থেকে খান বাহাদুর, নন-ম্যাট্রিকুলেট

থেকে ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক—সব স্তরের মানুষই থাকেন। নিকৃষ্ট রচনাই প্রধানত এঁদের কলম থেকে বেরোয়, ফরহাদের মতো সাহিত্যের পাহাড় কেটেও অনেকে ছাপানো নামের শিরিন-প্রিয়ার সাক্ষাৎ হয়তো পান না, অন্তত উত্তম পত্রিকার মুদ্রিত পৃষ্ঠার রচনাকুঞ্জে। এসব পত্রিকার সম্পাদক এবং তাঁর সহকারীর চাকরি বজায় থাকার অন্যতম যৌক্তিকতাই হচ্ছে এইসব লেখকের লেখা বাতিল করার যোগ্যতা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁদের অবদান নগণ্য।

কলম ধরার আগে বই ও পত্রিকা পড়াই সর্বজনীন নিয়ম—কলম চলার সঙ্গে সঙ্গেও তাই। খোঁজ করলে দেখা যাবে, এই সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্যের উত্তম পাঠকের সংখ্যা কম নয়। পাড়ায় পাড়ায় এঁরাই পাঠচক্র ও সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন, অনেকে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও। সাহিত্য-সংঘও এঁরা গড়ে থাকেন, এইসব সংঘের মারফত এঁরা সাহিত্য-ভূষণ, সাহিত্যরত্ন, কাব্য-বিনোদ ইত্যাদি উপাধি বণ্টন করেন এবং নিজেরাও পেয়ে থাকেন। নিকৃষ্ট রচনার উদাহরণ উপস্থিত করে এঁরা নিকৃষ্ট রচনাতেই উৎসাহ দেন—কিন্তু সব সময়েই কি তাই? বিলিতী ডিগ্রীধারীরও যেমন স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষকের হাতেখড়ি, তেমনি অনেক উত্তম লেখকেরই হাতেখড়ি এইসব সাহিত্যিকের প্রচ্ছায়ায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়।

প্রতিভাবান সাহিত্যিক থাকলেও যেমন গৌণ লেখকদের বিশেষ মূল্য আছে, তেমনি গৌণ লেখক গড়ে তোলার ব্যাপারে ততোধিক গৌণ এইসব সাহিত্যিকদের সার্থক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু আরও একদিক দিয়ে এঁদের সাধনার প্রচুর সার্থকতা রয়েছে। সাহিত্যপত্রিকাই (অথবা অন্যান্য পত্রিকার সাহিত্য-বিভাগ) আজকাল পাঠক মজলিসে প্রবেশের প্রথম টিকিট। এইসব পত্রিকা ভালভাবে না চলাটা সকলের পক্ষেই অকল্যাণ-জনক। কিন্তু শুধু প্রতিভাবানদের লেখা দিয়ে পত্রিকা চলে না। একে তো তাঁদের পক্ষে সারা জীবন ধরে সব পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার জন্যে উচ্চমানের লেখা তৈরি করা সম্ভব নয়, তার উপর শুধু তাঁদের লেখা দিয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরে না। তা ছাড়া তাঁদের জন্যেও চাই বিশ্রাম, চাই কতকগুলো ক্ষান্ত-লেখনী মুহূর্ত, নইলে তাঁদের রচনায় ক্লান্ত স্বরই প্রাধান্য পাবে। সেইসব মুহূর্ত ভরে তোলেন প্রান্তীয় সাহিত্যিক। বস্তুত তাঁদের

লেখা না হলে অনেক সাহিত্য-পত্রিকারই পৃষ্ঠা ভরে না। প্রতিভাবানদের রচনা সব সময় চিত্তাকর্ষক হয় না, সব সময় উন্নত মানেরও হয় না। কবিগানের আসরে কবিয়াল একাই আসর জমিয়ে তুলতে পারেন না, তাঁর জন্যে দোহারের প্রয়োজন। মোশায়েরার ঐতিহ্য বাংলাকাব্যের নেই, নেই ইংরেজী এবং আরও বহু কাব্যেরই, কিন্তু পাঠকসমাজকে ধরে রাখতে হলে দু'চারজন প্রতিভাবানকে দিয়ে চলে না, সেজন্য চাই সমগ্র কবিকুলের সমবেত উদ্যম। এ উদ্যমে প্রান্তীয় কবিদের ভূমিকা কম মূল্যবান নয়। তা ছাড়া সব প্রতিভাবানই প্রথমে গৌণ লেখক হিসাবে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন এবং এটাও দুর্লভ ঘটনা নয় যে প্রতিভাবান তাঁর পূর্ণ সৃষ্টি-ক্ষমতার পর্যায়েও বহুদিন অবহেলিত অবিদিত অস্বীকৃত থেকে যান, কারো বা স্বীকৃতিলাভ ঘটে মৃত্যুরও বহুকাল পরে। অতএব যাঁরা গৌণ সাহিত্যিক, অথবা গৌণ না হলেও বর্তমান মুহূর্তে যাঁদেরকে গৌণ সাহিত্যিক বলে মনে হয়, সাহিত্যের আসরে তাঁদের ভূমিকা গৌণ নয়।

এই যে গৌণ লেখক-সম্প্রদায়, এঁরা কিছু দীপ্তি পেয়ে থাকেন প্রতিভাবানদের কাছ থেকে, কিন্তু এঁদের সাধনায় আমাদের আলোচ্য সেই প্রান্তীয় সাহিত্যিকদের কিছু আদর্শ, কিছু প্রেরণা সক্রিয় থাকে বৈকি। সাহিত্য-সাধনার ও সাহিত্য-চর্চার পরিবেশ গড়ে তুলতে এঁদের অবদানের বেশ-কিছু মূল্য আছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁদের কাছে ঋণী ও গৌণ মুখ্য সব লেখকই। সাধারণ ও ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ে তোলার ব্যাপারে এঁদের ভূমিকার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে; এই প্রান্তীয় সাহিত্যিকরা না থাকলে অনেকগুলো পত্রিকাই চলতো না এবং অনেকগুলো পত্রিকা নীলামী ইস্তাহার ছাড়া আর কিছু হতো না। দুনিয়ায় যদি শুধুই 'চতুরঙ্গ' বা Criterion-এর মতো পত্রিকা বেরোতো, যদি শুধুই 'বলাকা' বা Waste Land-এর মতো কবিতা লেখা হতো, তবে সাহিত্য মানুষের আরও বেশী প্রিয় হয়ে উঠত এমন কথা জোর করে বলা যায় না। আলোকের দীপ্তির মূল্য বুঝতে হলে অন্ধকার চাই এই সহজ কথাটা বাদ দিলেও, পাঠক-সমাজ সম্বন্ধে একটা অতি সুবিদিত অভিজ্ঞতা এই যে দুনিয়ার অনেক পাঠক—এমনকি হয়তো জোর করেই বলা চলে যে অধিকাংশ পাঠক—উল্লিখিত মানের পত্রিকা ও কাব্য পছন্দ করে না, পড়ে না, পড়ে বুঝতে পারে না। তাদের জন্যে চাই সাধারণ স্তরের পত্রিকা, সাধারণ সাহিত্য। সাধারণ পত্রিকা ছাপা না হলে,

সাধারণ কাব্যসাহিত্য লেখা না হলে তারা হয়তো কিছুই পড়তো না, পড়তে চাইতো না। তাদের পড়ার অভ্যাসকে যাঁরা বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁদের সাধনার কিছুই মূল্য নেই একথা মেনে নেওয়া অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আরো একদিক দিয়ে তাঁদের সাধনার মূল্য এইখানে যে, তাঁরা সাহিত্যিক প্রত্যাশার মূর্ত প্রতীক, সাহিত্য-সাধনার মূর্ত প্রেরণা। পাঠক-সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ তাঁদেরকে দিয়ে গঠিত। পত্রিকা-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হবার আশায় তাঁরা প্রতিভাবান থেকে শুরু করে নবা ও চতুর উমেদার পর্যন্ত সকলেরই অনুকরণ করেন, কিন্তু তাঁরা সাধারণত সাহিত্যের মিছিলের অতন্দ্র দর্শক বলে, অক্লান্ত আশাবাদী পাঠক বলে সাহিত্যের স্ফুরণে ও বিকাশে, সাহিত্যিকদের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রীতির আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষণায় তাঁদের ভূমিকা খুব মূল্যবান। উৎকৃষ্ট সৃষ্টিক্ষম সাহিত্যিক এঁরা নন, তবে রচনা-ক্ষমতাহীন পাঠকও এঁরা নন। এই দুটি সম্প্রদায়ের মাঝখানে এঁদের অবস্থিতি। বরং সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গেই এঁদের রক্তের সম্পর্ক। সৃষ্টিচঞ্চল সাহিত্য-জগতে এঁদের সম্পূর্ণ প্রবেশলাভ না ঘটে থাকতে পারে, তবে তার প্রান্তভাগেই এঁদের অবস্থিতি। এঁদের বাহ্যত-মূল্যহীন রচনাস্তূপের উপর গৌণ ও মুখ্য সাহিত্যিকরা দাঁড়ান বলেই তাঁদের প্রতি পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং এঁদের সকলের রচনাস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন বলেই দুর্লভ প্রতিভাবানেরা সহজে সকলের নজরে পড়েন। তাঁদের গৌরবের সৌধ-রচনার ইট-চুন-বালি-পাথর জুগিয়ে থাকেন আর সবাই, এবং বিশেষ করে প্রান্তীয় সাহিত্যিক।

১৯৬০

আমার গ্রন্থাগার

এ প্রসঙ্গের শিরোনামা হয়তো অনেকেরই মনে একটা বিরাট-কিছুর চিত্র এঁকে দেবে: ঘর-ভরতি আলমারী, বুক-কেস, র‍্যাক—সমস্তই বইয়ে ঠাঁসা-ঠাঁসি, তার পরেও ঘরের এদিকে-ওদিকে আরও কত বই ও পত্রিকার স্তূপ...। না, আমার গ্রন্থাগার ওরকম বিরাট-কিছু নয়। এ নিতান্তই ছোটখাট ব্যাপার। আমার বইয়ের সংখ্যা গর্ব করার মতো নয়; উল্লেখ করার মতোও নয়। আমার বইগুলো ঘরের একদিকে সবিনয়ে সামান্য একটুখানি জায়গা দখল করে থাকে। যে-ঘরে বইগুলো আছে, তাকে যদি আগার বলা হয়, আর বইগুলোকে বলা হয় গ্রন্থ তবেই বলা চলে যে আমার একটা নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে। নইলে উপরের শিরোনামটা নিতান্তই একটা অপপ্রয়োগ। তবু কেউ যদি জানতেন ওই শিরোনামটার মধ্যে আমার কতখানি বাসনা লুকানো আছে... ...।

আমি একটা নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে তুলবো—এ আমার বহু বছরের ইচ্ছা। বইও মাঝে মাঝে কিনি, তবে যথেষ্ট কেনা হয়ে ওঠে না, অতএব আমার গ্রন্থাগার এখনো তেমন চোখে লাগবার মতো হয়ে ওঠেনি। আমার গ্রন্থাগারকে সুপুরীগাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে: সময়ের দিক দিয়ে তার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ, কিন্তু শরীর তার লিকলিকেই রয়ে গেল, আজও সে শরীরে স্থূলতা এলো না। এ জন্যে আমার মনে অতৃপ্তির সীমা নেই। সারা দুনিয়ার কথা বলব না, আমি যে দুটি ভাষা মোটামুটি জানি, সেই বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রতি মাসে কত ভাল বই-ই না প্রকাশিত হচ্ছে। কাগজে-কাগজে সে-সব বইয়ের প্রশংসা, ভাগ্যবান পাঠকদের মুখে-মুখে সে-সব বইয়ের গল্প। সে-সব বইয়ের কিছুকিছু ঢাকায়ও আসে; কিন্তু কয়জন, এমনকি কয়টি লাইব্রেরী সে-সব বই কিনতে পারে অথবা কেনে? বইয়ের দোকানে

সাজানো সে-সব বই চোখকে তৃপ্তি হয়তো দেয়, কিন্তু মনকে দেয় অতৃপ্তি। আমি জানি, ওসব বইয়ের অনেকগুলোই আমি হয়তো কখনই পড়ব না। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যায়। আমি জানি শুধু আমি নই, অনেকেই অনেক বই পড়বে না, পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু আকাঙক্ষার শেষ নেই। সেই সময়ে মনে হয়, আহা, আমি যদি কোনো বইয়ের দোকানের মালিক হতাম! ব্যবসা সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, ব্যবসায়ীর মেজাজও হয়তো আমার নেই। তবু কোনোদিন যদি ব্যবসা করি, তবে বইয়ের ব্যবসায়ই করব, এ আমার বহু বছরের নিষ্ক্রিয় সংকল্প।

আমার বইগুলো বেশীর ভাগই কেনা, তবে সবই কেনা নয়। কিছু বই দিয়েছেন পত্রিকা সম্পাদকরা এবং প্রকাশকরা সমালোচনার জন্যে; কিছু বই দিয়েছেন লেখক-বন্ধুরা, এবং দুএকটি বই পড়তে এনে আর ফেরত দেওয়া হয়নি। তবে সেসবই ছাত্রপাঠ্য বই, এবং যাঁদের বই তাঁরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, এবং ও বই তাঁরা দিয়েও দিয়েছেন। এছাড়া আর সকলেই বই নিয়ে যথারীতি ফেরত দিয়েছি, কারো মনোকষ্টের কারণ হইনি। ওইটেই আমার চিরকালের অভ্যাস। আমার বোধ হয় একটুখানি ব্যবসায়ী বুদ্ধি আছে। আমি জানি যে পাঁচজনের কাছে আমাকে বই কর্জ করতে হবে, কিন্তু একবার যদি দুর্নাম হয়ে যায় তখন? যে ব্যাঙ্কের উপর ভরসা নেই তার কাছে লোকে টাকা আমানত রাখবে কেন? এইজন্যে কর্জ নেওয়া বই আমি শুধু যে ফেরত দেই তা নয়, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়িই ফেরত দেই।

কিন্তু সবাই তা করেন না। আর এজন্যে মাঝে মাঝে আমাকে ভারী ভুগতে হয়। আমার বইয়ের সংখ্যা বেশী না হলে কি হবে, মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের নেকনজর ওদের উপর পড়ে যায়। তাঁরা এসেছেন, গল্প করছেন, তারপর বই নাড়তে-চাড়তে এক সময় বলেন, 'বইটা কি নিতে পারি?' 'না' বলতে ভদ্রতায় বাধে, অতএব দিতে হয়। তারপর যতদিন সে বই ফেরত না পাই ততদিন আমার উদ্বেগের অন্ত থাকে না। কেউ শিগগীরই বই ফেরত দেন, কেউ দেন না। সে ক্ষেত্রে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর প্রথমে আভাসে ইঙ্গিতে, তারপর প্রকাশ্যেই বইখানা চাইতে শুরু করি। তাতেও না হলে এক সময় তাঁদের কাছে যাওয়া আসা আরম্ভ করি: বই চাইতে নয়, বেড়াতে। সময়ে-অসময়ে অতিথির আগমন সকলের বাঞ্ছিত নয়। বন্ধুরা একদিন মনে মনে বিরক্ত হয়ে বইখানা ফেরত দিয়ে আমার হাত

থেকে নিষ্কৃতি পান। জানি যে বই নিয়ে এই টানা-হ্যাঁচড়া বন্ধুত্বের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনকূল নয়, কিন্তু উপায় কি! বই যে আমার ফেরত পেতেই হবে। মানুষের জীবনে সকল বন্ধুত্বই তো চিরস্থায়ী নয়। চোখের আড়াল হয়ে গেলে, জীবনের স্রোতের টানে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে, এবং কখনো বা মনের, প্রকৃতির ও রুচির অমিল দেখা দিলে বহু ক্ষেত্রেই বন্ধুত্বের বাঁধন আস্তে আস্তে ঢিলে হয়ে যায়। তারপর কখন্ এক সময় আলগা হয়ে যায়। মানুষের বন্ধুত্ব জিনিসটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অস্থায়ী, অনিশ্চিত। কিন্তু বইকে বন্ধু হিসাবে নিতে পারলে কেউ ঠকে না। যতই দিন যায় ততই এ বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। দিনে ও রাত্রে, আনন্দে ও বিষাদে, বিরহে ও মিলনে, রোগশয্যায় ও ভ্রমণে, জীবনের সব রকম মুহূর্তে সবচেয়ে নির্ভরশীল সঙ্গী হচ্ছে বই। যে-সব মানুষ এদের লিখেছেন, তাঁরা আমার চেয়ে বড়, কিন্তু তাঁদের বই-গুলো সর্বদাই আমার সামনে বিনীত, অনুগত। তাদের কোনো দাবি, আবদার, জুলুম, অবাধ্যতা, পীড়াপীড়ি, কোলাহল, অসম্মতি নেই। তারা সব সময়েই তৈরী রয়েছে আপনার শেল্‌ফে, আলমারীতে, র‍্যাকে। ইচ্ছা হয়, পড়ুন। আর যদি ইচ্ছা না হয়, তবে কোনো তাগাদা নেই। মনের সম্পদের দিক দিয়ে তারা উঁচু হলেও আনন্দ পরিবেশনের বেলায় তারা একান্তই অনুগত। তাই কাজটা অপ্রীতিকর হচ্ছে বুঝেও ধার দেওয়া বইয়ের জন্যে তাগাদা দিতে আমি কখনো ক্লান্তিবোধ করি না।

কিন্তু আরেক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা আমাকে সময় সময় গুরুতর সমস্যায় ফেলে দেন। মাঝে মাঝে অফিস থেকে বাড়ী ফিরে জানতে পারি এই মিসেস বা ওই মিস বেড়াতে এসেছিলেন এবং যাবার সময় একখানা বই নিয়ে গেছেন। শুনে আমি কোনোদিনই পুলক বোধ করি না। কেননা, প্রায়ই দেখি তাঁরা কোমলহৃদয়া কোমলপাণি হলে কি হবে, কঠোর হাতে আমার সযত্ন-সাজানো বইগুলোর ঘণ্ট পাকিয়ে রেখে গেছেন। এইভাবে নিয়ে যাওয়া বই ফেরত পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। তবে এ-ব্যাপারে একটুখানি সুবিধা এই যে, তাঁদের অন্দর-মহলে লোক পাঠাবার মতো উপায় আমার আছে, এবং আছে বলেই অধিকাংশ বইয়ের উদ্ধার শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়। তারপর বই ফেরত পেলে দেখি, হয়তো মলাট খসে গেছে, নয়তো ঢিলে হয়ে গেছে, নয়তো আর কোনো ক্ষতি হয়েছে। মনটা খিচঁড়ে যায়, কিন্তু কাকে কি বলি? আপাদমস্তক নিজেদের পরিপাটি করে সাজানোই যাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনা, তাঁরা

পরের বই নিয়ে কারবালাকাণ্ড করতে পারেন কেমন করে, ভেবে পাই না।

এইসব পাঠিকা নিয়ে বিপদ এই যে, এঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই কোনদিন আমার মুখোমুখি সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। অতএব, আমার অসম্মতি বা আপত্তি বা বিরক্তির কথা তাঁরা কোনোদিনই জানতে পারবেন না। এঁদের বেলায় আমি অসহায়, নাচার। আমি এঁদের ভয় করি এবং সত্যি বলতে কি, আমি এঁদেরই ভয়ে গল্প-উপন্যাস কেনা এক রকম ছেড়েই দিয়েছি। যে কয়েকখানি আছে তাদের বাঁচাবার জন্য আমি সম্প্রতি একটা নতুন পথ ধরেছি। দু'একখানি করে রহস্যরোমাঞ্চ এবং ছবি-ভরপুর সিনেমা-সাময়িকী কিনতে শুরু করেছি। এবং খুশীর কথা, তাঁরা আর ভালো বইয়ের তেমন ছায়া মাড়ান না। বুঝি যে নীতিগতভাবে কাজটা ভালো হচ্ছে না, আমি তাঁদের কড়া মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্যে অরুচি ধরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার বইগুলো একে একে উধাও হয়ে যাবে এবং তারপর নষ্ট হবে বা হারিয়ে যাবে, তাই বা কোন্ সুনীতির কথা ?

এরকম সতর্ক থাকি বলেই আমার প্রায় বইই এখনো স্বস্থানে আছে। কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে, নির্বিবাদে নয়। ওই যে বললাম, ওদের স্বস্থানে রাখার অনেক ঝকমারী। ওদের শত্রু অনেক : অতিথি, অভ্যাগত, গ্রন্থকীট, আর-শোলা। প্রত্যেকের নজর আমার বইগুলোর দিকে। নানা উপায়ে আমি তাদের হাত থেকে বইগুলো বাঁচিয়ে রাখি। আমার গ্রন্থাগারকে সময় সময় মনে হয় অশান্ত নদীর বুকে জেগে-ওঠা ছোট্ট একখানি চরের মতো ; লুব্ধ ঢেউয়েরা খামচায় খামচায় তার মাটি খসিয়ে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত হানা দিচ্ছে, আর সে হানাকে ব্যর্থ করার জন্য আমি নানা রকম ফন্দি আঁটছি। আমার বইগুলোকে নিয়ে এই আমার চির-স্থায়ী উদ্বেগ আর এই আমার চিরস্থায়ী রোমান্স।

১৯৫৮

নামায়ন

আমার মূল বক্তব্যে আসবার আগে একটা অতি-পরিচিত এবং অতি-ব্যবহৃত কথার উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। কেননা "নামে কি আসে যায়, গোলাপকে যে নামেই ডাক ও একই রকম মিষ্টি থাকবে" একথা বার বার আবৃত্তি করেও যে এর আবেদন শেষ হয়ে যায় না। প্রেমের এক উন্মাদনাময় মুহূর্তে জুলিয়েট তার প্রেমিককে ওই কথা বলেছিল। তারপর কত যুগ কেটে গেছে, কিন্তু এই সুন্দর বাণী আজো স্মরণীয় হয়ে আছে, এবং চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেও। একটা চিরসত্যই এ বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে, এবং রোমিও আর জুলিয়েট নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। মানুষের সৌভাগ্য বলতে হবে, এই স্বার্থপর ও লালসা-পঙ্কিল পৃথিবীতে এমনি রোমিও-জুলিয়েটের আজো অভাব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। নাম সম্পর্কে কোনোরূপ অগ্র—পশ্চাৎ ডাহিন-বাম বিবেচনা না করেই তরুণ-তরুণীরা চিরদিন প্রেমে পড়ে এসেছে, এবং ভবিষ্যতেও পড়বে।

কিন্তু দুনিয়ার আরও বহু সত্যের মতো এ সত্যেরও ব্যতিক্রম আছে। মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার সব জুলিয়েটই শেক্সপীয়ারের জুলিয়েটের মতো তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরী নয়। যদিও আলাপের মধ্যখানে জুলিয়েটের মুখ দিয়ে সময় সময় আস্ত-আস্ত শেক্সপীরীয় টাইপের সনেট বেরিয়ে এসেছে, তবু একথা সত্য যে, একালের অসংখ্য জুলিয়েট শেক্সপীয়ারের জুলিয়েটের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিতা, অনেক বেশী বিদগ্ধা, এবং অনেক বেশী শিল্পকাব্যরুচিসম্পন্না। এতগুলো গুণের অধিকারিণী একালের তরুণীরা নামের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন থাকবেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। ফলে, কোনো তরুণী যদি বলে বসেন যে, নাম বদলালে গোলাপের সুগন্ধেরও তারতম্য ঘটে, তবে অন্তত আমি আশ্চর্য হব না।

কথাটা অনেকে মানতে চাইবেন না জানি। অতএব ক্ষণেকের জন্যে তত্ত্বকথা মুলতবী রেখে আমি একটি কি দুটি উদাহরণ উপস্থিত করতে চাই। গোলাপের উদাহরণ আমি আপাতত দেব না, কারণ একথা তো অবিসংবাদিত সত্য যে, রোমিওর সঙ্গে গোলাপ বিনিময় করতে গিয়ে জুলিয়েট ওকথা বলে নি। রোমিও আর জুলিয়েট এমন দু'টি মারমুখো বংশের ছেলেমেয়ে ছিল যে, এক বংশের নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেই অন্য বংশের লোক, মায় চাকর-বাকর পর্যন্ত খুনো-খুনি বাধিয়ে দিত। জুলিয়েট সেই বংশযুগলের নামের কথাই বোঝাতে চেয়েছিল, প্রেমাস্পদের নয়। এমনকি সেই উন্মাদনাময় মুহূর্তে, সেই চিরস্মরণীয় আপ্তবাণী উচচারণের মুহূর্তেও জুলিয়েট ভেবেছে তার প্রেমাস্পদের নাম পরিবর্তনের কথা। অতএব তার চেয়ে অনেক বেশী বয়স্কা ও বুদ্ধিমতী, অনেক বেশী শিক্ষিতা ও বিদগ্ধা, এবং অনেক বেশী শিল্পকাব্যরুচির অধিকারিণী আধুনিক তরুণীরা যে তাদের প্রেমাস্পদের নামের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন থাকবেন এটা আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। ধরুন, উক্তবিধ গুণসম্পন্না কোনো হিন্দু তরুণী অত্যন্ত রোমাণ্টিক পরিবেশে দর্শনমাত্র একজন অজ্ঞাতপরিচয়, সুদর্শন ও বিত্তশালী যুবকের প্রেমে পড়লেন। তারপর তিনি যদি জানতে পারেন যে, তাঁর প্রেমাস্পদের নাম তিনকড়ি বটব্যাল, তাহলে তিনি কি মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেবেন না? কিংবা ধরুন, অমনি একজন মুসলিম তরুণী একই রকম রোমাণ্টিক পরিস্থিতিতে একই রকম আকর্ষণীয় একজন মুসলিম যুবকের সঙ্গে আকণ্ঠ প্রেমে পড়লেন; তারপর তিনি যদি জানতে পারেন তাঁর প্রেমাস্পদের নাম ফকির মোহাম্মদ মণ্ডল, তবে তিনি অন্তত মনে মনে যে কয়েকবার স্বীয় ললাটদেশে করাঘাত করবেন, এ বিষয়ে আমি এক প্রকার নি:সন্দেহ।

তারপরেও অবশ্য ব্যাপার অনেক দূর গড়াতে পারে। তরুণীযুগল যদি নৈরাশ্যজনকভাবেই প্রেমে পড়ে থাকেন, তবে ওই বিশ্রী নাম দু'টোর প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে তাঁরা যুবক দুটির সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবেন, এরূপ সম্ভাবনা অন্তত বর্তমান অর্থ-সংকটের এবং পণপ্রথার যুগে প্রচুর রয়েছে। তারপর তাঁদের বিবাহিত জীবন যতোই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ময় হোক, ওই নাম দুটো সময়ে অসময়ে কাঁটার মতো তাঁদের মনে বিঁধবেই। বিত্তশালী ও বিদগ্ধ মানুষদের সমাজে যখন কেউ তাঁদের নাম ঘোষণা করবেন—

(যেমন 'মিসেস তিনকড়ি বটব্যাল এবং বেগম ফকির মোহাম্মদ মণ্ডল এসে উপস্থিত হয়েছেন, এবার মজলিশের কাজ আরম্ভ করা যাক')—তখন উভয়েই লাজরক্ত হবেন, এবং সে লাজরক্তিমা যে পেরথম যৈবনের নয় তা বলাই বাহুল্য।

তারপর একদিন হয়তো দেখবেন, উক্ত হতভাগ্য যুবকদ্বয়ের নাম পরিবর্তন ক'রে সংবাদপত্র মারফত ঘোষণা করা হচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই তেমন ঘোষণা করা হোক আর না হোক, মানুষের জীবনে সুন্দর নামের মূল্য আছে এবং অসুন্দর নাম বিতৃষ্ণাজনক, একথা অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করা যায় না যে, অনেক স্বামী-স্ত্রীর নাম স্ত্রী-স্বামীর পক্ষে, এবং অনেক স্থানের নাম সেখানকার অধিবাসীদের পক্ষে মনস্তাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। "আপনার বাড়ী কোথায়?" এ প্রশ্নের জবাবে যদি কাউকে বলতে হয় 'বানরীপাড়া' 'ফকিরপাড়া' 'ঘোড়ামারা' 'ভেড়ামারা' বা 'বোকাই-নগর' তবে সে ভদ্রলোক যে খুব মনের সুখে সে নাম উচ্চারণ করবেন এ বিষয়ে আমি বেশ খানিকটা সন্দিহান। কেননা, সত্যি কথা বলতে কি, এ ব্যাপারে আমি নিজেও এককালে ভুক্তভোগী ছিলাম। তাই বলি, নামের একটা নিজস্ব মূল্য আছে, আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। হয়তো খোঁজ করলেই দেখা যাবে, বহু বই বা সিনেমার সাফল্যের মূলে বেশ খানিকটা আছে নাম-মাহাত্ম্য, এবং অসাফল্যের মূলে আছে দুর্নির্বাচিত নাম, যা প্রকারা-ন্তরে হয়ে ওঠে বদনাম, এবং প্রতিশোধ নেয় রুচিহীন অসতর্ক নামকরণের।

তা সত্ত্বেও নামকরণের ব্যাপারে মানুষ অসর্তকতা ও রুচিহীনতার পরিচয় দেয় কেন, ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষই তার বিদ্যা, বুদ্ধি, সচেতন মন এবং উন্নত রুচির পরিচয় দিতে পারে। মানুষের শক্তি বেশী নয়; রাষ্ট্র, সমাজ, বড়কর্তা, পুলিশ, দেনাদার এবং আরো অনেকেই মানুষের ক্ষমতাকে এমন খণ্ডছিন্ন এবং এমন সীমিত করে রেখেছে, শত রকমের চাপ ও দায়িত্ব এমনভাবে তার শ্বাসরোধ করে রেখেছে যে, আজকের দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা এবং জীবন-যাপন করাই কঠিন। এই শ্বাসরোধকর গুমট আবহাওয়ায় মনের বহু বাসনা নৈশগন্ধী ফুলের মতো ক্ষণিক সৌরভ ছড়িয়ে ঝ'রে পড়ে। কিন্তু অন্তত একটি ব্যাপারে প্রত্যেকটি মানুষই নিজের অপ্রতিহত সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করতে পারে, যেখানে সে-ই একমাত্র সম্রাট, এবং আর

কোনো সম্রাট সেখানে নেই। ব্যাপারটি হচ্ছে, নিজেদের পুত্রকন্যার নামকরণ, এবং খানিকটা অবস্থাপন্ন হলে, উপার্জিত অর্থে নির্মিত গৃহের নামকরণ। এই একটি জায়গা যেখানে প্রত্যেকটি মানুষই সচেতন মন এবং উন্নত রুচির পরিচয় দিতে পারেন, এবং এই করে সমাজকে সুন্দর করতে পারেন।

যদিও আমার বক্তব্য হচ্ছে যে-কোনো রকমের নাম—মানুষ, বাড়ী, রাজপথ, গ্রাম, বই, সিনেমা, সব-কিছুর নাম—তা সত্ত্বেও আমি শুধু মানব-মানবীর নামের মধ্যেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। সব নামকেই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে হইবে এমন কথা নেই; তা ছাড়া, রাধা বা জুলিয়েটের মতো মেয়েরাই শুধু ও ধরনের কথাবার্তা বলতে পারে। তবে প্রত্যেকেরই নাম এমন হওয়া উচিত যেন উচ্চারণ করতে, শুনতে এবং অর্থোপলব্ধি করতে ভালো লাগে। অন্তত সে নাম যেন কর্ণপীড়াদায়ক না হয়, এ হচ্ছে নিম্নতম শর্ত। দীনতা-ও-ক্ষীণতা-ব্যঞ্জক দুর্বলতা, অশিক্ষা ও কুরুচির পরিচায়ক, এবং শুষ্কং কাষ্ঠং-বৎ নাম সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত, এই হচ্ছে আমার সুচিন্তিত অভিমত। তার বদলে প্রচলিত হওয়া উচিত সেইসব নাম, যে-সব নামে রয়েছে বীরত্ব, শক্তি, ঐতিহ্য, সৌন্দর্য, প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, সুকণ্ঠ, সুরুচি, বৈদগ্ধ্য, প্রকৃতির বৈচিত্র্য ইত্যাদির ব্যঞ্জনা।

দু-দশটি নামের উল্লেখ করলে বোধ হয় বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে। সুকান্ত, উৎপল, অনুপম, সুপ্রিয়, সুভাষ, প্রীতিলতা, স্নেহলতা, হেনা, তৃপ্তি, দীপ্তি, প্রণতি, পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না, সুমিত্রা, সান্ত্বনা ইত্যাদি বেশ নাম। নামগুলো শুনলে মন প্রীত ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে, যেমন কবিতার ব্যঞ্জনায় হৃদয় অভিষিক্ত হয়। কিন্তু বিষ্ণুপদ, উমাপদ, ভবানীপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ, গিরিজাশঙ্কর, ব্যোমকেশ, গোপাল, পাঁচুগোপাল—ইত্যাদি নাম? এসব নামে পিতা-মাতার কোনো বিশেষ ধর্মমত বা ধর্মীয় প্রবণতা প্রকাশ পায় মাত্র, কবিত্ব কদাচ নয়। তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, দীননাথ ইত্যাদি নাম যাঁরা রাখেন তাঁরা নিজেদের গরীবী হালতের আভাস দেন শুধু। নামের সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই অচেতন। এসব নামে অর্থের ব্যঞ্জনা থাকতে পারে, কাব্য-ব্যঞ্জনা নেই।

নাম, আমার মতে, কবিতার ব্যঞ্জনাময় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কবিতার এমন একটা সৌন্দর্য আছে, এমন একটা আবেদন আছে, যা সকল মনের কাছেই গ্রহণীয়—অবশ্য সেইসব মন ছাড়া, যে-সব মন যান্ত্রিকতার মধ্যে নীরস নিস্পন্দ হয়ে গেছে; এবং আরো সেইসব মন ছাড়া, যে-সব মন কখনো কবিতার স্বাদ গ্রহণের জন্যে নিজেদের অভ্যস্ত করেনি। এ ছাড়া আর-সব মনই নামের কবিতা উপভোগ করতে সক্ষম। সুন্দর নামের মধ্য দিয়েই এসব মনকে কবিতার প্রথম আস্বাদ দেওয়া ও কবিতায অভ্যস্ত করে তোলা উচিত। এ একটা অতি আশা নয়। আধুনিক কবিতা দেখে হয়তো আমাদের মনে একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, বিদগ্ধ মন ছাড়া কবিতার রস গ্রহণ সম্ভব নয়। সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে প্রাগ-আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে একথা খাটে না। আর যে কবিতা একেবারে প্রাথমিক ও মৌলিক কবিতা তার আবেদন তো সর্বজনীন। মানুষের নামের মধ্যে তেমনি কবিতার ব্যঞ্জনা থাকলে তা কখনো ব্যর্থ হবে না, বরং আধুনিক জীবন সুন্দরতর হবে।

ধর্মানুভূতির ভিত্তিতে মানুষেব নাম বাখার খানিকটা অসুবিধা আছে। ধর্মের মধ্যে রযেছে অনেক রকম ভাগ ও বিভাগ, এবং সেই হিসাবে ধর্মানুভূতির মধ্যেও বয়েছে অনেক অনুবাগ ও বিবাগ, আর রয়েছে বিচিত্র বিশ্বাস ও সংস্কার-ভেদে মানুষেব মধ্যে অনেক দল ও উপদল: অতএব ধর্মীয় দল ও উপদলের ভিত্তিতে রাখা নাম এক শ্রেণীর মানুষেব মনে তৃপ্তি-বিধান করতে পারলেও অন্য শ্রেণীব মনে, বিরুদ্ধতা না হলেও কিছুটা বিতৃষ্ণা বা ঔদাসীন্য এনে দিতে পারে বৈ কি। কারণ ধর্মের নানা বিভাগের মধ্যে অনেক রকম ঐতিহাসিক স্মৃতিই যে জড়িয়ে রয়েছে। যে-কোনো একটিমাত্র দেশের মানুষ কতো ভাগেই না বিভক্ত। কতো দিক দিয়েই না তাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর উঠেছে। নামের মধ্য দিয়ে এই খণ্ডিত মানব-সমাজে বহু রকমের ধর্মীয় ব্যঞ্জনা জাগ্রত রেখে তাদের আরও খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা আর যা-কিছু হোক, মানব-প্রেমিকের পরিচয় কিছুতেই নয়। তাই মানুষের নাম কেবল সেই রকমই হওয়া উচিত যা তাদের ভুলিয়ে দেবে তাদের অসংখ্য বিভেদের কথা, এবং সর্বজনীন কাব্য-ব্যঞ্জনা দিয়ে এই ইঙ্গিত দেবে যে মানুষ কেবল মানুষই। এ অবশ্য একেবারে সর্বোচচ দাবি, ভবিষ্যতের কোনো আদর্শ সমাজে হয়তো তা সম্ভব হবে। আজই অতখানি আমরা আশা করি না। তবু এই বিভাগগুলো অবশ্যই অনেকখানি কমিয়ে দেওয়া যায়, অন্তত নামের ক্ষেত্রে।

॥ ২ ॥

এতক্ষণ আমি যেসব নামের প্রশংসা ও অপ্রশংসা করে এসেছি, সে-সমস্ত নামই হচ্ছে বাঙ্গালী হিন্দুর। কারণটা স্পষ্ট। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, অতএব আমার বক্তব্যটা উপস্থিত করতে হলে সেইসব নাম নিয়েই শুরু করা দরকার যেসব নাম রাখা হয়েছে আমাদের মাতৃভাষায়, অতএব যেসব নামের অর্থ ও ব্যঞ্জনা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত। এবার আমি বাঙ্গালী মুসলমানের নামে আসতে চাই।

এ ব্যাপারে প্রথমেই যে বাধাটা আমার কাছে কঠিন ঠেকছে তা হচ্ছে, বিদেশী ভাষার প্রাচীর। আমাদের নাম এমন-সব ভাষায় রাখা হয় যা আমাদের মাতৃভাষা নয়। অতএব আমাদের নামের মানে যে কী আর তার ব্যঞ্জনাই বা কী তা প্রায় ক্ষেত্রে আমরাই জানি না। তবু এসব বাধা যতদূর সম্ভব অপসারণ করে এবং সব সময় অর্থ-ব্যঞ্জনার জন্য নয়, ধ্বনি-ব্যঞ্জনার জন্য যে-সব নাম আমাব কাছে সুশ্রাব্য ও মিষ্টি মনে হয় তা হচ্ছে: আনোয়ার, হুমায়ুন, হাসান, হাফিজ, নীনুফার, মীনুফার, ফিরোজ, লায়লা, হুমায়রা ইত্যাদি।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি সবগুলো নামের অর্থ জানেন কিনা, তবে আমি বলব, "না"। তবু এসব নামের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের কারণ হচ্ছে এদের ধ্বনি-ব্যবঞ্জনা। কিন্তু একথাও আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, সুন্দর নামে অন্যকে জানবার এবং অন্যের কাছে পরিচিত হবার, অন্যকে ডাকবার এবং অন্যের ডাক শোনবার ক্ষেত্রে মুসলমানদের তৃপ্তি, অর্থাৎ বাঙ্গালী মুসলমানদের তৃপ্তি, প্রায় পুরোপুরিই ক্ষুণ্ন হয় নামের অর্থ না জানবার জন্যে। কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, বাঙ্গালী মুসলমান কোনোদিনই জানলো না তার নামের অর্থ কি, এবং তার নামের ব্যঞ্জনাই বা কি। ছেলেমেয়েদের নাম রাখার সময় বাপ-মায়েরা জানে না তাঁদের রাখা নাম ভাল না মন্দ, আর সে-সব নাম তাঁদের নিজেদেরই মনঃপুত হওয়ার যোগ্য কিনা। প্রায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানের নাম তার নিজেরই কাছে সত্যিকারের নাম নয়, শুধু প্রতীক মাত্র, তাকে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দ মাত্র, অনেকটা সৈনিক বা কয়েদীদের সংখ্যার মতো। জানি যে এমন মানুষ এই দেশে আছেন যাঁরা নির্বিকার কণ্ঠে বলবেন,

সবাই আরবী-ফারসী শিখুন তবেই এ সমস্যা আর থাকবে না। আমাদের বহু পাঠ্য-ভারাক্রান্ত ছাত্র-জীবনে এবং বহু সমস্যা-বিপর্যস্ত কর্মজীবনে শুদ্ধ নামের মাধুর্যের লোভে অতটা করা কখনো সম্ভব হবে না, তবে হয়তো একটি কাজ করা যেতে পারে।

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কাব্যময় ও সুন্দর আরবী-ফারসী নামের একটা বিরাট তালিকা প্রণয়ন করে এবং প্রত্যেকটি নামের পাশে বাংলা অর্থ দিয়ে একটা পুস্তক প্রকাশ করা যেতে পারে, এবং সর্বসাধারণকে এই বলে অনুরোধ করা যেতে পারে যে, তাঁরা যেন প্রত্যেক বাড়ীতে বইখানা রাখেন এবং ওই তালিকা থেকে ছেলে-মেয়েদের নাম রাখেন। বইখানাকে বাধ্যতামূলক পাঠ্য তালিকারও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাহলে প্রত্যেকটি মুসলমানই প্রত্যেকটি মুসলমানের নামের অর্থ জানতে পারবে, এবং সুন্দর ও কাব্যময় নাম শোনার তৃপ্তি পেতে পারবে। নামের অর্থ ভুলে গেলে বইখানা উত্তম রেফারেন্স বই হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। বই পড়তে পড়তে যেমন অজ্ঞাত শব্দার্থের জন্যে অভিধানের আশ্রয় নেওয়া হয়, তেমনি করে দুর্বোধ্য নাম শুনলে বইখানা একবার খুলে দেখলেই চলবে।

স্বীকার করি যে, এ প্রস্তাব খানিকটা উদ্ভট। কিন্তু উপায় কি! নামের কবিতা এমনকি তার অর্থটার জন্যেও যদি আমাদের কারো ঔৎসুক্য না থাকে, তবে থাক, ও তালিকা তৈরী ক'রে কাজ নেই। কিন্তু সে ঔৎসুক্য কি আমাদের কারুরই নেই? সুন্দর ও সুবোধ্য নাম কি আমাদেব কারুরই প্রেয় ও প্রার্থনীয় নয়?

আরো একটা পথ আছে—যে পথে, আমার মনে হয়, বাঙ্গালী মুসলমানদের নাম-সংক্রান্ত সমস্যার অনেকখানিই সমাধান করা চলে। প্রস্তাবটা উপস্থিত করার আগে এর মূলনীতি সম্পর্কে খানিকটা উপক্রমণিকা অপরিহার্য মনে করছি।

খানিকটা ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমানের নাম মাত্র একটি কি দু'টি, সে নাম হচ্ছে "মোহাম্মদ" বা "আহমদ"। কিন্তু কদাচিৎ দু-একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে তারা ওই নামে পরিচিত নয়, তারা পরিচিত তাদের নামের বিশেষণ দিয়ে, এবং অভ্যাসবশে ধরে নেওয়া হয় যে, ওই বিশেষণগুলোই তাদের আসল নাম। যেমন—মোহাম্মদ আবদুর

রহিম, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, শফিউদ্দিন আহমদ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে তাদের নাম আসলে মোহাম্মদ বা আহমদ, বাকীটুকু তাদের নামের বিশেষণ মাত্র। এই বিশ্লেষণটুকু মেনে নিলে, বাঙ্গালী মুসলমানের নাম রাখা সহজ হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে, এই নীতিতে রচিত কয়েকটি নাম আমি এখানে উপস্থাপন করছি: অনুপম মোহাম্মদ, সুকান্ত মোহাম্মদ, সুপ্রিয় মোহাম্মদ, উৎপল (এটি বিশেষ্য) মোহাম্মদ, নির্মল আহমদ, অরুণ আহমদ, সত্যেন্দ্র মোহাম্মদ, সুকুমার মোহাম্মদ, সুশোভন মোহাম্মদ ইত্যাদি।

সব মানুষেরই এ রকম নাম রাখলে অবশ্য আরেক সমস্যা দেখা দেয়, একঘেয়েমির সমস্যা। তবে সব নামেই যে "মোহাম্মদ" থাকতে হবে তার কি মানে আছে। মোহাম্মদ অথবা আহমদ ছাড়াও নাম হতে পারে, যেমন: সুভাষ জামাল, সুশোভন আনোয়ার, অমল আফজাল, সুষমা নার্গিস ইত্যাদি।

এসব নামে হিন্দু ঐতিহ্য বা পুরাণ বা পৌত্তলিকতার কোনো সংশ্রব নেই, প্রত্যেকটি নামে হজরত মোহাম্মদকে প্রশংসা করা হয়েছে বা আরবী-পদকে বাংলায় বিশেষিত করা হয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব বা কোনো সুন্দর ভাবেরও ব্যঞ্জনা আছে। আমি মনে করি নিছক আরবী নামের চেয়ে—যে-সব নামের অর্থ আমরা বুঝি না সে-সব নামের চেয়ে, এসব নাম সবদিক দিয়েই ভালো এবং সন্তোষপ্রদ।

কথা উঠতে পারে, নামগুলো উদ্ভট শোনাচ্ছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তেমন যদি কানে শোনায় তবে তার কারণ এ-সব নামের নূতনত্ব এবং আমাদের পূর্ব-সংস্কার ও অনভ্যাস। অভ্যস্ত কানে, এবং যখন সর্বত্রই এসব নাম শুনব তখন, ও রকম মনে হবে না।

আরেকটা কথা উঠতে পারে যে, এরকম নাম রাখা কি প্রায় তমদ্দুন-বর্জনের কাছাকাছি নয়? আমার তা-ও মনে হয় না। আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে পারি, মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে ও মাতৃভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যকে ভালোবাসতে পারি, তবে এসব নাম আমাদের বিরাগভাজন হবে কেন? আমরা তো চাই শুধু আমাদের নামকে সুবোধ্য করতে। সে অধিকারটুকুও কি আমাদের নেই?

কেন, দুনিয়ার আরো অনেক দেশের মুসলমানই তো ছিল ও আছে যারা তাদের নাম রেখেছে ও রাখে নিজেদের মাতৃভাষায়, আরবী ভাষায় নয়। একটু চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকালে সে রকম নামের সুদীর্ঘ তালিকা বানানো যায়:

জাহাঙ্গীর, শাজাহান, আলমগীর, নূরজাহান, শের শাহ, গুলবদন, রেজা শাহ, জালাল বায়ার, আদনান মেন্দারেস, কামাল আতাতুর্ক, ইসমত ইনোনু, আলী শাস্ত্রমিজোজো, সোহরাব, রুস্তম, আল্লাহ্ বখ্‌শ, খোদাবখ্‌শ, আদমজী হাজী দাউদ, তাহির চেঙ চিয়েঙ-লি ইত্যাদি। এইসব এবং আরও বিস্তর নাম পুরোপুরি অথবা আদৌ আরবী নাম নয়, ওইসব নামীয় নর-নারীর মাতৃভাষায় রাখা নাম। জিন্নাহ্ সাহেবের নামের কথাই ধরুন: 'জিন্নাহ' কথাটা আরবী বা ফারসী নয়, গুজরাটি। তারপর তাঁর পুরো নামটি হয়তো অনেকেই জানেন না। সেটি হচ্ছে, তাঁর গোত্রীয় রীতি অনুযায়ী: 'মোহাম্মদ আলী-ভাই জিন্নাহ-ভাই খোজানী।'[১]

অর্থাৎ, আরবীতে যে দুনিয়ার সব মুসলমানকে নাম রাখতে হবে, এ কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরকালীন সত্য নয়, কোনো অলঙ্ঘনীয় সার্বজনীন ঐতিহ্যও নয়। আরবের বাইরে অন-আরবী নাম রাখার জন্যে কখনো কোনো কথাও ওঠেনি। তবে যা অলঙ্ঘনীয় সর্বজনীন ঐতিহ্য নয় তাকেই আমরা অনুসরণ করে চলছি কেন? দুনিয়ার আর-সব দেশের মুসলমানেরা যদি নিজেদের ভাষায় নাম রাখার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে থাকে তবে আমরা আমাদের ভাষায় নাম রাখলে তা একটা সৃষ্টিছাড়া হৃৎকম্পকর ব্যাপার হবে কেন? আমাদের নামকে সুবোধ্য করার, এবং সুন্দর নামে পরিচিত হওয়ার ও সুন্দর নামে অন্যকে ডাকবার অধিকার কি আমাদের নেই? আমরা কি চিরকাল অবোধ্য ও দুর্বোধ্য নামই শুধু আবৃত্তি ক'রে যাব? আমাদের নামে হৃদয়ের স্পর্শ লাগবে না?

হৃদয়ের স্পর্শ চাই মানুষের নামে। সুপ্রিয় নামক ব্যক্তি বদমেজাজী কিনা জানি না, কিন্তু নামটা শুনলেই যেন মনে হয় লোকটি প্রিয়-বন্ধু হবার

১. জিন্নাহ্ সাহেবের পূর্ণ নামটি পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত বইয়ে: Muslim Year Book, 1948—49. (Published by All India Muslim Chamber of Commerce and Industry, Bombay)

মতো। স্নেহলতা নাম্নী মেয়েটি কি নিষ্ঠুর প্রকৃতির? কিন্তু নাম শুনে যে তাকে স্নেহ করার ইচ্ছা হয়। প্রীতিলতা নাম্নী মেয়েটিকে প্রীতি জানাবার ইচ্ছা হয়, যদিও জানি বাংলাদেশের ওই নামেরই এক তরুণী কয়েকটি ইংরেজকে গুলী করে মেরেছিল চট্টগ্রামে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যুগে। চরিত্রগুণ এবং হৃদয়াবেগের এই ব্যঞ্জনা, হৃদয়ের এই স্পর্শ বাঙ্গালী মুসলমানের নামে নেই। এই কারণেই বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের চেয়ে হিংসা-বিদ্বেষের ভাব বেশী কিনা কে জানে। এই অপ্রীতি-ময় সমাজে হৃদয়ের স্পর্শময় নাম মানুষকে অনেকখানিই শান্তি দিতে পারে, একবিন্দু কবিতার মতো। এবং কে না জানে বিন্দু বিন্দু পানি নিয়েই মহাসিন্ধু। কিন্তু নামের মধ্যে হৃদয়ের স্পর্শ দেওয়া, নামকে সুশ্রুত ও প্রীতিপ্রদ করা, এবং নামের মধ্য দিয়ে কবিতা ও সুন্দরের ব্যঞ্জনা দেয়া মাতৃভাষা ছাড়া তো সম্ভব নয়। আমাদের নাম যেন মাইকেলের Captive Lady, বাঙ্গালী হয়েও বিদেশী ভাষায় ব্যর্থ কাব্যরচনা।

তবে হয়তো নতুন চেতনার আভাস কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। বাঙ্গালী মুসলমান মেয়েদের ঘরোয়া নাম মাতৃভাষায় রাখা হচ্ছে, এ আজ একেবারে আজগুবী ব্যাপার নয়। জ্যোৎস্না, পূর্ণিমা, রানী, মঞ্জু, হেনা, মিনা মমতা, রাকা, শেফালী—এসব নাম মুসলিম-সমাজে আজ সুপরিচিত। একটি পরিবারের তিনটি মেয়ের নাম আমি জানতাম: ঊষা, বিভা ও দিবা। নামগুলো যখন শুনি তখন আনন্দ পাই এইজন্য যে, মাতৃভাষায় সুন্দর ও সুবোধ্য নাম রাখতে একালের বাপ-মায়েরা কিছুটা আয়াস স্বীকার করছেন। একথা সত্য যে এসব নেহাতই ঘরোয়া নাম, এদের প্রত্যেকেরই একটা করে দুর্বোধ্য আরবী-ফারসী নাম আছেই, এবং এটাও দুঃখের বিষয় যে অন্ততঃ তেমনি ঘরোয়া নাম ছেলেদের বেলায় বিশেষ রাখা হচ্ছে না। তবু ওই ঘরোয়া নামগুলো যারা রেখেছেন তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, কেননা তাঁরা সুন্দর ও সুবোধ্য নাম রেখেছেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা, তাঁরা সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু মেয়েদের এই ঘরোয়া নামগুলোই আসল নাম হতে ক্ষতি কি, এবং এর অধিকন্তু আরবী-ফারসী নামের বাহুল্য কেন? এখন যেমন মেয়েদের আরবী-ফারসী নামের শেষে পিতা বা স্বামীর নামের অংশ বা বংশ-উপাধি জুড়ে দেওয়া হয়, তেমনি এ ধরনের বাংলা নামের শেষে পিতা বা স্বামীর নামের অংশ-বিশেষ বা বংশ-উপাধি

জুড়ে দিলেই তো যথেষ্ট হতে পারে। সেটা পরের কথা, আপাতত (আবার বলি) এই শ্রেণীর নাম যাঁরা রেখেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সৌন্দর্যবোধ মানুষের একটা মৌলিক বৃত্তি, এই নামগুলোতে তাঁরা সেই সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এতে কবির সেই স্মরণীয় কথাই প্রমাণিত হয়: পৃথিবীর কবিতা কখনো মরিবার নয়।

১৯৫৮

আত্মার অমরত্ব

আত্মার অমরত্ব বলতে আমরা সাধারণ মানুষ এই বুঝি যে, আমাদেব নশ্বর দেহের বিলোপ হলেও আত্মার বিলোপ হবে না। তেলের সম্বল ফুরিয়ে এলেই যেমন প্রদীপ-শিখা নিভে যায়, জীবন-প্রদীপ নিভে গেলেই তেমনি মানুষের সবকিছু শেষ হয়ে যায় না, তারপরেও তার আত্মা থেকে যায়। মৃত্যুর এপারে সে বেঁচে থাকে না, কিন্তু মৃত্যুর ওপারে বেঁচে থাকে। এ বিশ্বাসের নৈতিক প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং এর স্বপক্ষে আছে যুক্তিও। কে একজন বৈজ্ঞানিক নাকি একবার হিসেব কষে দেখিয়েছিলেন, যেসব রাসায়নিক উপাদান দিয়ে আমাদের দেহ তৈরী, সেগুলোর মোট মূল্য সে-সময়ের বাজার-দর হিসেবে ছিল সতের টাকা ক-আনা ক'-পাই। সে অনেক বছর আগেকার কথা। এখনকার বাজার-দর হিসেবে হলোই বা আমাদের দেহের মূল্য ১৭০ টাকা, অথবা ১৭০০ টাকা, অথবা আরও বেশী। তাতে আমাদের নশ্বর দেহের অকিঞ্চিৎকরতার সামান্যই তারতম্য হয়—ওতে সান্ত্বনা কিছুমাত্র বাড়ে না। একমাত্র এই সান্ত্বনা নিয়েই প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করা যেতে পারে যে আমাদের এই নশ্বর দেহই সবকথা নয়, আমাদের এমন একটা দেহাতীত সত্তা আছে যা দেহোত্তর সময়ে অস্তিত্বময় থেকে যাবে : সেই সত্তার নামই আত্মা। অর্থাৎ আমাদের আত্মা অনির্বাণ। এ বিশ্বাসের নৈতিক মূল্য এই যে, এ ছাড়া এ জীবনের কোনো মানে হয় না, পাপ-পুণ্যের কোনো অর্থ থাকে না। এ জীবনে বহু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না, বহু পুণ্যেব পুরস্কার অপ্রাপ্ত থেকে যায়। একটা দেহোত্তর জীবন না থাকলে এসবের অর্থ কি ?

প্রশ্নটার অন্যান্য দিকও আছে। কোনো কোনো অভিমত অনুযায়ী বস্তুই মানবদেহরূপ এবং মনন-ক্ষমতা লাভ করে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বস্তুই

চিন্তা করে। এই জটিল বস্তুবাদী তত্ত্বের দিকে আমরা যাচ্ছি না, সাধারণত-স্বীকৃত তত্ত্বই আমাদের আলোচ্য। বস্তু কখনো চিন্তা করতে পারে না একথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের মননময় জীবন যে আমাদের বস্তু-অতীত সত্তারই অভিব্যক্তি এতে সন্দেহ থাকে না। এবং এ সন্দেহ থাকে না যে, যেদিন আমাদের মৃত্যু হবে, সেদিন এই সত্তা আমাদের দেহের শৃঙ্খল এবং পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করে তার গন্তব্যস্থলে যাত্রা করবে। তারপরে অনন্ত জীবন—বেহেশতে বা দোজখে অথবা আর কোথাও।

আত্মার এই অমরত্বের ধারণার সঙ্গে, আমার মনে হয়, ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারও জড়িত: এই যে জীবন, এই যে আমার অস্তিত্ব, আমার প্রিয়-জনের অস্তিত্ব, এত মধুর এত উজ্জ্বল যে সত্য, এর একটি প্রান্ত কি মাতৃ-জঠরে এবং আরেক প্রান্ত মৃত্যু-শয্যায়—এবং সেখানেই সব শেষ? তারপরে আর কিছুই নেই? আমার প্রিয়পাত্রদের যখন জীবনবসান হয, তখন তার জীবনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে? তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না? মানবজীবনের মতো এমন একটা প্রবল সত্যের এমন ক্ষণস্থায়িত্ব মন কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। অতএব মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে আমার প্রিয়জন, বেঁচে থাকব আমি, বেঁচে থাকবে সব মানুষ।

মোটের উপর, আত্মা অমর এই ধারণাটা এইসব কারণে মানব-সমাজে প্রচলিত—এবং আত্মা অমর একথার অর্থ আত্মা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। এই বেঁচে থাকার অর্থ অবশ্য দৈহিক অর্থে বেঁচে থাকা নয়, আত্মিক অর্থে বেঁচে থাকা, আত্মার অনন্তকালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন চেতনাময় অস্তিত্ব। কথাটা ভাবতে ভালোই লাগে, মনে হয় সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু অনন্ত-কাল সম্বন্ধে, এমনকি অনন্তকালের অংশ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যে-সব কথা বলে তাতে মনে হয় মৃত্যু ও সসীম জীবনের মতো অনন্তকাল বেঁচে থাকাও একটা গুরুতর সমস্যা।

মানুষ সব সময়েই এমন কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করে, যার তাৎপর্যের তারতম্য হয়ে থাকে যুগ-ভেদে, গোষ্ঠী-ভেদে এবং সমাজের স্তর-ভেদে। যেমন "খোদা"—অথবা সমার্থক যে কোনো শব্দ। খোদার অর্থ সকলের কাছে এক নয়, সব যুগেও এক নয়। সাকার, নিরাকাব, নির্গুণ, গুণময়, অজ্ঞাত, জ্ঞাত ইত্যাদি যার যে রকম খুশী বা যার মনের যতটুকু

ক্ষমতা, সে সেইভাবে খোদার ধারণা পোষণ করে। "অনন্তকাল" এই রকম একটা শব্দ। অনন্তকাল যদিও চিরকালই অনন্তকাল, তবু অনন্তকালের আজ যা তাৎপর্য মানব-সভ্যতার আদি ও মধ্যযুগে ঠিক সেই রকম তাৎপর্য ছিল না। যে-কালে মানুষের সংখ্যা ছিল কম, গবাদি পশু-সম্পদ ছিল কম, আবাদযোগ্য ভূমিখণ্ডের পরিমাণ ছিল কম, অর্থ-সম্পদের পরিমাণ ছিল কম, সেকালে বড় রকমের সংখ্যা ব্যবহারের প্রয়োজনও ছিল কম। সেকালের ইতিহাসবোধও ছিল সামান্য। অন্তত আজকের ইতিহাস-বোধের সঙ্গে সেকালের ইতিহাস-বোধের তো তুলনাই চলে না, কারণ ভূবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, জোতিষ্কবিজ্ঞান এসব আধুনিক যুগেই বিকাশ লাভ করেছে। বলা দরকার আমি এখানে ইতিহাস বলতে শুধু ইতিহাসই বোঝাচ্ছি না, পৃথিবী ও নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয়ের ইতিহাস-সম্বলিত মহাবিশ্বের মহা-ইতিহাস বোঝাচ্ছি। সংখ্যা আর ইতিহাস-বোধের কথা উল্লেখ করছি এইজন্য যে, প্রচুর সংখ্যার ধারণা আর দীর্ঘ ইতিহাসবোধ না থাকলে অনন্তকালের সামান্যতম ধারণা করাও সম্ভব নয়। এই কারণে মনে হয়, সভ্যতার আদি ও মধ্যযুগের মানুষ অনন্তকাল বলতে বুঝতো বহু হাজার বছর, বা যেকালের আদিও নেই অন্তও নেই এই রকম অস্পষ্ট একটা কিছু।

অনন্তকালকে পুরোপুরি ধারণা করা মানুষের অসাধ্য, তবু এ-যুগে কথাটার তাৎপর্য অপরিমেয় প্রসার লাভ করেছে। ভূবিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আমাদের জানাচ্ছেন যে পৃথিবীর বয়স অন্তত ৩৫০ কোটি (৩৫০,০০,০০,০০০) বছর। ইউরেনিয়ামের অণু ধ্বংসের পরিমাণ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ইউরেনিয়ামের অণু এমন নির্দিষ্ট হারে ধ্বংস পেয়ে সীসায় পরিণত হয় যে, কোথাও এক তাল ইউরেনিয়াম পাওয়া গেলে সে ইউরেনিয়াম কত বছর আগে সেখানে জমাট বেঁধেছিল, তা প্রায় সঠিকভাবে বলা সম্ভব। পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে এই একটা কথা। তার আয়ু সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যা বলেন তা আরও বিরাট ব্যাপার। সূর্যের যে তেজ বিকীরণের ফলে পৃথিবীর সব-কিছু চলছে, তার মূলে রয়েছে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিরন্তর ধ্বংস-তাণ্ডব। এই ধ্বংস-তাণ্ডব যে-সে কাণ্ড নয়। এর ফলে প্রতিদিন সূর্যের ওজন কমে যাচ্ছে ৩৫,০০০ কোটি টন। তা সত্ত্বেও সর্যের ভাণ্ডারে হাইড্রোজেন পরমাণুর যে সঞ্চয় আছে, তাতে এক হাজার কোটি বছরের মধ্যে তার তেজের কোনো ইতর-বিশেষ হবে না।

তারপর তার হাইড্রোজেন পরমাণুর সম্বল উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষয় পাবে এবং তার ফলে সূর্যের কলেবর স্ফীত হয়ে উঠবে; এত স্ফীত হয়ে উঠবে যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গলগ্রহ তো বটেই, সম্ভবত বৃহস্পতি গ্রহকেও সে আত্মসাৎ করবে। এমনিভাবে অপরিমেয় তেজ বিকীরণ করে সূর্য আবার ছিদ্র বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে অখ্যাত নিষ্প্রভ ক্ষুদ্রকায় তারকার মতো আকাশের এক কোণে বিরাজ করবে। এই প্রলয়ংকর ব্যাপারটা ঘটবে আজ থেকে ৫000 কোটি বছর পরে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই অনুমানে অবশ্য অনেক ভুল থাকতে পারে, এবং তারা আরও বলেন যে অন্যান্য পদ্ধতিতেও প্রলয় ঘটতে পারে; অর্থাৎ পৃথিবীর বয়স আরও কম বা বেশী হতে পারে, এবং পৃথিবী আর সূর্যের মৃত্যুও যথেষ্ট এগিয়ে আসতে বা পিছিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতে অনন্ত কালের কিছুমাত্র তারতম্য হয় না। তবে সময়ের এই যে হিসাব—৩৫0 কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম এবং ৫000 কোটি বছর পরে পৃথিবীর বিলোপ ও সূর্যের মৃত্যু, এই হিসাব থেকে অনন্ত কালের খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়।

আমার আত্মার কাছে অতীতের ৩৫0 কোটি বছরের কোনো মূল্য নেই, আমার আত্মার কাছে মূল্যবান শুধু অনাগত কাল, যে অনাগত কাল তাকে বেঁচে থাকতে হবে---আপাতত ধরুন সূর্যের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ৫000 কোটি বছর। এই দীর্ঘকাল আত্মা কি করে কাটাবে? মনে রাখতে হবে জীবন্ত অবস্থায় আমাদের বেঁচে থাকাটা যে-রকম মৃত্যুর পর আত্মার বেঁচে থাকাটা সে রকম হবে না। চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয় আত্মার থাকবে না, অতএব আত্মা আমাদের মতো কোনো কিছু দেখবে না, শুনবে না, টক-মিষ্টির স্বাদ পাবে না, খাবে না, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ বুঝবে না, শীতাতপ অনুভব করবে না; আমাদের মতো জীবন-সংগ্রাম, শোক-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ তার থাকবে না। তার অবস্থা অনেকটা হবে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে চোখ বুঁজে কানে তুলো গুঁজে চুপ-চাপ বসে থাকার মতো। যাবতীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আত্মার অবিচ্ছিন্ন চেতনাটাই শুধু থাকবে। চাকরি, প্রেম, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি কোনো তুচ্ছ পার্থিব ব্যাপারই আত্মার জগতে থাকবে না, অতএব এসব সংক্রান্ত কোনো চিন্তা আবেগ অথবা

ভাবাবেগ আত্মার সেই অবিচ্ছিন্ন চেতনায় থাকবে না। আবেগহীন উত্তাপহীন অচঞ্চল সে চেতনা কতদিন সহনীয় হওয়া সম্ভব? হতভাগ্য দোজখীদের কথা বাদ দিচ্ছি; আমরা এতই যখন আকাঙক্ষা করতে পারি তখন এ আকাঙক্ষাও করা যাক যে আমি ওদের একজন হব না, আমার আত্মার সেই অবিচ্ছিন্ন চেতনা হবে আনন্দময়। কিন্তু সে আনন্দে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে, জীবন-লীলার মতো আত্মারও যদি লীলা না থাকে, এবং লীলায় বৈচিত্র্য না থাকে? এই লীলা-বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে—আত্মরতি থেকে অথবা অপর আত্মাদের সঙ্গে সহলীলায়? আত্মরতি থেকে অনন্ত লীলাবৈচিত্র্য সম্ভব কিনা, এবং অপর আত্মাদের সঙ্গে সহলীলার ধারণা এই পার্থিব জীবনেরই আরেকটি সংস্করণ, এবং এক ধরনের নিছক ইচ্ছাপূরণ কিনা তাও প্রশ্ন। দ্বিতীয়োক্ত জীবনেরও তো ক্লান্তি আসা সম্ভব। তৃতীয় প্রকার জীবন হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বর-চিন্তা এবং এইটের কথাই আধ্যাত্মবাদীরা বেশী করে বলেন। কিন্তু আত্মার যেহেতু পার্থিব জীবনের অনুরূপ বাসনা কামনা থাকতে পারে না, অতএব বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বর-চিন্তা আত্মার এক ধরনের জড়ত্বপ্রাপ্তি ও বিলোপ নয় কি?

মৃত্যুর পরে চেতনার প্রকৃতি যেমনই হোক (কেমন তা আমরা কেউ-জানি না), এই চেতনা নিয়ে ৫০০০ কোটি বছর বেঁচে থেকেই আত্মার নিষ্কৃতি নেই, তারপরেও তাকে বেঁচে থাকতে হবে বহু বহু কোটি গুণ বছর। ৫০০০ কোটি বছর লিখতে পাঁচের পর ১০টি শূন্যের দরকার হয় (৫০০০,০০,০০,০০০)। যদি এই অঙ্কের পর এমনি আরও ১০টা শূন্য দেই এবং বলি যে, এটা অনন্তকাল না হলেও অনন্তকালের এক কোটি ভাগের এক ভাগ, তবু সে কথা বলা মানে অনন্তকালকে হাস্যকরভাবে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। আত্মার অনন্তকাল বেঁচে থাকা মানে উপরের অঙ্কের ওই সামান্য ২০টি শূন্যের পরে আরও ২০ লক্ষ কোটি শূন্য বসিয়ে যে সময় পাওয়া যাবে তারও অনন্ত কোটি গুণ বেঁচে থাকা।

এই অনন্তকাল বেঁচে থাকা, অন্তত আমার পক্ষে, একটা অসহনীয় ব্যাপার। এই অনন্তকাল ব্যাপী বেঁচে থাকাটা সহনীয় হবে কি করে আর এই অনন্তকাল বেঁচে থাকার সার্থকতাই বা কি, সে সম্বন্ধে কোনো দার্শনিক নির্ভরযোগ্য কথা বলেছেন কিনা আমি জানি না। ইকবাল অনন্তকালের এই অসহনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, আর সমস্যার সমাধান করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন:

It was Helmholtz who first discovered that nervous excitation takes time to reach consciousness. If this is so, our present physiological structure is at the bottom of our present view of time, and if the ego survives the dissolution of this structure, a change in our attitude towards time and space seems perfectly natural. Nor is such a change wholly unknown to us. The enormous condensation of impressions which occur in our dream-life, and the exaltation of memory which sometimes takes place at the moment of death, disclose the ego's capacity for different standards of time. [*Reconstruction of Religious Thought in Islam.* Page 120.]

ইকবাল এখানে যে দু'টি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, সে দু'টিই তো খুব অল্প সময়ের কথা, এদের বাইরেও তো অপরিমেয় কাল বাকি থেকে যায়। এই অপরিমেয় কাল নিয়ে কি করা যায়? এই অপরিমেয় কাল ধরে যদি স্বপ্নের মতোই অভিজ্ঞতালাভ হতে থাকে, বা মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তের মতোই স্মৃতি-উজ্জীবন ঘটতে থাকে, তবু ফল তো থাকে একই—তাতে অনন্তকালের অনন্তত্ব লোপ পায় না। কেননা দার্শনিকরা যাই বলুন, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় অনন্তকালের অংশগুলির সংখ্যাও অনন্ত অথবা কাছাকাছি ঐ রকম হওয়াই সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা অন্য ধরনের কাল-হ্রস্বীকরণের অথবা বিলম্বীকরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। একে বলা হয় 'টাইম-ডাইলেটেশন'। আইনস্টাইনের থিওরী অব রিলেটিভিটি অনুযায়ী কাল-প্রবাহ সকলের জন্য এক রকম নয়। এই প্রবাহের পরিমাণ—অথবা প্রবাহের অনুভূতি?—নির্ভর করে দর্শকের গতিবেগ অনুযায়ী। এটা থিওরী মাত্র, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি এখনো, বিজ্ঞানীরা বলেন। কিন্তু প্রমাণের কথা থাকঃ এই থিওরী অনু-যায়ী, কোনো দর্শক যদি কোনো প্রকারে আলোকের প্রায় সমান (অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইলের প্রায় সমান) গতিবেগ লাভ করে (ঠিক আলোকের সমান গতিবেগ লাভ নাকি কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়, একে অতিক্রম তো নয়ই) তাহলে এক আলোকবর্ষ ঐ দর্শকের মনে হবে মাত্র এক ঘণ্টার সমান। মহাবিশ্বের আকার কি রকম? শুধু প্রসারিত অথবা গোল? তার প্রসারই বা কত? এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ঐকমত্যে পৌঁছাননি। সে

প্রশ্নও মুলতুবী রেখে ধরা যাক মহাবিশ্বের, কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে আত্মা আলোকের মতোই গতিবেগে শুধু চক্কর দেবে স্বর্গীয় অনুভূতির নাগরদোলায় চেপে (ঈশ্বরের কৃপা হলে আত্মা আলোকের গতিবেগকেও অতিক্রম করতে পারে)। হাঁ, তাহলে সময় খুবই হ্রাস পায়। এক আলোক বর্ষকে এক ঘণ্টায় (অথবা আরও কমে) কমিয়ে আনা সোজা কথা নয়। কিন্তু তবু এ পদ্ধতিতেও ৫০ কোটি আলোকবর্ষ যে প্রায় পৌনে দু'হাজার বছরের সমান। আর ঐ ৫০ কোটি আলোকবর্ষ মহাকালের লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগেরও অনেক কম। অর্থাৎ অনন্তকালের হ্রস্বীকরণও অনন্ত ছাড়া আর কিছু হয় না।

অনন্তকাল সহনীয় হতে পারে যদি অনন্তকাল নিছক 'বর্তমান' বলে প্রতীয়মান হয়, যদি অতীত-ভবিষ্যৎ বলে কিছু না থাকে। কিন্তু এটা কতখানি ইচ্ছাপূরণ আর কতখানি নির্ভুল দার্শনিক থিওরী তা বলা কঠিন। অনন্তকাল সহনীয় হতে পারে আরেকটি অবস্থায়, যে-অবস্থায় আত্মা কিছুদিন অচেতন থাকবে, তারপর সচেতন। ইকবাল বলেছেন, মৃত্যুর পর মানবাত্মাকে কিছুদিন অচেতন অবস্থায় থাকতে হবে। এই অচেতন অবস্থার নাম, তিনি বলেছেন, "বারজাখ"। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয় না, কেননা কাল যে অনন্ত। আত্মা কতকাল অচেতন থাকবে এবং কতকাল সচেতন? যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে বারজাখ বহুবার ঘটবে--ইকবাল মাত্র একবারের কথাই বলেছেন--তাহলে প্রশ্ন ওঠেঃ আত্মা কতবার ঘুমোবে এবং কতবার জাগবে? প্রত্যেক বার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি অতীতের সমস্ত ঘুম আর সমস্ত জাগরণের কথা তার স্মরণ হয়, তবে স্মৃতির ভার একদিন তার পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়া স্বাভাবিক। আবার অতীতের ঘুম আর জাগরণের কথা যদি সে ভুলেই যায়, তবে সেটা পুনর্জন্ম ছাড়া আর কি? এবং পূর্বস্মৃতি-বর্জিত পুনর্জন্মই যদি হয়, তবে আত্মার কাছে অনন্তকালের এবং অমরত্বের কোনো তাৎপর্যই থাকতে পারে না। কে জানে, হয়তো এমনি অসংখ্য পুনর্জন্ম এড়াবার জন্যই বুদ্ধ বলে গেছেন, মানুষের শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত নির্বাণ।

অবশ্য মৃত্যুর পরে সব মানুষের আত্মাই যে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে, এমন কথা ইকবাল বলেন নি। তাঁর মতে এ জীবনে যারা সাধনা করবে, কেবল তাদের আত্মাই মৃত্যুর পরে অনন্তকাল বেঁচে থাকার আশা করতে পারে, অন্যেরা নয়।

It is the deed that prepares the ego for dissolution or disciplines him for a future career. The principle of ego-sustaining deed is respect for the ego in myself as well as in others. Personal immortality, then, is not ours as of right; it is to be achieved by personal effort. Man is only a candidate for it. [*Reconstruction of Religions Thought in Islam*. Page 119.]

আসরার-ই-খুদী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় ইকবাল বলেছেন, ব্যক্তিগত অমরত্ব একটা উচ্চাশা-স্বরূপ, সাধনার দ্বারা একে অর্জন করা সম্ভব। একমাত্র সেইসব অহমই বারজাখ-এর পর বেঁচে থাকবে যারা এ জীবনে যথেষ্ট সাধনা করেছে।

ইকবালের কথা যদি ঠিক হয় তবে অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষের আত্মাই মৃত্যুর পর বেঁচে থাকবে, কারণ মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষই অমরত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে। বাকি আর সমস্ত মানুষের আত্মার মেয়াদ মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। জীবন ও মৃত্যু কি মানুষের সাধ্যায়ত্ত? বহু সাধনা করেও মানুষ সশরীরে অমর হতে পারেনি; কোনো দিন অমর হতে পারবে এমন কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। সেই মানুষ মরেও যাবে, আবার সাধনার বলে মৃত্যুর পরে বেঁচেও থাকবে? দেহের আয়ু বৃদ্ধি করার চাইতে আত্মার আয়ু বৃদ্ধি করা সহজ, এরকম একটা কথা প্রথমেই ধরে না নিলে একথা মেনে নেওয়া কঠিন।

তবু ধরে নেওয়া যাক যে অন্তত কিছু সংখ্যক মানুষের আত্মা সাধনার বলে অমরত্ব লাভ করবে। বাকি আর সমস্ত মানুষের আত্মার মেয়াদ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ। এর অর্থ এই যে, মৃত্যু হলেও আমার আত্মীয়-স্বজনের আত্মা অবশ্যই কোথাও অবস্থান করছে বা করবে, আর তাদের আত্মার সঙ্গে একদিন আমার আত্মার সাক্ষাৎ হবে, তারপর আমরা অনন্তকাল একত্রে বাস করবো—এ আশা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরাশা মাত্র, এ আশা প্রায় অর্থহীন। যে-প্রিয়জন মরেছে, সে চিরদিনের জন্যই মরেছে, তার জীবনটা আমার জীবনের মধ্যে একটা স্বপ্ন ছিল মাত্র—সে-স্বপ্ন মুছে গেছে আমার মনে কয়েকটা রঙের অস্পষ্ট, বিলীয়মান পোঁচ রেখে মাত্র।

আত্মার এই বিলোপের সম্ভাবনায় মন মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বিষণ্ণ হয়ে ওঠে কেননা আমরা ভাবাবেগের অধীনে। কিন্তু এছাড়া উপায় আর কি আছে? বিলোপের এই সম্ভাবনাকে আমি সেইভাবে মেনে নিতে চাই যে-ভাবে অনিবার্য মৃত্যুকে আমি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। শুধু তাই নয়, অপরিসীম কালের কথা যখন ভাবি তখন মৃত্যুর পরে আত্মার বিলোপের সম্ভাবনায় আমি যেন একটা স্বস্তি অনুভব করি। আমি এমনিতে হয়তো স্বেচ্ছায় ঘণ্টা তিনেক নিরেট পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি, কিন্তু কেউ যদি আমাকে ওইভাবে বসে থাকতে আদেশ করে তাহলে ব্যাপারটা অসহনীয় হয়ে পড়ে। কেননা, তখন তা অন্ধ নিয়তি মাত্র। অনন্তকাল আত্মা বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকতে হবে তাকে,' এটা আমার কাছে অসহনীয় মনে হয়, এবং এই কারণেই অনন্তকাল বেঁচে থাকার প্রতি আমার কিছুমাত্র লোভ নেই। কিন্তু দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রতি আমার লোভ আছে, অবশ্য মানুষের পক্ষে যতদিন মানুষের মতো বেঁচে থাকা সম্ভব ততদিন। এবং মৃত্যুর পরে ভাবলেশহীন, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবিচ্ছিন্ন, ধ্যানমগ্ন, অপরিচিত আত্মা-দের মধ্যে অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য আমার প্রার্থনা নয়, আমার প্রার্থনা এইজন্য যে, আমি যদি দীর্ঘজীবী হওয়ার সুযোগ পাই, তবে যেন আমার জীবৎকালে মানুষের জন্য এমন কিছু করে যেতে পারি যাতে আমার মৃত্যুর পরেও তারা কিছুদিন আমাকে সস্নেহে স্মরণ করে। মৃত্যুর পরেও যদি আমি মানুষের মাঝে কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারি, তবে সেটাই আমার সাধনার সাফল্য, আমার মানবজীবনের সার্থকতা। এবং মানব-জীবনের সার্থকতা সম্ভব হলে তার চাইতে প্রেয় আর কি থাকতে পারে।

১৯৫৬